মুনীর চৌধুরীর জীবনী ও সাহিত্যকর্ম

উম্মে সালমা

448491

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার
Dhaka University Library
448491

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

জুন ১৯৯৯ইং

Dhaka University Institutional Repository

448491

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উম্মে সালমা কর্তৃক উপস্থাপিত 'মুনীর চৌধুরীর জীবনী ও সাহিত্যকর্ম' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেননি।

(ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমান অভিসন্দর্ভে মুনীর চৌধুরীর জীবনী ও বিভিন্ন সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুনীর চৌধুরীর জীবনী আলোচনার কারণ জীবনগত পরিবেশ সাহিত্যকর্মে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি নাগরিক জীবনের পাশাপাশি গ্রাম্য জীবনের দিকটি সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে ছোট গল্প ও নাটক। ছোট গল্পগুলোতে গ্রাম্য মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ছোট গল্পের সংখ্যা সাতটি। মুনীর চৌধুরীর সাহিত্য রচনার বেশিরভাগই নাটক। নাটকের মধ্যে রয়েছে মৌলিক ও অনুবাদ নাটক। মৌলিক নাটক আবার পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক। মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা দুটি। বাকি চব্বিশটি একাঙ্ক। অনুবাদ নাটকের মধ্যেও পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক রয়েছে। এর মধ্যে তিনি 'ওথেলো' নাটকের অনুবাদকর্ম সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি।

ছোট গল্পের ভেতর দিয়ে সাহিত্য রচনা শুরু করলেও ক্ষেত্র ও পরিসর বৃদ্ধি করলেন নাটকের মাধ্যমে। মুনীর প্রতিভার বিকাশ ও দ্যুতি স্ফূরণ হয়েছে নাটকে। সে স্ফূরণ দেশীয় নাটককে ছাপিয়ে উপচে পড়েছে বিদেশি নাটকে। বিদেশি নাটকে শুধু উপচেই পড়েনি, রীতিমত তরঙ্গায়িত হয়েছে।

মুনীর চৌধুরী অনুদিত নাটকের মধ্যে এখানে তুলে ধরা হয়েছে তিনটি যেমন, শেকস্‌পীয়রের 'ওথেলো', 'মুখরা রমণী বশীকরণ' ও জর্জ বার্নাড শ'-এর 'কেউ কিছু বলতে পারে না।'

বর্তমান গবেষণায় মুনীর চৌধুরীর ছোটগল্প ও নাটকের বিষয় বৈচিত্র্য, শিল্পগুণ ও অনুবাদ বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে নির্দেশের চেষ্টা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা করা সম্ভব।

জুন ১৯৯৯ — উম্মে সালমা
শ্রাবণ ১৪০৬

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'মুনীর চৌধুরীর জীবনী ও সাহিত্যকর্ম' গবেষণার জন্য আমি ১৯৯১ সালে প্রথমে এবং ১৯৯৪ সালে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ-এর তত্ত্বাবধানে এম.ফিল. কোর্সে রেজিস্ট্রিভুক্ত হই। আমার পরিবারে পরম শ্রদ্ধেয় দুই গুরুজনের পরলোকগমন ও আমাকে বড় রকম একটা অস্ত্রোপচারের কারণে আমার গবেষণা কর্মটি বিলম্বিত হয়।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ-এর নিরন্তর তাগিদ ও সস্নেহ উপদেশনা গবেষণার প্রতিটি স্তরে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি অভিভূত হয়েছি তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহার করে। এজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে প্রথমে আমাকে সাহায্য করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক কাজী দীন মুহম্মদ। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বিভিন্ন সময়ে বিশেষ তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন মুনীর চৌধুরীর স্ত্রী মিসেস লিলি চৌধুরী এবং আমার সহপাঠী ডক্টর শাহীদা রহমান। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার পরিবারের সদস্যদের কাছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আমার স্বামী এম. শাহীদ-উল-ইসলাম যিনি প্রথমে এ গবেষণাকর্মটি করার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন। তারপর আমার বাবা-মা, ভাই-বোন ও আমার সন্তান যাঁরা আমার এ নিরলস পরিশ্রমের একান্ত সাথী। তাঁরা তাঁদের অনেক মূল্যবান সময় আমাকে দিয়েছেন।

আমার স্নেহভাজন ভাতিজা মোঃ আমিনুল ইসলাম সুমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়নরত। অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে সে আমার গবেষণাকর্মে সাহায্য করেছে। তার কাছেও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	মুনীর চৌধুরীর জীবনী	১
২.	ছোট গল্প (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)	১৫
৩.	নাটক (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)	২৬
৪.	রক্তাক্ত প্রান্তর (মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক)	৩৭
৫.	চিঠি (মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক)	৬০
৬.	কবর (মৌলিক একাঙ্ক)	৭৫
৭.	মৌলিক একাঙ্কিকা (একাঙ্ক ও পঞ্চাঙ্কের পার্থক্য)	৮৩
৮.	গ্রন্থাকারে প্রকাশিত একাঙ্কিকার বিচার	৯৫
৯.	মুনীর চৌধুরী অনুদিত পূর্ণাঙ্গ নাটক	১১৬
১০.	পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নাটক 'মুখরা রমণী বশীকরণ'	১১৮
১১.	অসমাপ্ত অনুবাদ নাটক 'ওথেলো'	১৫০
১২.	পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নাটক 'কেউ কিছু বলতে পারে না'	১৫৭
১৩.	উপসংহার	১৭০
১৪.	গ্রন্থপঞ্জি	১৭১

Dhaka University Institutional Repository

মুনীর চৌধুরীর জীবনী

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মুনীর চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমায় ১৯২৫ সালের ২৭শে নভেম্বর। মানিকগঞ্জ ছিল তাঁর পিতার কর্মস্থল। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানার চাটখিল গ্রামে। পিতা আব্দুল হালিম চৌধুরী (১৮৯২-১৯৭০) ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। পিতামহ আব্দুস সোবহান ছিলেন সাধারণ গ্রামীণ কৃষিজীবী। তাঁর পিতাই ছিলেন পরিবারের প্রথম ইংরেজি শিক্ষিত। সে সময় বাংলার সঙ্গে আরবি ফারসি পড়ার রেওয়াজ ছিল। মুনীর চৌধুরী ছিলেন মেধাবী ছাত্র আর বিদ্যানুরাগী। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বৃত্তি নিয়ে লেখাপড়া করেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর পি.সি.এস. পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে কৃতকার্য হন এবং প্রশাসনিক পদে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগ দেন। ছেলেবেলা থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল।

তাঁর মাতামহ আব্দুস সোবহান ছিলেন বর্তমান কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার অন্তর্গত ভানুনগর গ্রামের অধিবাসী এবং একজন সফল আইনজীবী। তিনি প্রচুর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। মুনীর চৌধুরীর মাতা আফিয়া বেগম বিদ্যানুরাগী ছিলেন। সন্তানদের উচ্চ-শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় গুণাবলী অর্জনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিতেন।

ছাত্র জীবন

চৌদ্দ ভাইবোনের মধ্যে মুনীর চৌধুরী ছিলেন দ্বিতীয়। স্কুল জীবন অতিবাহিত হয় যথাক্রমে পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। বড় ভাই কবির চৌধুরীর দ্বারা তিনি বেশি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তীক্ষ্ম ও প্রখর জ্ঞান-বুদ্ধি থাকার কারণে যুক্তি-তর্কে সুদক্ষ হয়ে ওঠেন। অধ্যয়নে অল্পসময় ব্যয় করলেও পরীক্ষার ফলাফল কোন সময় খারাপ হয়নি। ১৯৪১ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ঢাকা বোর্ডের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। মুনীর চৌধুরীর স্বভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করে পিতা পুত্রকে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি করেন। তিনি ভবেছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশৃঙ্খল

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মের মধ্যে মুনীর ধীর-স্থির ও পাঠ্যবিষয়ে মনোযোগী হবেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন নিয়ম-কানুন তাঁর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনুরাগী না হয়ে তিনি পোষাক-পরিচ্ছদে সৌখিন হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানে তিনি আকৃষ্ট হননি কিন্তু সাহিত্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দেশি-বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে ক্রমশ তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় থেকেই বামপন্থী ছাত্রদের সাথে পরিচয় ঘটায় তাঁর চিন্তাধারার ওপর এই আদর্শ কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে।

লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ার কারণে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মুনীর চৌধুরী উত্তীর্ণ হন দ্বিতীয় বিভাগে। পরে তিনি ১৯৪৩ সালে ইংরেজি বিষয়ে সম্মান নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আলিগড়ের ভাবধারা দীর্ঘদিন তাঁর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বামপন্থী রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ও মার্ক্সীয় দর্শন ব্যাখ্যায় আগ্রহী ছাত্রদের সংস্পর্শে আসেন। এ সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি মন্তব্য করেন :

"সেই প্রতিভাদীপ্ত তীক্ষ্ম বুদ্ধির ছেলেগুলি আমায় আকর্ষণ করল। তাদের নিষ্ঠা আর প্রজ্ঞা আমায় মুগ্ধ করল। সেই রবিগুহ (দেব) প্রসাদ, মদন বসাক, সরদার ফজলুর করিম প্রত্যেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি উজ্জ্বল রত্ন। তাদের সংস্পর্শে এসে দেখলাম, আমার এতদিনের আভিজাত্য চাকচিক্যময় সৌখিনতা আর চালিয়াতি দম্ভ সব অন্তঃসারশূন্য সব ফাঁকি। সে সময় পড়ুয়া ছাত্র হিসেবে আমার নাম হয়েছে। এদের চোখে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম।"

(বাংলা একাডেমী জীবনী গ্রন্থমালা : পৃ. ১২)

এই সময় থেকে তাঁর মনের মধ্যে বামপন্থী চিন্তাধারার বিশেষ উন্মেষ ঘটে। ১৯৪৩ সালে তিনি ঢাকার বামপন্থী সংগঠন ও 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এ যোগ দেন। তিনি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন রনেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুৎ গোস্বামী, অজিত গুহ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকদের সাথে।

এই সংঘের বৈঠকী আলোচনায় সাহিত্য ও রাজনৈতিক তত্ত্ব আলোচিত হতো। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদ বিরোধী তৎপরতার দিকটিও গুরুত্বের সঙ্গে প্রাধান্য পায়। তিনি সক্রিয়ভাবে এই গোষ্ঠীর সাথে জড়িয়ে পরেন। ইতোমধ্যেই তিনি ছোট গল্পকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। প্রগতি লেখক সংঘে প্রতিবাদী গল্প লিখে geinus আখ্যা পান।

Dhaka University Institutional Repository

মুনীর চৌধুরী একদিকে যেমন ছিলেন প্রতিবাদী ও বিপ্লবী চেতনার ধারক, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন রঙ্গ ব্যঙ্গ ও পরিহাস প্রিয়তার পরিপোষক। ১৯৪৩ সালে প্রথমবার 'নওজোয়ান কবিতা মজলিস' শীর্ষক কৌতুক রসাত্মক ব্যঙ্গধর্মী একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালে আর একটি ব্যঙ্গাত্মক একাঙ্কিকা 'রাজার জন্মদিনে' মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৬ সালে আর একটি ব্যঙ্গাত্মক একাঙ্কিকা 'রাজার জন্ম দিনে' মঞ্চস্থ হয়।

সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান

১৯৪৪ সালে মুনীর চৌধুরী সক্রিয়ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিলেও শেষ পর্যন্ত যোগ দেননি। ছাত্র জীবনে প্রত্যাবর্তন করেও তিনি রাজনীতি থেকে বিমুক্ত হননি। সাম্যবাদী রাজনীতি করার ফলে তাঁকে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। কমিউনিজম ভাবধারা সমর্থনের কারণে তাঁকে কিছুদিনের জন্য ছাত্রাবাস ত্যাগ করতে হয়। ছাত্র সংসদের সভাপতি পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি বিপক্ষ প্রার্থী প্রাক্তন মন্ত্রী শফিউল আজমের কাছে পরাজিত হন।

মুনীর চৌধুরীর রাজনৈতিক মতবাদ তাঁর পিতার কাছে অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর আদর্শ ছিল পিতার আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। সঙ্গত কারণে পিতা অসন্তুষ্ট হয়ে লেখাপড়ার খরচ বন্ধ করে দেন। পরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর সহায়তায় অধ্যয়ন জীবন শেষ করতে হয়।

১৯৪৬ সালে মুনীর চৌধুরী ইংরেজি সাহিত্যে বি.এ. সম্মান ও ১৯৪৭ সালে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কারাবরণের সময় কারাগারে বাংলায় এম.এ. পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রী লাভ করেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

১৯৪৭ সালের ১৬ই আগস্ট কোলকাতায় প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এই দাঙ্গা শুধু কোলকাতা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ঢাকা, বিহার, নোয়াখালী, মিরাট, দিল্লী, পাঞ্জাব প্রভৃতি জায়গায়ও এর বীভৎসতা ছড়িয়ে পড়ে। মুনীর চৌধুরী এ সময় দাঙ্গাবিরোধী তৎপরতায় জড়িয়ে পড়েন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

"সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়কার সে দিনগুলিতে আমরা ছিলাম জাগ্রত প্রহরী। মনে আছে একদিন রাত তখন ১টা। শুনলাম এক ভদ্রলোক আটকা পড়েছেন বখশীবাজারে। মাত্র দুজন সশস্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ নিয়ে ছুটলাম তাকে উদ্ধার করতে। দেখলাম, গুণ্ডারা অবরোধ করে আছে বাড়ি। তারই মধ্যে মটরে করে নিয়ে ফিরলাম তাকে।"

মুনীর চৌধুরী মনে প্রাণে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী। ধর্মীয় গোঁড়ামীকে তিনি কোন সময় সমর্থন করেননি। এ সম্পর্কে রনেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন :

"আমাদের সঙ্গে বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পর্কের সূত্রটি স্থাপিত হয়েছিল তাঁর এই ধর্মীয় গোঁড়ামী বিরোধী মানসিকতার দরুন। তখন সেই যুগ চলছে যার কবি সুকান্ত। যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর বিভেদকে অতিক্রম করার নিশানা লাল নিশান।

তবে ঢাকায় আমরা যে বড় সমস্যাটার সম্মুখীন হয়েছিলাম সেটা ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সুতরাং আমাদের লাল নিশানের রাজনীতি ছিল এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের রাজনীতি। আর মুনীর চৌধুরী এই সংগ্রামের রাজনীতিতে অত্যন্ত স্বাভাবিক শরীক হয়েছিলেন তাঁর তীব্র আক্রমণাত্মক অসাম্প্রদায়িক প্রবণতা নিয়ে।

(বাংলা একাডেমী জীবনী গ্রন্থমালা : পৃ. ১৭)

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে মুনীর চৌধুরী রচনা করেন একাঙ্কিকা 'মানুষ' (১৯৪৭)। এখানে সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে মূল্যবোধ প্রাধান্য পেয়েছে। এ সময় একুশে ফেব্রুয়ারির বাংলা ভাষা আন্দোলন শুরু হওয়ার পর তিনি এই আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান এই দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। দেশের বৃহত্তম জনসংখ্যার ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং মুনীর চৌধুরী এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সর্বপ্রথম সাধারণ ছাত্রসভায় মুনীর চৌধুরী বক্তৃতা করেন। এরপর মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে নানা জায়গায় প্রতিবাদী হয়ে বক্তৃতা করেছিলেন।

১৯৪৮ সাল কোলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির যে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও তিনি যোগদান করেন। ঢাকায় ফিরে এসে আবার পার্টির কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ঐ বছরেই তিনি ঢাকায় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন। নানা তৎপরতার কারণে পার্টির উপর তাঁর বিশ্বাস শিথিল হতে থাকে এবং এ সময়ই সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসার চিন্তাভাবনা করেন। সাহিত্য ও অধ্যাপনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তবে

Dhaka University Institutional Repository

বামপন্থী রাজনীতি ছাড়লেও প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা থেকে তিনি সরে আসেননি। সক্রিয়ভাবে রাজনীতি থেকে সরে আসার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন :

"এ রাজনীতির প্রতি আমার অশ্রদ্ধা নেই। এর দীর্ঘসূত্রিতা আমার দ্বারা সম্ভব ছিল না। সম্পূর্ণরূপে জীবনকে বিলিয়ে দিতে পারলে আমি ধন্য হতাম, কিন্তু সে ত্যাগের ক্ষমতার অভাব ছিল আমার মধ্যে। তাই রাজনীতি ছেড়ে দিলাম একেবারে।"

(জীবনী গ্রন্থমালা : পৃ. ১৮)

রাজনীতি ছেড়ে দেবার পর তরুণ বামপন্থী ছাত্রসমাজের কাছে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়। এক সময় সুযোগ এসেছিল ফরেন সার্ভিসে ঢোকার। একজন আইনজীবী হওয়ার সুযোগও তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি ভেবেছিলেন একদিকে সাংসারিক জীবন ও অন্যদিকে রাজনীতির এই দ্বৈত সত্তা ও দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "আমি জীবনের মোহের নিকট পরাজিত।"

চাকরি গ্রহণ

মুনীর চৌধুরী প্রথম পেশা জীবনে প্রবেশ করেন অধ্যাপক হিসেবে। ১৯৪৯ সালে খুলনার দৌলতপুরে ব্রজলাল কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালে ঐ কলেজের চাকরি ছেড়ে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে থাকেন। ১৯৫০ সালের ৩০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের একটি সাময়িক শূন্যপদে তিনি অস্থায়ী লেকচারারের পদে যোগ দেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগেও ইংরেজির খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেন।

প্রথম কারাবরণ

মুনীর চৌধুরী সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করার কারণে সরকারের চোখে পড়ে যান। ১৯৪৯ সালে খুলনার ব্রজলাল কলেজে থাকাকালীন কলেজের পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে ঢাকায় আসেন। ঢাকায় আসার পর বামপন্থী রাজনৈতিক তৎপরতার অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হন। কিছুদিনের জন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। পরে সরকারের কাছে রাজনীতি থেকে বিরত থাকবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঐ বছরই কারাগার থেকে ছাড়া পান।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় কারাবরণ

১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুনীর চৌধুরী ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনে ছাত্রসমাজ ও জনতা সোচ্চার হয়ে ওঠে। আন্দোলনের সময় ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ গুলি চালালে কয়েকজনের মৃত্যু হয়। এতে সারাদেশ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ প্রতিবাদ সভা করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের উপর একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়। এর ফলে ২৬শে ফেব্রুয়ারি মুনীর চৌধুরী দ্বিতীয় বার নিরাপত্তা আইনের আওতায় গ্রেফতার হন। তাঁর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দুই জন অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী ও অধ্যাপক পৃথ্বীশ চক্রবর্তী গ্রেফতার হন। এঁরা ছাড়াও গ্রেফতার হন জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ।

রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবর রহমান, আবুল হাশিম, মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ ও খয়রাত হোসেন। মুনীর চৌধুরী প্রায় আড়াই বছর বন্দী জীবনযাপন করেন। দীর্ঘ দিন কারাবরণের ফলে কর্ম ও পারিবারিক জীবনে দুর্যোগ দেখা দেয়। মুনীর চৌধুরী চাকরিচ্যুত হন। ঢাকা শহর ছেড়ে স্ত্রী লিলি চৌধুরীকে কুমিল্লায় শৈলরানী স্কুলে চাকরি গ্রহণ করতে হয়। দ্বিতীয় বার কারাবরণের সময় তিনি জেলখানায় পরীক্ষা দিয়ে বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

তৃতীয় কারাবরণ

১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটলে মুনীর চৌধুরী জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং ১২ক ধারায় শাসন প্রবর্তিত হয়। এই ধারার আইনের আওতায় মুনীর চৌধুরী আবার গ্রেফতার ও কারাগারে প্রেরিত হন।

অধ্যাপনা ও সাহিত্যকর্ম

মুনীর চৌধুরী অধ্যাপনার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি নাটকের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ১৯৪৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তিনটি একাঙ্ক নাটিকা রচনা করেন 'পলাশী ব্যারাক', 'ফিট কলাম' ও 'আপনি কে?'

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর প্রধান ক্ষেত্র ছিল নাটক ও সাহিত্য সমালোচনা। ১৯৪৩ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি নাট্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ১৯৪৫ ও ১৯৪৭ সালে রচনা করেন 'একাঙ্কিকা' ও 'বেশরিয়তি'। এছাড়া তিনি বহু ছোট নাটক লেখেন। ঢাকা বেতারে তাঁর অনেক নাটক প্রচারিত হয়।

মুনীর চৌধুরীর অগ্রজ কবীর চৌধুরীর সহপাঠী, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র নাজির আহমদ ঢাকা বেতারে নাটক লিখে দেবার জন্য মুনীর চৌধুরীর শরণাপন্ন হন। তিনি সানন্দে এ অনুরোধ গ্রহণ করেন। এভাবে মুনীর চৌধুরী ঢাকা বেতারের জন্য নাটক লিখে নাটক প্রচারে শূন্যতা পূরণে সহায়তা করেন। তিনি শুধু নাটক লিখেই ক্ষান্ত হননি– অভিনয় এবং নাট্যপরিচালনাও করেছেন। ছাত্রজীবন থেকে মুনীর চৌধুরী নাটক রচনা করতেন ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'মাটির ঘর', 'শেষ রক্ষা', 'বিজয়া' প্রভৃতি নাটকে তিনি অভিনয় করতেন।

অধ্যাপনা, নাটক রচনা ও অভিনয় এ তিন কাজ এক সাথেই চলত। নিজের লেখা মৌলিক নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তরের' দুটো প্রধান চরিত্রের একটি চরিত্রে তিনি অভিনয় করেন। তাছাড়া, মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'কৃষ্ণ কুমারী' নাটকেও তিনি অভিনয় করেন। নাজমুল আলম রচিত বেতার নাটক 'সারেং'-এ তিনি অভিনয় করেন। এই নাটকের সংলাপ ছিল নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায়।

১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় দাঙ্গার পটভূমিতে 'মিলিটারী' একাঙ্কিকা লিখিত হয়। একই সময়ে রচনা করেন প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ নাটক 'নষ্ট ছেলে'। ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দেন। ১৯৫১ সালে ডিসেম্বর মাসে জনল্সওয়ার্দীর নাটক 'দি সিলভার বক্স' এর বাংলা অনুবাদ করেন।

১৯৫২ সালে দ্বিতীয়বার কারাবরণ করার সময় জেলে থেকেই ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচনা করেন 'কবর' (১৯৫৩)। ঐ সময় জর্জ বার্নাড শ'-এর 'ইউ নেভার ক্যান টেল'-এর বাংলা রূপান্তর 'কেউ কিছু বলতে পারে না' (১৯৫৩) অনুবাদ করেন।

মুনীর চৌধুরী সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেন মূলতঃ প্রাবন্ধিক ও ছোট গল্পকার হিসেবে। বাংলা ১৯৪৯ সালের 'সওগাত' মাসিক পত্রিকায় ফাল্গুন সংখ্যায় 'সতেরো শতাব্দীর হেয়কয়ি কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়।

তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা স্থান পেয়েছে ব্যঙ্গ রসাত্মক গল্প কাহিনীতে। সওগাতে চৌর্যবৃত্তি বিষয়াবলম্বনে শ্লেষাত্মক প্রবন্ধ 'আসুন চুরি করি' প্রকাশিত হয়। কতগুলো ছোট গল্পও সওগাতে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হয়। ১৩৫০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ছোটগল্প 'নগ্ন পা' প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি রচনা করেন 'মানুষের জন্য', 'খড়ম', 'বাবাফেকু' প্রভৃতি।

ছোটগল্প ও প্রবন্ধের হাত ধরে সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করলেও একজন সফল নাট্যকার হিসেবেই তাঁর পরিচিতি বেশি। নাটক রচনাতে তিনি জীবনের বেশি সময় অতিবাহিত করেন। ১৯৪৩ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নাটক রচনার মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। প্রথম পর্যায়ের নাটক-নাটিকার মধ্যে রয়েছে 'একাঙ্কিকা' (১৯৪৫) ও 'বেশরিয়তি'।

তৃতীয় বার কারাবরণের পর শেষ বারের মত মুক্তি পেলেন ১৯৫৪ সালের শেষার্ধে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন ইংরেজি বিভাগের প্রধান ছিলেন 'অধ্যাপক জে. এস. টার্নার। তিনি ছিলেন উদার ও মানবতাবাদী। তাঁর আনুকূল্যে মুনীর চৌধুরী পূর্ববর্তী অস্থায়ী পদটি ফিরে পান। ১৯৫৪ সালের ১৫ই নভেম্বর তিনি আবার ইংরেজি বিভাগে যোগ দেন। পরে ভাইস চ্যান্সেলরের অনুমতিক্রমে বাংলা বিভাগেও মাঝে মাঝে ক্লাস নেবার সুযোগ পান। ১৯৫৫ সালের ৮ই আগস্ট ইংরেজি বিভাগ ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বাংলা বিভাগে চলে আসেন। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি এখানে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন।

১৯৬৩ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নাট্য সম্মেলনে তিনি দেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। তার আগে পাকিস্তান আর্টস্ কাউন্সিল ঢাকার সহ-সভাপতি এবং পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী পদে নিযুক্ত হয়ে ঐ বছরেই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলার ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে ভাষাতত্ত্ব অধ্যায়নের জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং ১৯৫৮ সালে সেখান থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন তিনি দুটো প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রথমটি চার্লস এ. ফার্গুমনের সংগে দি ফোনীমস অব বেঙ্গলী' (১৯৬০) অপরটি 'দি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম অব ইস্ট পাকিস্তান' (১৯৬০)। প্রবন্ধ দুটি আমেরিকার 'ল্যাঙ্গুয়েজ' ও 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এ্যামেরিকান লিঙ্গুইসটিকস্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯৬৪ সালে মুনীর চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘের পক্ষ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভাষাতত্ত্ব সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৬৫ সালে তার একাঙ্ক নাটক 'কবর', 'দণ্ডকারণ্য' আর পূর্ণাঙ্গ নাটক 'চিঠি' প্রকাশিত হয়। এ সময় তিনি 'কুপোকাৎ' শিরোনামে শিশু-কিশোরদের জন্য একটি নাটিকা রচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মুনীর চৌধুরী ছিলেন একাধারে নাট্যকার, গবেষক, প্রবন্ধকার, ছোট গল্পকার, সমালোচক, অভিনেতা ও পরিচালক। মৌলিক নাটক ও অনুবাদ উভয় ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

মুনীর চৌধুরী রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের তালিকা নিচে দেওয়া হলো :

মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক

১. রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২ প্রকাশিত)।

২. চিঠি (১৯৬৬ প্রকাশিত)।

মৌলিক একাঙ্ক নাটক

১. নওজোয়ান মজলিশ (১৯৪৩ রচনা)

২. সংঘাত (১৯৪৩)

৩. গুণ্ডা (১৯৪৪)

৪. একটি মশা (সন উল্লেখ নেই)

৫. নেতা (সন উল্লেখ নেই)

৬. ঢাক (সন উল্লেখ নেই)

৭. গতকাল ঈদ ছিল (সন উল্লেখ নেই)

৮. একাঙ্কিকা (১৯৪৫)

৯. রাজার জন্মদিনে (১৯৪৬)

১০. বেশরিয়তি (১৯৪৭)

১১. মানুষ (রচনা ১৯৪৭, প্রথম প্রকাশ ১৯৫০)

১২. পলাশী ব্যারাক (রচনা ১৯৪৮)

১৩. ফিট কলাম (রচনা ১৯৪৮)

১৪. আপনি কে (রচনা ১৯৪৮, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫)

১৫. নষ্ট ছেলে (রচনা ১৯৫০)

১৬. মিলিটারী (রচনা ১৯৫০)

১৭. কবর (রচনা ১৯৫৩, প্রকাশ ১৯৫৫)

Dhaka University Institutional Repository

১৮. দণ্ড (রচনা ১৯৬২)

১৯. দণ্ডধর (রচনা ১৯৬২)

২০. একতলা দোতলা (রচনা ১৯৬৫)

২১. দণ্ডকারণ্য (রচনা ১৯৬৫)

২২. কুপোকাৎ (রচনা ১৯৬৬)

২৩. মর্মান্তিক (রচনা ১৯৬৭)

২৪. বংশধর (রচনা ১৯৬৭)

বাংলায় রূপান্তরিত পূর্ণাঙ্গ নাটক

১. জর্জ বার্নার্ড 'শ এর 'ইউ নেভার ক্যান টেল' বাংলায় রূপান্তরিত হয় 'কেউ কিছু বলতে পারে না' শিরোনামে। গ্রন্থখানি ১৯৫৩ সালে অনুবাদের পর বাংলা একাডেমী কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে।

২. জন গলস্ওয়ার্দীর 'দি সিলভার বক্স' বাংলায় রূপান্তরিত হয় 'রূপার কৌটা' শিরোনামে ১৯৫১ সালে, বাংলা একাডেমী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে।

৩. জোহান আগস্ট স্ট্রিন্ডবার্নের 'দি ফাদার' বাংলায় রূপান্তর করেন 'জনক' নামে ১৯৭০ সালে।

একাঙ্ক নাটক

১. 'স্বামী সাহেবের অনশনব্রত'
উর্দু নাট্যকার নাকারা হায়দ্রাবাদীর নাটকের রূপান্তর (১৯৪৬)। পরবর্তীকালে মূল নাটকটি হারিয়ে যাওয়ায় বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

২. 'জমা খরচ ও ইজা'
লেফটেন্যান্ট কর্নেল এলিয়ট ক্রসে উইলিয়াম এর 'ই এন্ড ওই'-এর রূপান্তর (১৯৬৮)।

৩. 'মহারাজ'
ইডেন ফিলিপটস এর 'সাম পিং টু টক এ্যাবাউট'-এর রূপান্তর (১৯৬৮)।

৪. 'গুর্গন খাঁর হীরা'
এ্যালান মস্কহাউস এর 'দি গ্রান্ড চামচ ডায়মন্ড'-এর রূপান্তর (১৯৬৮)।

৫. 'ললাট লিখন'
রিচার্ড হাউস এর 'দি ম্যান বর্ন টু বি হ্যাংগড'-এর রূপান্তর (১৯৬৯)।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নাটক

১. 'মুখরা রমণী' বশীকরণ'

উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের 'টেমিং অব দি শ্রু'-এর অনুবাদ নাটকটি প্রথম 'পরিক্রম' পত্রিকায় (১৯৬৯) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর ১৯৭০ সালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

মুনীর চৌধুরী অনূদিত ও রূপান্তরিত অসমাপ্ত নাটক সম্পর্কে নিচে তথ্য পরিবেশন করা হল :

২. 'ওথেলো' উইলিয়াম শেক্সপীয়ার-এর 'ওথেলো'।

৩. 'গাড়ির নাম বাসনাপুর' টেনেসী উইলিয়াম-এর 'স্ট্রীট কার নেম্ড ডিজায়ার'।

৪. 'রোমিও জুলিয়েট' উইলিয়াম শেক্সপীয়ার-এর 'রোমিও জুলিয়েট'।

৫. 'অকারণ ডামাডোল' উইলিয়াম শেক্সপীয়ার-এর 'ম্যাচ এ্যাডু এ্যাবাউট নাথিং'।

৬. 'ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান' জর্জ বার্নার্ড শ'-এর ম্যান এন্ড সুপারম্যান'।

৭. 'ইলেকট্রার জন্য শোক' ইউজীন ও নীল-এর 'মর্নিং বিকাম্স্ ইলেকট্রা'-এর অনুবাদ।

৮. 'দি স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল' শেরিডানের 'দি স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল'-এর রূপান্তর।

গবেষণা ও সমালোচনা গ্রন্থ

১. মীর মানস (১৯৬৫)

২. তুলনামূলক সমালোচনা (১৯৬৯)

৩. বাঙালি গদ্যরীতি (১৯৭০)

ছোটগল্প

১. নগ্ন পা

২. ফিডিং বোটল

৩. বাবা ফেকু

৪. ন্যাংটার দেশে

৫. খড়ম

৬. একটি তালাকের কাহিনী

৭. মানুষের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ

১. বাংলা ভাষা বর্ণনার ভূমিকা

২. ইসমাইল হোসেন সিরাজী

৩. গোলাম মোস্তফার চিন্তাধারা ও গদ্যরীতি

৪. ওয়ালীউল্লাহর গদ্যরীতি

৫. শিল্পী কামরুল হাসান

৬. আসুন চুরি করি

৭. আধুনিক উর্দু কবিতা

৮. সতেরো শতাব্দীর 'হেয়কেয়ি' (সন উল্লেখ নেই) কবিতা

৯. কামাল চৌধুরীর কবিতা

১০. নাটা সাহিত্য

১১. কেন লিখি নি

১২. চোর

১৩. আবুল ফজলের রেখাচিত্র

১৪. শহীদুলা কায়সারের রোজ নামচা

১৫. শহীদুল্লাহ কায়সারের সংশপ্তক

১৬. আহসান হাবীবের সারা দুপুর

১৭. সানাউল হকের বন্দর থেকে বন্দরে

১৮. রনেশ দাশগুপ্তের শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে

১৯. মোহাম্মর মাহফুজুল্লাহর নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য

২০. মোহাম্মদ মোর্তজার চরিত্র হানির অধিকার

২১. মোহাম্মদ মোর্তজার জনসংখ্যা ও সম্পদ

২২. মোহাম্মদ মোর্তজার প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক

২৩. নূরুল ইসলাম খানের মেহের জুলেখা

২৪. হুমায়ুন কাদিরের নির্জন মেঘ

Dhaka University Institutional Repository

২৫. আবদুর রহমানর খোলা মন

২৬. হামেদ আহমদের প্রবাহ

২৭. দিলারা হাশেমের ঘর-মন-জানালা

২৮. হাবীবুর রহমানের পুতুলের মিউজিয়াম

২৯. বায়াজীদ খার পন্নীর বাঘ-বন-বন্দুক

৩০. মাযহারুল ইসলামের কবি পাগলা কানাই

৩১. কেন পড়ি

৩২. বি.এ. পাস কোর্সের জন্য তিন শত নম্বরের বাংলা।

বাংলা টাইপ রাইটারের জন্য নতুন কী-বোর্ড উদ্ভাবন

১৯৬৭ সালে মুনীর চৌধুরী কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। তার মধ্যে বাংলা টাইপ রাইটারের জন্য নতুন কী-বোর্ড উদ্ভাবন একটি। বাংলা টাইপ রাইটারের জন্য একটি উন্নতমানের নতুন কী-বোর্ড উদ্ভাবনের কথা অনেক দিন ধরেই তিনি চিন্তা করছিলেন। ১৯৬৫ সাল থেকে একাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি বাংলা টাইপ রাইটারের জন্য নতুন কী-বোর্ড উদ্ভাবন করার পর এই কী-বোর্ড টাইপ রাইটারে সংযোজনের পরামর্শের জন্য একাধিকবার পূর্ব জার্মানিতে যান। জার্মানিদের সহযোগিতায় তাঁর উদ্ভাবনী যন্ত্রটি এক চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে যা আজ 'মুনীর অপটিমা' নামে বাংলা টাইপ রাইটারের জগতে বহুল ব্যবহৃত।

স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে দেশব্যাপী সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু হয়। মুনীর চৌধুরী তার অল্প কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরেন। তিন এ আন্দোলনের সঙ্গে নিজের একাত্মতা ঘোষণা করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা শুরুর সময় মুনীর চৌধুরীর কিশোরপুত্র 'ভাষণ' মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। তাঁর ছোট ভাই এ.টি.এম. নাসির চৌধুরী চট্টগ্রাম ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনিও স্বস্ত্রীক বন্দী হন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে। এ সময় মুনীর চৌধুরী ছিলেন কিছুটা অসুস্থ। চাকরি ক্ষেত্রে তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

ও কলা অনুষদের ডীন। মানসিক ও শারীরিকভাবে তিনি তখন ছিলেন বিধ্বস্ত। পরিবার পরিজন নিয়ে কোথায় যাবেন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদানের জন্য তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার ও সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে তিনি সতর্কবাণী পান। তাঁকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়, তিনি যেন কোন রাষ্ট্রদ্রোহী কাজে লিপ্ত না থাকেন।

১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হবার মাত্র দু'দিন আগে আলবদর বাহিনীর কয়েকজন সশস্ত্র লোক ধানমণ্ডি সেন্ট্রাল রোডে অবস্থিত তাঁর পিতৃগৃহ হতে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। সামান্য কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে গেলেও তিনি আর কোন দিন বাড়িতে ফিরে আসেননি। তাঁর মৃতদেহও পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হয়, ঘাতক আলবদর বাহিনীরা ঢাকার রায়ের বাজারের বধ্যভূমির কাছাকাছি কোন জায়গায় ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তাঁকে হত্যা করে। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর। তিন পুত্র সন্তানের জনক তিনি। বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, সাত ভাই, ছয় বোন রেখে মুনীর চৌধুরী সারা জীবনের মতো হারিয়ে যান।

Dhaka University Institutional Repository

ছোট গল্প

ভূমিকা

মুনীর চৌধুরী সাহিত্য চর্চার প্রথম দিকে ছোট গল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর ছোট গল্পের সংখ্যা বেশি নয় কিন্তু এতে লেখকের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। সমাজ ও মনুষ সম্পর্কে তীব্র বিদ্রূপ প্রবণতা থেকেই তিনি ছোট গল্প রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু বেশি দিন তিনি ছোট গল্প রচনার ধারা অব্যাহত রাখেননি। ছোট গল্পের কালের পরিধি বিস্তৃত নয় বলে এই শাখায় লেখকের মানসিক প্রকৃতির পূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়নি।

মুনীর চৌধুরীর ছোট গল্প রচনার কাল ১৯৪৪-৪৮ পর্যন্ত। ১৯৫৩ সালের 'সওগাত' (মাসিক) পত্রিকায় কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন শিরোনামে গল্পগুলো প্রকাশিত হয়। এ সমস্ত ছোট গল্পে স্থান পেয়েছে সামাজিক প্রেক্ষিত, রক্ষণশীল মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যঙ্গ কৌতুক, বিভিন্ন অসঙ্গতির উন্মোচন আর উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজের বিভিন্ন মানসিকতা। ছোট গল্পে পাঠককে যে বিষয়টি বেশি নাড়া দেয় তা হলো লেখকের তীব্র ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গি। 'নগ্ন পা', 'একটি তালাকের কাহিনী', 'খড়ম', 'মানুষের জন্য' প্রভৃতি এ ধারার উল্লেখযোগ্য গল্প।

নগ্ন পা

গল্পের পটভূমি

'নগ্ন পা' গল্পটির পটভূমি সমাজের রক্ষণশীলতাকে কেন্দ্র করে গঠিত। সমাজের রক্ষণশীলতাকে গল্পে তিনি তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন। এই ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবই তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। মুনীর চৌধুরীর ছোট গল্প রচনার কাল যেহেতু ১৯৪৪-৪৮ সাল পর্যন্ত। সুতরাং 'নগ্ন পা' গল্পটিও এর কোন এক সময়ে রচিত বলে ধরে নেওয়া যায়, কারণ গল্পগুলোর রচনা কাল কোথাও নির্দিষ্ট করে পাওয়া যায়নি।

বিষয়বস্তু

'নগ্ন পা' গল্পের বিষয়বস্তুতে আছে শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছবি। পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে প্রধান চরিত্র রাহেলা ও ইউসুফ। রাহেলা চৌধুরী পরিবারের নতুন বৌ। সে মিশুক, সাজ-সজ্জায়

Dhaka University Institutional Repository

পটু, নিজেকে অতি সহজে পরিবারের একজন বলে মানিয়ে নিতে পেরেছে। শ্বশুর বাড়ির সবচেয়ে কঠিন যে জায়গাটি সেখানে সে সহজে প্রবেশ করতে পেরেছে, অর্থাৎ শাশুড়ীর মন জয় করতেও তার আটকায়নি। নতুন বৌয়ের চালচলন অন্যান্যদের ভাল লাগেনি। কিন্তু শাশুড়ী মনে করেছেন, বউয়ের কাঁচা বয়স– দু'দিন গেলে, জ্ঞান হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। শ্বশুর মাসুদ সাহেব পরিবারের মধ্যে তেমন ভূমিকা রাখেন না। রওশনারা রাহেলার বান্ধবী। তার ভাই ইউসুফ সাহেবী স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। এদের সাথে রাহেলার বেশ সখ্যতা। প্রায়ই ইউসুফের সাথে সিনেমায় যায়, পার্কে যায়। রওশনারার চেয়ে ইউসুফই বেশি করে নিজের দাবি অধিকার আদায় করে নেয়। যখন-তখন রাহেলা ভাবীর কাছে চলে আসে। অন্যায় আবদার করে তার হাতে খায়। এই শ্রেণীর ঘটনা রাহেলার স্বামী মাহমুদ মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি। উচ্চকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, ও যেন এ বাড়িতে আর না আসে। এখানেই রাহেলা ও তার স্বামীর সাথে দ্বন্দ্ব। নিজেকে সন্দেহের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাহেলা বোরখায় শরীর আবৃত করে বাড়ির বাইরে যায়। বোরখা ছাড়া রাহেলা চলাফেরা করে না। এতে শাশুড়ী খুশি হন, গর্ববোধ করেন। তিনি বলেছিলেন আর একটু জ্ঞান হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। রাহেলাকে হঠাৎ বোরখায় আবৃত দেখে পাড়ার ছেলে-মেয়েরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে।

রচনারীতি

গল্পের বিষয় নির্বাচনে যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। মধ্যবিত্ত সমাজের কাহিনীতে বৈচিত্র্যই লক্ষণীয়। পারিবারিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে লেখক সমাজের রক্ষণশীলতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। গল্পে লক্ষ্য করা যায়, "পাড়ার যুবক ছেলেরা চোখ তুলে রাহেলার দিকে আর একবার চাইল, তারপর রওশনারা, আনোয়ারা, জুলেখার পাণে। সবার শেষে আবার চোখ উঠাল রাহেলার পাণে আর সেখানেই স্থির হয়ে রইল সবগুলো চমকানো ব্যগ্র আঁখি।" এই চমকানো ব্যগ্র আঁখি দিয়েই লেখক সমাজের রক্ষণশীলতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। তখনও সমাজে মেয়েরা অবাধে চলাফেরা করার স্বাধীনতা পায়নি, তবে যথেষ্ট সাহসী ও প্রতিবাদী হতে শিখেছে। গল্পের যে দিকটি বেশি আকর্ষণীয় তা হলো তীব্র ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি।

ভাষা

গল্পে লেখক চলিত ভাষার সাবলীল ব্যবহার করেছেন। ভাষায় প্রাঞ্জলতা আছে, গুণ লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন ও সমাজ

সামাজিক নিয়ম-রীতি ও মানুষ সম্পর্কে লেখকের যথেষ্ট ধারণা ছিল বলে কাহিনীতে তিনি সমাজের একটি স্তরের মানুষের জীবনবোধ প্রকাশ করেছেন। ছোটগল্পের পরিসরে মানুষের জীবনের ক্ষণিক সময়কে তুলে ধরে সামাজিক, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিকতার পরিসর গল্পটি পাঠ করা মাত্রই পাঠকের চোখের সামনে একটি বাঙালি জীবনের চিত্র ফুটে ওঠে।

নায়িকা রাহেলা বেগম একটি প্রতিবাদী নারী রূপে অঙ্কিত। সমাজে এ ধরনের নারীরাই অগ্রগতির প্রতিমূর্তি। বোরখায় শরীর আবৃত করলেও তার ভেতরে এক প্রতিবাদী সত্তা জাগরিত। পরিবারের অন্যান্যরাও নতুন বউ রাহেলা বেগমকে সহজভাবে গ্রহণ করতে না পারলেও শাশুড়ী পেরেছেন। তাঁর চোখে বউয়ের দোষ ধরা পড়েনি। তিনি এক কথায় ভরসা করে আছেন, 'বউয়ের জ্ঞান বাড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে'।

এ ধরনের শাশুড়ী প্রতিটি মেয়ের ভাগ্যে জুটলে শ্বশুর বাড়ির প্রতি মেয়েদের অনিহা জন্মাতো না।

ফিডিং বোটল

পটভূমি

ফিডিং বোটল গল্পটিও ব্যঙ্গাত্মক। লেখক এখানে বিশেষ ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করেছেন। গল্প রচনর কোন নির্দিষ্ট সন-তারিখ পাওয়া যায়নি। এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় যে, গল্পটি ১৯৪৪-৪৮ সালের কোন এক সময়ে রচিত।

বিষয়বস্তু

বিষয়বস্তুতে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের পারিবারিক জীবনের ছবি লক্ষ্য করা যায়। শিশুর মুখ ধোয়ানোকে কেন্দ্র করে মা-বাবার মধ্যে কলহ। এ কলহ প্রকট আকার ধারণ করে জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

স্বামী সাজ্জাদ স্ত্রী আবেদার সাথে শিশুর যত্ন ও লালন-পালন নিয়ে ত্রুটি ধরে। কলহ এক পর্যায়ে প্রকট আকার ধারণ করে। পরিশেষে স্ত্রী আবেদা অনশন শুরু করে। সাজ্জাদ সাহেব অতিমাত্রায় রেগে গিয়ে শিশু-সন্তানকে নিজের বিধবা বোনের কাছে লালন-পালন করার হুকুম দেন। অবশ্য

Dhaka University Institutional Repository

সাজ্জাদ সাহেবের এই ব্যবহারে মা ও ভাই-বোনেরা সন্তুষ্ট নন। মা ছেলেকে ধমক দিয়ে বৌমাকে খাওয়ার জন্য আদরের সুরে আহ্বান করেন। ছোট দেবর-ননদরাও ভাবীকে অনুরোধ করল কিন্তু কিছুতেই কোন কাজ হলো না। স্বামীস্ত্রীর অনশনকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছেন। কিন্তু আবেদা অনশনে এত অটল যে, বাড়ির কেউ আর তার অনশন ভঙ্গ করাতে পারেনি। শেষ অবধি স্বামীর পরাজয় ঘটে। তাঁকেই স্ত্রীর কাছে নতি স্বীকার করে মান ভাঙ্গিয়ে অনশন ভঙ্গ করাতে হয়। অন্যদিকে তার খোকার লালন-পালন ও যত্নের ভার অন্যদের দ্বারা সম্ভব নয়। মা ছাড়া শিশুর যত্ন অসম্ভব। সুতরাং স্ত্রীকে ভুল বুঝে পারিবারিক কলহ সৃষ্টি করে সাজ্জাদ সাহেব ভুল করলেন। শিশুর যত্ন ও পরিচর্যার ব্যাপারে স্ত্রীর কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়।

লেখক এখানে গল্পের মাধ্যমে স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন ও বিবেকহীন ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ করেছেন। এ গল্পে দেখা যায়, পুরুষের তুলনায় নারী অধিক সচেতন ও দৃঢ় চেতনার অধিকারী। বিষয় নির্বাচনে এখানেও ব্যতিক্রমধর্মী চেতনা স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্য করা যায়। পারিবারিক কলহ যেন একেবারেই নিত্যনৈমিত্তিক তুচ্ছ ঘটনা ও সবার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনা। গল্পের পরিণতি পাঠক হৃদয়কে আকর্ষণ করে।

জীবন ও সমাজ

জীবন ও সমাজের ভিতরে মানুষ সম্পর্কে লেখকের যথেষ্ট ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। এ জন্যই গল্পের আখ্যানভাগে বাঙালি ঘরের অতি পরিচিত কলহ প্রাণবন্ত হয়ে সবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

বাবা ফেকু

পটভূমি

'বাবা ফেকু' গল্পের পটভূমি ব্যক্তিও সমাজকে কেন্দ্র করে রচিত। সমাজের উচ্চবিত্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমাজ নিয়ন্ত্রণ ও গোপন চাহিদা পুরণের লালসার দিকটি ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশিত। গ্রামের অর্থশালী ও সমাজ প্রধান ব্যক্তিদের প্রভাবের দিক এবং সেই সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর চরিত্রের নর-নারীর হৃদয় শক্তির লাবণ্যের দিকও আশ্রিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রচনা রীতি

'বাবা ফেকু'-ই এ গল্পের নায়ক চরিত্র। এখানে যে ব্যক্তির প্রাধান্য আছে তার চরিত্রে কোন কলুষতা দেখা যায় না। তিনি একজন উচ্চ পদস্থ সরকারি নিষ্ঠাবান, আদর্শ কর্মচারী, আলেম, অভিজ্ঞ সংসারী ও একজন আদর্শ বাবা। খান বাহাদুর গোফরান সাহেবের আত্মীয় ফেকু অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে সুবিধাবাদীদের পর্যায়ভুক্ত নয়। খান বাহাদুর তরুণী গৃহপরিচারিকার প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর প্রতিপত্তি ও স্বভাবের কথা মনে করে অগ্রসর হতে সাহসী হননি। এজন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে তার মন জয় করে নিজের কার্যসিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়েছেন। গল্পের নামকরণের মধ্য দিয়ে ফেকুর অসহায়ত্বের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

ভাষা

গল্পের মধ্যে ভাষারীতির বিভিন্ন ব্যবহার লক্ষণীয়। ভাষা নোয়াখালী জেলার আঞ্চলিক রীতি, চলিত ভাষার আটপৌরে ভাব ও উর্দূ মিশ্রিত। বিভিন্ন প্রকার ভাষা ব্যবহৃত হলেও অসামঞ্জস্যতা প্রকাশ পায়নি। চরিত্রানুযায়ী ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় গল্পের রসসৃষ্টি ও ভাষায় সাবলীলতা এসেছে। মানুষের মনের ভাবকে প্রকাশ করার জন্য প্রতীকীরূপ ব্যবহার করে ভাষাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। তৎকালীন অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব ও প্রতিপত্তির দিকটি গল্পে প্রকাশিত। তবে আভিজাত্যের ভারে জীবনে অবক্ষয় নেমে আসেনি। খান বাহাদুর গোফরান সাহেব অভিজাত শ্রেণীর লোক। তিনি একজন নিষ্ঠাবান সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মচারী, আদর্শ বাবা, আলেম ও অভিজ্ঞ সংসারী। সন্তান লালন-পালন করার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞতা বিদ্যমান। খান বাহাদুর গোফরান সাহেব দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হলেও সবার কাছে সম্মানীয় ব্যক্তি। গল্পের বিষয়বস্তুতে শহুরে পরিচিত জীবন প্রণালী ফুটে উঠেছে।

জীবন ও সমাজ

গল্পের কাহিনী মানব জীবন নির্ভর। পারিবারিক ও সামাজিক কাহিনী এতে স্থান পেয়েছে। 'বাবা ফেকু' গল্পে চল্লিশ দশক অর্থাৎ তৎকালীন সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। জমিদারী প্রথার বিলোপ হলেও সামাজিক আচার-আচরণের প্রথার রেশ রয়ে গেছে। এখানে অভিজাত ও অনভিজাত দু'শ্রেণীর চরিত্রের জীবনচিত্রই প্রকাশিত। খান বাহাদুর গোফরান সাহেব অভিজাত শ্রেণীর লোক হিসেবে চিহ্নিত। জমিদারী প্রথার সময়ে সমাজে চাটুকার ছিল। চাটুকার ধরনের চরিত্র বাবা

Dhaka University Institutional Repository

ফেকুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। সে ধুরন্ধর, ধূর্ত ও বুদ্ধিমান। নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য সে যে কোন কাজ বা ভণিতার আশ্রয় নিতে জানে। মামা গোফরান সাহেবের সাথে সব সময় বুদ্ধি খাটিয়ে কূট-কৌশল প্রয়োগ করে চলে। মানুষের মনোরঞ্জন করতে সে অভ্যস্ত। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে গৃহ পরিচারক কেরামত ও গৃহ পরিচারিকা চাম্বেলীর তুলনা করা যায়। তারা সাহসী, সৎ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন। বাঙালি উচ্চবিত্তের জীবনপ্রণালী নাটকীয়ভাবে গল্পে বর্ণিত। সব কিছু মিলিয়ে 'বাবা ফেকু' এক জীবন্ত রচনা।

ন্যাংটার দেশে

পটভূমি

'ন্যাংটার দেশে' গল্পে গ্রামীণ ও দরিদ্র পারিবারিক জীবন কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে সামাজিক অন্যায়ের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ হয়েছে।

ভাষা

গল্পের ভাষা সাধু ও আঞ্চলিক রীতি। গ্রামীণ ও অতি দরিদ্র, যাদের রাতের বেলায় ন্যাংটা হয়ে থাকতে হয় তাদের মতো অসহায় লোকদের মুখ দিয়ে সাধু ভাষা বেমানান এবং পরিবেশ পরিস্থিতিরও যথেষ্ট রূপায়ণে আঞ্চলিক রীতি ব্যবহৃত।

জীবন ও সমাজ

গল্পের কাহিনীতে দরিদ্র শ্রেণীর কাহিনী প্রাধান্যপ্রাপ্ত। মা-মেয়ে লজ্জা নিবারণ করার জন্য এক কাপড় ভাগাভাগি করে পরিধান করে। রাতের বেলা কাপড় ছাড়াই ঘুমোতে হয়, কারণ শরীরের সাথে মাটির ঘর্ষণে কাপড় ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। রাতের বেলা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকলেও দিনের বেলা অবশ্যই কাপড় ছাড়া লজ্জা নিবারণ সম্ভব নয়। আমিনার বাবা নিরুপায়, অসহায়, সংগতিহীন। প্রতিজ্ঞা করেও শহর থেকে স্ত্রী-কন্যার জন্য পরিধানের কাপড় আনতে পারেনি বলে লজ্জা ও ঘৃণায় রাতের আঁধারে গলায় গামছার ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে অসহায় দারিদ্র্য থেকে নিষ্কৃতি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

গল্পের সমাজ একান্ত অসহায় সম্বলহীন মানুষের। এ সমাজে ধনিক শ্রেণী অনুপস্থিত। সব মানুষ একই শ্রেণীতে বিন্যস্ত। দারিদ্র্য এদের প্রত্যেকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সমাজের লোক বস্ত্রের অভাবে রাতের বেলা ন্যাংটা থাকে। অনেক সময় একটি বস্ত্র দু'জন পালাক্রমে ব্যবহার করে। কাঁধের গামছাও এদের পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ব্যাঙ ধরে মাছের টোপ তৈরি করে মাছ ধরা যেন এদের নিত্যদিনের একমাত্র কাজ। জীবিকা নির্বাহের আর কোন পথের সন্ধান পাওয়া যায় না।

খড়ম

পটভূমি

'খড়ম' গল্পের পটভূমি সামাজিক অন্যায়কে কেন্দ্র করে রচিত। পরহেজগার ফজুলু ব্যাপারীর সারাদিন খড়ম ব্যবহার করা গল্পের মুখ্য বিষয় নয়। সমাজের অন্যায় আচার-আচরণকে যারা লালন করছে এবং সে অন্যায়ের পরিণতি কি সে বিষয়ই খড়ম গল্পের মাধ্যমে জীবন্তরূপ লাভ করেছে। এখানে অন্যায়ের প্রতি বিদ্রূপ ও প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।

রচনা রীতি

গল্পে গ্রাম বাংলার অতি পরিচিতি সাধারণ দরিদ্র জন-জীবনের কাহিনী প্রতিফলিত। এখানে বিদ্রূপের আভাস ও সামাজিক অন্যায় আচরণের প্রতি প্রবল ক্ষোভ আছে এবং সে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিন্তু তার প্রতিকার গ্রহণের কোন সিদ্ধান্ত নেই।

জীবন ও সমাজ

নিতান্ত গরীব অসহায় কালু মাঝির দারিদ্র্য জর্জরিত দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনের এক অধ্যায় এখানে চিত্রিত হয়েছে। কালু মাঝি নিতান্ত গরীব ও অসহায়। পেটের খাবার জোটানো তার পক্ষে কষ্টকর। খাবারের অভাবে স্ত্রীর স্তনের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায় কোলের শিশুকন্যা অসুস্থ হয়ে অকালে প্রাণ হারায়। শিশুকন্যার প্রাণবিয়োগে এক সময় মাতা আরফানীও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। শোককে বহন করে বেঁচে থাকে কালু মাঝি। স্ত্রী-কন্যার জন্য তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না কিন্তু সে ছিল নিরুপায়।

Dhaka University Institutional Repository

'খড়ম' গল্পের পরহেজগার ফজু ব্যাপারী ও বশীরুল্লাহ ক্বারীর আচার-আচরণ ও সাজ-পোষাকের মধ্য দিয়ে তৎকালীন নেক বখ্‌ত আলেম ও এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীদের পরিচয় পাওয়া যায়। এক শ্রণীর লোক ধর্মকে আশ্রয় করে ধর্মীয় ব্যবসাকে কাজে লাগায়। ধর্মের নিয়ম-কানুনকে এমন নিয়মিতভাবে পালন করে যে, এরা অন্যায় করলেও অন্য লোক তা সহজে বিশ্বাস করে না। যেমন ফজু ব্যাপারী কখনো অজু ছাড়া থাকেন না ও খড়ম ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন না। যখন খড়ম খুলে রাখেন তখন গ্রামাঞ্চলে বেশ রাত। বশীরুল্লাহ ক্বারীও কখনো কোরান পাঠ না করে কেনা-বেচা করেন না।

এ ধরনের সমাজ বর্তমানেও দেখা যায়। সমাজের অসৎ লোকগুলো নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে জনসাধারণের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে।

একটি তালাকের কাহিনী

পটভূমি

'একটি তালাকের কাহিনী' গল্পে সামাজিক অসঙ্গতিকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। গোঁড়া মৌলবীদের ফতোয়া প্রদান, শোনা কথা বা গুজবে কান দিয়ে দাম্পত্য জীবনে সর্বনাশ টেনে আনা প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে এ গল্পে।

রচনারীতি

গ্রাম বাংলার সাধারণ জনজীবনে ধর্মীয় সংস্কারের রূপ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবন কাহিনী লেখক যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন তাই এখানে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের দেশে এখনো একটি প্রথা চালু আছে যে, স্ত্রীর অন্যায় পেলে তালাকের মাধ্যমে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করা। পুরুষ শাসিত সমাজের কাছে নারীরা অবর্ণনীয়ভাবে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত। পুরুষের একচেটিয়া অধিকারে নারীর স্থান কোথায়? এ সমস্ত বিষয় লেখকের রচনায় স্থান পেয়েছে।

ভাষা

গল্পে অত্যন্ত সহজ, সাবলীল, সাধু ও নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন ও সমাজ

গল্পটি পুরোপুরিভাবেভাবে মানব জীবন নির্ভর কাহিনী। মনুষ্য সমাজে জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে প্রভৃতি বিষয়গুলো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিবাহের মাধ্যমে যেমন জীবনের পূর্ণতা আসে তেমনি বিচ্ছেদের মাধ্যমে আসে অপূর্ণতা। সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেমন আসে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তেমনি মুহূর্তের ভুলের জন্য জীবনে নেমে আসে তিক্ততা। 'একটি তালাকের কাহিনী' এ ধরনের একটি গল্প।

এখানে ফাতেমা বিবিকে অন্যায়ভাবে তালাক দেওয়া হয়েছে, কারণ ঘটনার সত্যতা যাচাই না করেই একটি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অপ্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার ক্ষমতার অভাব বিদ্যমান। ফতোয়াবাজরা ইসলামের আসল নিয়ম-নীতি না জেনেই যার যার মতানুযায়ী ফতোয়া দেয়।

গ্রাম বাংলার পুরুষ শাসিত সমাজের কথা এখানে স্থান পেয়েছে। আমাদের দেশের অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত পুরুষ শাসিত সমাজে অন্যায় আচরণ বিরাজমান। অন্যায়ভাবে এদেশের নারীরা স্বামীর নিকট থেকে তালাকপ্রাপ্ত হচ্ছে অহরহ। সমাজে ফতোয়াবাদীরা শুধুমাত্র ফতোয়া দিয়েই কর্তব্য সম্পাদন করেন। ইসলাম ধর্মের গভীরতা সম্পর্কে তাদের ধারণা কম। স্ত্রিকে মিথ্যে সন্দেহ করে তালাক দিয়ে জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা বাঙালি সমাজের একটি নিয়ম এ ধরনের সমাজ থেকেই তৈরি হয়েছে বলা যায়।

মানুষের জন্য

পটভূমি

বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের পারিবারিক জীবনভিত্তিক কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে 'মানুষের জন্য' গল্পটি। এখানে মধ্যবিত্ত সমাজের অসঙ্গতির প্রতি বিদ্রূপ এবং মানব কল্যাণের জন্য ধর্মীয় পথ ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত।

রচনারীতি ও ভাষা

গল্পের বর্ণনা সহজ ও সাবলীল। সাধু ও আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। গ্রামীণ জীবন ও চরিত্রানুযায়ী আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত। 'মানুষের জন্য' গল্পটি এক ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি। সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

অসঙ্গতি ও অন্যায় সম্পর্কে এই গল্পে ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র আফজাল মুন্সী ধর্মীয় আলোকে ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ করে মানব জীবনের যথার্থ মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

জীবন ও সমাজ

'মানুষের জন্য' গল্পটি জীবনধর্মী। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন দিক অবলম্বনে গল্পের আখ্যানভাগ গঠিত। ননদ-ভাবীর হাসি-ঠাট্টা গ্রামবাংলার জনজীবনে অতি পরিচিত একটি দিক। গল্পে তাদের এক সাথে পুকুরে সাঁতার কেটে গোসল করা, বাগানে বেড়ানো, কুল, আম ও পেয়ারা পারা, জাম কুড়ানো প্রভৃতি ঘটনা গ্রাম্য জীবনে অতি সাধারণ ও বাস্তব চিত্র।

গ্রাম্য অশিক্ষিতদের চোখে শাশুড়ী-পুত্রবধূর সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসহিষ্ণু দৃষ্টির অধিকারী। শাশুড়ী-বধূর শাড়ি ছেঁড়া, মাটির সরা ভাঙ্গা, পুত্রবধূর মাথার কাপড় পড়ে যাওয়া ইত্যাদি নগণ্য ব্যাপার অসঙ্গতির দৃষ্টিতে দেখে পুত্রের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দোষ ধরিয়ে দেওয়ায় ফতুরা বিবির জীবনে অশান্তি নেমে আসে।

ছদু মিঞার অজ্ঞতার কারণে স্ত্রীর সাথে ভাল সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও নিজের ক্রোধ ও অজ্ঞতার কাছে পরাজিত হয়েছে। সূক্ষ্মভাবে সুস্থ বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা ও ধৈর্য ধরার ক্ষমতা এদের নেই। এরা জানে, স্ত্রী অন্যায় করলে তালাক দিয়ে শাস্তি দেওয়া। কিন্তু এতে যে কি পরিমাণ ভুলের মাশুল দিতে হয় তা পরবর্তী জীবনে উপলব্ধি হয়। স্ত্রীকে কোন অবস্থায় তালাক প্রদান করা যায় আর কোন অবস্থায় যায় না এই অশিক্ষিত মানুষদের জীবনে তা অজ্ঞাত। তারা জানে 'কবুল' বলে সহজে বিয়ে করার মতো 'তালাক দিলাম' বলে স্ত্রী ত্যাগ করাটাও সহজ কাজ।

অশিক্ষিত ছদু মিঞার প্রতি সাধারণের ক্রোধ সঞ্চারিত হলেও পরক্ষণে সহানুভূতিতে মন ভরে ওঠে, কারণ গল্পে দেখা যায়, সে নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হলেও ঘটনা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে অবস্থিত। তিন তালাক বলে ফেললে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। স্ত্রীর প্রতি তার গভীর ভালবাসা থাকলেও চতুর ভাই ফজু মিঞার বুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়।

জমি সংক্রান্ত চিত্র গ্রামীণ জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। জমির ভাগ নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে মারা-মারি, ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা, শরীক অথবা অংশীদারকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা, ভুল বুঝা এগুলো গ্রামীণ জীবনের পরিচিত দিক। গল্পের আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ গ্রামীণ জীবন নির্ভর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

গল্পের সমাজ ও মানব জীবন গ্রামভিত্তিক। এখানে অন্যায়ের আচরণের পাশাপাশি ন্যায়-বিচারও আছে। পরহেজগার আফজাল সাহেবের ধর্ম পরায়ণতা পাঠকের কাছে তাঁকে অনেক বড় ও উদার করেছে। ধর্মের বিধি-বিধান তিনি যথার্থ প্রয়োগ করেছেন, কোথাও কুসংস্কারের অন্ধকারে হারিয়ে যাননি। নিজের সন্তানদের অন্যায় নিকৃষ্ট জানোয়ারের সাথে তুলনা করে ভর্ৎসনা করেছেন, 'আরামজাদা, জারুয়া, শরীয়ত তোগো লাইন্য, তোগো লাই শরীয়তন্য। হাইওয়ান জানোয়ারের লাই শরীয়ত হয় না, শরীয়ত হইছে মাইনষের লাই'। প্রয়োজনে পুত্রকে খড়ম দিয়ে প্রহার করতেও তিনি দ্বিধা করেননি। পুত্রের অন্যায়কে তিনি কখনো মেনে নিতে পারেননি। অন্যত্র তিনি আবার বলেছেন, 'মজুর মান্দার আরামজাদ'। 'কোনানকার। আরামজাদ বিয়া কইছত ক্যা? বিষয় করছ ক্যা? এইডাও জানছ না, যে হেইড্যা মাইয়া হোলার উপর তালাক লাগেনা—হ্যাডে হোলা থাইকলে তালাক অয়না। হেই কথা না জাইনলে তালাক দ্যাছ ক্যা? শরীয়ত মানছ ক্যা? আইজো মানুষ হ। শরীয়ত মাইনষের লাই, হইওয়ান জানোয়ারের লাইন্য।'

(মানুষের জন্য)

প্রবীণ মুন্সি সাহেবের সুস্থ বিচারে ফতুরী বিবি তালাকপ্রাপ্ত থেকে রক্ষা পায়। ধর্মের বিধি-বিধানের সঠিক মূল্যায়ন না হলে ফতুরী বিবি ও ফজু মিঞার দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক অচিরেই শেষ হয়ে যেত। মুন্সি সাহেব গ্রাম্য জীবন অতিবাহিত করলেও স্বল্প শিক্ষার আলোকে ধর্মের অনুশাসনকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন ও প্রয়োগ করে 'মানুষের জন্য' গল্পে বিশিষ্ট চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন। যে সমাজের পটভূমিতে গল্পটি রচিত তখন খুব কম মানুষের মধ্যেই শিক্ষার আলো ও উদারতার দ্যুতি পৌঁছেছিল। 'আইজো মানুষ হ' সংলাপের মধ্যদিয়ে সমাজে প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ হওয়ার তাগিদ আছে।

ছোট গল্পের মাধ্যমে মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যের যাত্রা শুরু বলা যায়। প্রথম দিকের রচনা হলেও গল্পগুলো প্রত্যেকটি স্বাতন্ত্র্য। শহুরে ও গ্রামীণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র জীবন সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন। গল্পের পটভূমি, পাত্র-পাত্রী ভাষা ব্যবহার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁর একটি মনোভঙ্গি বিদ্যমান। শহুরে জীবন অতিবাহিত করলেও গ্রামীণ ছবি নির্মাণ বা গ্রামীণ জীবন প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি পরিবেশ ও চরিত্র অনুযায়ী সাবলীল ভাষা ব্যবহার করেছেন। মুনীর চৌধুরী মূলত নাট্যকার হলেও সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নাটক

মুনীর চৌধুরীর সমগ্র সাহিত্য কর্মের মধ্যে ব্যাপক অঙ্গন জুড়ে আছে নাটক। তাঁর নাটক রচনার কাল ১৯৪৩ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। নাটকের প্রতি তিনি গভীরভাবে আসক্ত ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, অধ্যাপনা তাঁর পেশা হলেও তাঁর নেশা নাটক রচনায়, অনুবাদে ও প্রয়োজনে অভিনয়ে। তিনি আরও বলেছেন যে, নাট্যচর্চা করে যদি সংসার ধর্ম নির্বাহ করতে পারতেন তাহলে তাই করতেন।

মুনীর চৌধুরী ছাত্র অবস্থা থেকেই নাটক লিখতে শুরু করেন। বিভিন্ন আঙ্গিকের নাটক তিনি রচনা করেছেন। যেমন, পূর্ণাঙ্গ, একাঙ্ক, মৌলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অনুবাদ নাটক প্রভৃতি। তাঁর অধিকাংশ নাটক জীবিত অবস্থায় সমাপ্ত হলেও কিছু সংখ্যক নাটক অসমাপ্ত থেকে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর অসমাপ্ত নাটক সমাপ্ত করেন স্ত্রী লিলি চৌধুরী, অগ্রজ কবীর চৌধুরী। কিছু নাটক পাণ্ডুলিপি অবস্থায় হারিয়ে যায়।

মুনীর চৌধুরীর সমগ্র নাট্যকর্মের একটি তালিকা

মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক

'রক্তাক্ত প্রান্তর' বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। নাটকের কাহিনী পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পটভূমি অবলম্বনে রচিত।

'চিঠি' প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর আন্দোলন ও জীবনের বিভিন্ন অনুভূতি অবলম্বনে কাহিনী রচিত।

মৌলিকা একাঙ্কিকা

'নওরোজ কবিতা মজলিশ' (১৯৪৩), নাটকটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত থাকে। কাহিনী নওজোয়ানদের স্বরচিত সাহিত্য পাঠের মজলিশ অবলম্বনে কৌতুক রসাত্মক ব্যঙ্গ রচনা।

'একাঙ্কিকা' (১৯৪৫) নাটিকাটিও অপ্রকাশিত। কাহিনীতে সমাজ সমালোচনা স্থান পেয়েছে।

'রাজার জন্মদিনে' (১৯৪৬) অপ্রকাশিত রচনা। কাহিনীতে বিপ্লবী প্রতিবাদী চেতনা ও ব্যঙ্গ কৌতুক পরিহাসপ্রিয়তার প্রকাশ লক্ষণীয়।

Dhaka University Institutional Repository

'বেশরিয়তি' (১৯৪৭) অপ্রকাশিত রচনা। কাহিনীতে সমাজ সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়।

'মানুষ' (১৯৪৭) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। কাহিনী ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অবলম্বনে রচিত।

'পলাশী ব্যারাক' প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। কাহিনী ১৯৪৮ সালের অসাম্প্রদায়িক ঘটনা কেন্দ্রিক ব্যঙ্গাত্মক রচনা। ১৯৪৮ সালের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে পটভূমি রচিত।

ফিটকলাম নাটকটি ১৯৪৮ সালের অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গাত্মক রচনা। এ সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে পটভূমি রচিত।

'ফিটকলাম' ১৯৪৮ সালের অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গাত্মক রচনা। এ সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে পটভূমি রচিত।

'আপনি কে' (১৯৫৫) সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে রচিত।

'নষ্ট ছেলে' (১৯৫০) সালে রচিত হলেও প্রকাশকালীন সন-তারিখ জানা যায়নি। একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ গভীর আবেদনময় নাটক।

'মিলিটারী' (১৯৫০) নাটিকার প্রকাশ কাল পাওয়া যায়নি। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ভিত্তি করে যে কারফিউ জারি হয়েছিল এবং সে সময়ে জনসাধারণের কার্যকলাপ অবলম্বনে রচিত।

'কবর' (১৯৬৬) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত।

'দণ্ড' (১৯৬২) সমাজ সমালোচনামূলক রচনা। কাহিনীতে চোরের চৌর্যবৃত্তি স্থান পেয়েছে।

'দণ্ডধর' রচনা ও প্রকাশ কাল ১৯৬২ সাল। বাস্তব জগৎ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রকাশ কাহিনীতে প্রতিফলিত।

'একতলা দোতলা' রচনা ১৯৬৫ সালে। ১৯৬৫ সালেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের টেলিভিশনে নাটক আকারে প্রথম পরিবেশিত হয়। কাহিনীতে একতলা দোতলা ভাড়াটেদের বসবাসের কৌতুককর কাহিনী অন্তর্ভুক্ত।

'দণ্ডকারণ্য' রচনা ১৯৬৫ সাল, প্রকাশকাল ১৯৬৬ সাল। কাহিনীর প্রথমাংশ রামায়ণের রাম-সীতার বনবাস যাপনের ঘটনা। শেষাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর প্রেম নিবেদন ও অন্যান্য ঘটনা নিয়ে রচিত।

'কুপোকাৎ' রচনা ও প্রকাশকাল ১৯৬৬ সাল। শিশুদের উপযোগী হাস্যরসাত্মক কল্পকাহিনী।

Dhaka University Institutional Repository

'মর্মান্তিক' (১৯৬৭) পাশ্চাত্য সঙ্গীত অবলম্বনে লোকপ্রিয় হাস্যরসাত্মক ঘটনা নিয়ে কাহিনী রচিত।

'বংশধর' (১৯৬৭) কাহিনীতে ব্যক্তি, পরিবার ও সাধারণ জীবনের ঘটনা অন্তর্ভুক্ত।

'একটি মশা'-এর রচনা ও প্রকাশ কাল জানা যায়নি। এই নাটকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী চেতনার বিদ্রূপাত্মক প্রকাশ লক্ষণীয়।

'নেতা'-এর রচনা কাল জানা যায়নি। এটি অপ্রকাশিত রচনা। কাহিনীতে ১৯৫৩ সালের প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলনের কতিপয় ক্ষমতাসীন দলের সংঘর্ষের চিত্র ফুটে উঠেছে।

'গুণ্ডা' (১৯৪৪) গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। এটি সমাজ সমালোচনামূলক রচনা।

'ঢাক' রচনাকাল অজ্ঞাত ও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত সমাজ সমালোচনামূলক রচনা।

'সংঘাত' (১৯৪৩) সালে রচিত নাটিকাটি অপ্রকাশিত ও সমালোচনামূলক ব্যঙ্গাত্মক রচনা।

পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নাটক

১. 'কেউ কিছু বলতে পারে না' (১৯৫৩) জর্জ বার্নার্ড শ'-এর You never can tell-এর বাংলা অনুবাদ ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত। কাহিনীতে হাস্যরস ও তীর্যক ব্যঙ্গাত্মক বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে।

২. 'রূপার কৌটা' (১৯৫১) জন গলস্ওয়ার্দীর The Silver box-এর বাংলা রূপান্তর। বাংলা একাডেমী কর্তৃক গ্রন্থাকারে ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত।

৩. 'মুখরা রমণী বশীকরণ' উইলিয়াম শেকস্পীয়রের Taming of the shrew-এর অনুবাদ। ১৯৬৯ সালে 'পরিক্রম' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে।

৪. 'জনক'-জোথন (১৯৭০) অগাষ্ট স্ট্রিন্ডবার্নের The father-এর অনুবাদ। নাটকের কাহিনী মনস্তত্ব নির্ভর, নারী-পুরুষের তীব্র টানাপোড়েন, ভালোবাসা, ঈর্ষা, ঘৃণার প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তি জীবনের সঙ্কট রূপায়িত।

একাঙ্ক অনুবাদ নাটক

১. 'স্বামী সাহেবের অনশনব্রত' (১৯৪৬) উর্দু নাট্যকার নাকারা হায়দ্রাবাদীর নাটকের বাংলা রূপান্তর।

২. 'জমা খরচ ও ইজা' মূল রচয়িতা লেফটেন্যান্ট কর্নেল এলিয়ট ক্রসে উইলিয়ামস এর E and OE-এর বাংলা রূপান্তর।

Dhaka University Institutional Repository

৩. 'গুর্গল খাঁর হীরা' অ্যালান মস্কহাউস এর The grand chums diamond-এর বাংলা রূপান্তর (১৯৬৮)।

৪. 'মহারাজ' ইডেন ফিলিপস-এর Something to talk about-এর বাংলা রূপান্তর (১৯৬৮)।

৫. 'ললাট লিখন' রিচার্ড হিটস-এর The man born to be hanged-এর বাংলা রূপান্তর (১৯৬৯)।

উপরিউক্ত একাঙ্কিকা অনুবাদ নাটকগুলো বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয় কিন্তু এগুলির রচনাকাল সম্পর্কে জানা যায় না।

অসমাপ্ত অনুবাদ নাটক

১. 'ওথেলো' উইলিয়াম শেকস্‌পীয়ার-এর Othelo-এর বাংলা অনুবাদ। মুনীর চৌধুরী সম্পূর্ণ নাটকটি অনুবাদ করে যেতে পারেননি। মূল নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের ৩৫৯ লাইন পর্যন্ত অনুবাদ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর অগ্রজ কবীর চৌধুরী বাকি অংশ অনুবাদ করেন। মুনীর চৌধুরী অনূদিত অংশ থিয়েটার পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। দুই অনুবাদকের নামই গ্রন্থে অন্তভুক্ত করা হয়।

২. 'রোমিও জুলিয়েট' উইলিয়াম শেকস্‌পীয়ার-এর Romeo and Julliet-এর বাংলা রূপান্তর।

৩. 'গাড়ীর নাম বাসনাপুর' টেনেসী উইলিয়ামস্‌-এর এ স্ট্রীট কার নেমড্‌ ডিজায়ার-এর অনুবাদ। মুনীর চৌধুরী অনুবাদ করেছিলেন মূল নাটকের এগারো অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের কিছুটা। তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রী লিলি চৌধুরী বাকি অংশ অনুবাদ করেন। উভয় অনুবাদকের নামেই ১৯৮১ সালে নাটকটি বাংলা একাডেমী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৪. 'অকারণ ডামাডোল' উইলিয়াম শেকস্‌পীয়ার-এর Much ado about nothing-এর বাংলা রূপান্তর।

৫. 'ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান' জর্জ বার্নার্ডা 'শ-এর Man and Superman-এর বাংলা অনুবাদ।

৬. 'ইলেকট্রার জন্য শোক' ইউজীন ও নীল-এর Morning Becomes Electra-এর বাংলা অনুবাদ।

৭. 'দি স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল' শেরিডান এর The School for Schandal-এর অনুবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

মুনীর চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থা থেকেই নাটক রচনা শুরু করেন। নাটক রচনা, মঞ্চস্থ, অভিনয়, নির্দেশনার প্রতি তাঁর ছিল অসম্ভব রকম ঝোঁক, এক রকম নেশাও বলা যায়। তাঁর সমগ্র নাট্যকর্মের মধ্যে মৌলিক নাটকের সংখ্যাই বেশি। নাটকের প্রতি অনুরক্ত থাকায় জেল জীবনেও নাটক রচনা করেছিলেন। জেল জীবনের নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম হল (১৯৫২-৫৪) 'কবর, 'কেউ কিছু বলতে পারে না' ও 'রূপার কৌটা'। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তিনি নাট্যকর্মের সাথে জড়িত ছিলেন। নাটক রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মুনীর চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের নাটক শাখাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গেছেন।

(জিয়াউল হাসান, মুনীর চৌধুরীর নাটক, জীবনী গ্রন্থমালা, ১০ম খণ্ড)।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক নাটক বিচার

নাটক

রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী করে যে সাহিত্য রচিত হয়, তা-ই সাধারণত নাটক। নাটক চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং তা অভিনয়ের দ্বারা পরিস্ফূট হয়। সেজন্য নাটক মাত্রই দৃশ্যকাব্য। অনেকে নাটককে জীবনের যথাযথ চিত্রলিপি বলে প্রচার করেছেন। সমালোচকের মতে, "The show on the stage must reproduce the forms of the things represented nor more, nor less."

আধুনিক নাট্যকার Granville Barker নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "A play is anything that can be made effective upon the stage of a the rather by human agency. And I am not sure that this definition is not too narrow (P.....)

রসের সে ব্যঞ্জনা বুদ্ধিগ্রাহ্যই হোক বা আবেগময়ই হোক আসল কথা নাটক সকল সময় গতিশীল ও সংঘাতপূর্ণ হবে। এই বৈশিষ্ট্য নাটকে লক্ষণীয় যে, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিরোধ ও ব্যক্তির সঙ্গে অবস্থার সংঘর্ষ।

নাটকের আঙ্গিক, রস ও শিল্পরীতি

নাটক বিচার করতে গেলে নাটকে আঙ্গিক, রস ও শিল্পরীতির একটা বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। নাটকে আঙ্গিক বা শিল্পরীতি শিথিল হলে কোনো নাটক প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা পায় না। সাহিত্য রচনার একটা নিয়ম-নীতি আছে, আর তা হলো শিল্পরীতি (Technique) বা তার ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণ সম্পর্কে না জানলে সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। তবে ব্যাকরণই সর্বস্ব তা নয়। নাটকের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। সাহিত্য ও ব্যাকরণ যেমন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত নাটক ও আঙ্গিক তেমন পরস্পর সম্পর্কিত। একটার চেয়ে অন্যটা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকের মধ্যে যে রস সৃষ্টি করা হয় তাই নাটকের প্রাণ। নাটক একটি ঘটনার সাথে আর একটি ঘটনার প্রাণগত বন্ধন দৃঢ় করে তোলে। এই বন্ধনের ফলে একটা

Dhaka University Institutional Repository

ভাবরসের সৃষ্টি হয়। তাতে নাটকের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। অভিনয়কালে অভিনেতা মানব জীবনের যে বিশেষ ভাবটি উপস্থাপিত করেন তা অভিনেতার সূক্ষ্ম অভিনয়ের ফলে দর্শকদের মনে আনন্দের সৃষ্টি করে। দর্শক ও অভিনেতা তখন নিজেদের একাত্ম মনে করেন। এই একাত্ম রসানুভূতি থেকে নাটকের জন্ম। সেজন্য নাটকের জগৎ বস্তুবিশ্ব নয়; বস্তুবিশ্বের অতীত এক সৌন্দর্যময় মায়ালোক।

নাটকের শ্রেণীবিভাগ

নাটকের শ্রেণী বিভাজন করা দুঃসাধ্য কাজ, কারণ নাটকে একটি বিভাগের সাথে আর একটি বিভাগ সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং নিরঙ্কুশভাবে শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকের কথা উল্লেখ করে বলা যায় যে, নাটকটি একদিকে ট্র্যাজেডি আবার অন্যদিকে সমস্যামূলক নাটক। অনেকে আবার রূপক নাটক হিসাবেও চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে বিক্রম দম্ভোল্লত বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ আর তপতী ভারতের সনাতন আত্মা বা প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদ। সুতরাং একই নাটক বহু শ্রেণীগত হতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। ইতালির বিখ্যাত দার্শনিক 'ক্রোচ' বলেছেন, সাহিত্য ও শিল্পের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়। তাঁর মতে শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে কতগুলো মূলনীতি অনুসরণ প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই মূলনীতি মানতে গেলে সাহিত্যিক ও শিল্পীর সৃজন শক্তিকে অস্বীকার করতে হয়। প্রত্যেক সৃষ্টিরই পৃথক পৃথক রস মাধুর্য আছে একথা তিনি স্বীকার করেন। তাঁর মতে ট্র্যাজেডি, কমেডি, রোমান্স, গীতিকবিতা প্রভৃতি রচনা নামের মাধ্যমে পাঠকের কাছে পরিচিতি লাভ করে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই বলে এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না।

সমালোচকদের মতে নাটককে মোটামুটি চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. রস প্রধান : এর মধ্যে পড়ে– ট্র্যাজেডি, কমেডি, মেলোড্রামা, ফার্স।

২. ভাব প্রধান : এর মধ্যে পড়ে– ক্লাসিক্যাল, রোমান্টিক, বাস্তব।

৩. রূপ প্রধান : এর মধ্যে পড়ে– গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য।

৪. উদ্দেশ্য প্রধান : এর মধ্যে পড়ে– সমস্যামূলক নাটক, রূপক নাটক, চরিত নাটক ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক নাটক

নাট্যচর্চার প্রথম পর্যায়ে পৌরাণিক, কাল্পনিক ও সামাজিক বিষয় অবলম্বনে নাটক লিখতে হত। পরবর্তীকালে নাট্যচর্চার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের পরিধিও ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। এই পর্যায়ে ঐতিহাসিক ঘটনা নাটকে আশ্রিত হয়।

ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের কাহিনী দুভাবে আশ্রিত হতে পারে। প্রথম পর্যায়ে নাট্যকার ইতিহাসের বিশেষ কালবৃত্তকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনে বিস্তৃত একটি কালকে কাহিনীসূত্রে গ্রন্থন করতে পারেন। এখানে নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য থাকে অতীত জীবনের পরিবেশ ও জীবন পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ইতিহাসের একটি কাহিনী অবলম্বনে নাট্যকার তার নাট্যিক রূপ দিয়ে থাকেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয় ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্যের অবিকৃত রূপ। নাট্যিক প্রয়োজনে ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে কাল্পনিক ঘটনার মিশ্রণ ঘটলেও ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি নাট্যকারের নিষ্ঠাবোধ প্রয়োজন। কাহিনীর প্রয়োজনে ও নাট্য দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে নাট্যকার অনৈতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করলেও তা ইতিহাসের ঘটনার অনুগামী হয়ে থাকে। নাটকে অন্তর্ভুক্ত চরিত্রকে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ করে তুলতে সক্ষম হলেই ঐতিহাসিক নাট্যকারের সার্থকতা। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন, 'লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল'।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, ১৩৬১-১৫৯)

রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে কাব্যসত্যের মেলবন্ধনের মাধ্যমে প্রকৃত ঐতিহাসিক দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ঐতিহাসিক নাট্যকার ইতিহাসের চরিত্রকে নাটকে উপস্থাপন করেন ঐতিহাসিক সত্য ও সাহিত্যিক রসের মধ্যে দিয়ে। ইতিহাসের ঘটনাকে অবিকৃত রেখে তার সত্য যদি প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলেই চরিত্রের মর্যাদার কোন হানি হয় না। নাট্যকার নাট্যিক দ্বন্দ্ব ও কাহিনীর গতিশীলতা সংরক্ষণের জন্য ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ, স্থান-কাল ও পরিবেশের ঐক্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেন। অনেক ক্ষেত্রে নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার থাকলেও তা মূল কাহিনীর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যে অনেকেই ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত টডের 'এ্যানালস এ্যান্ড এ্যান্টিকুইটিস অব রাজস্থান' গ্রন্থ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনা করেন। বাংলা নাট্য সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের গুরুত্ব বিদ্যমান। পরবর্তীকালে যাঁরা ঐতিহাসিক নাটক রচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমৃতলাল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুষ বিক্রম', 'সরোজিনী' ও 'অশ্রুমতি' এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের 'সাজাহান' ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য

ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার নাটকের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, ইতিহাসের বিশেষ যুগের কোন কাহিনী নাট্যকারের ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করার কারণে তিনি সেই কাহিনীর নাট্যিক রূপায়ণে অগ্রসর হন। অন্য একটি দিকও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। অনেক সময় দেখা যায় যে, যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক মনোভাব ঐতিহাসিক চরিত্রকে সম্মুখে উপস্থাপন করে আন্দোলনে বা নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান করেন। বিংশ শতকে বাংলাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় বাঙালি জাতি সিরাজউদ্দৌলা চরিত্রকে উপস্থাপন করে অনুপ্রাণিত হওয়ার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রের সিরাজউদ্দৌলা চরিত্রের কলঙ্ক অবলেপন ও দেশানুরাগী শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় 'সিরাজউদ্দৌলা' গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটক প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে স্বাদেশিক আন্দোলনের গতিকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। একই কারণে দাক্ষিণাত্যের শিবাজী ও রাজপুতানার প্রতাপসিংহ কেন্দ্রিক নাটকও দর্শকদের আবেগ ও আদর্শকে উদ্দীপনায় বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। একদিক থেকে সামাজিক বা কল্পনাশ্রয়ী নাটক রচনার চেয়ে ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারের দায়িত্ব অনেক বেশি। যদিও নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য থাকে চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে ঘটনার সাহায্যে নাট্যিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি, তবুও এক্ষেত্রে ইতিহাসের ব্যত্যয় ঘটলে নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য অনেকাংশে খর্ব হতে বাধ্য। সেজন্য নাট্যকারকে অত্যন্ত সচেতনভাবে ঐতিহাসিক সত্য অক্ষুণ্ন রেখে চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সমালোচকরা এক বাক্যে একথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে নাটক সৃষ্টির ক্ষেত্রে নাট্যকারের মূল লক্ষ্য ইতিহাসের ঘটনা বর্ণনা নয়, ঐতিহাসিক সত্যকে অবলম্বন করে মানবজীবনে রস সৃষ্টিই প্রধান উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক চরিত্রের আবেগ, ক্রিয়াকলাপ ও ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিক প্রকাশের উদ্দেশ্যে নাট্যকার তাঁর কল্পনাশক্তির সাহায্যে চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলেন।

কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনে নাট্যকার ইতিহাসের কাহিনী ও যুগ-পরিবেশকে কল্পনার স্পর্শে, কাহিনীর প্রয়োজনে অনেক সময় ইতিহাস-বহির্ভূত চরিত্র ও শাখা কাহিনী অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ঐতিহাসিক সত্যকে রস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জীবন সত্য হিসেবে রূপ দেন। এখানেই একজন ঐতিহাসিক নাট্যকারের সার্থকতা। জহুরা নামে কোন ঐতিহাসিক চরিত্র না থাকলেও নাট্যকার নাট্যিক প্রয়োজনে সিরাজউদ্দৌলা নাটকে তাকে জীবন্ত ও সাহিত্যরসসিক্ত করে তুলেছেন। মুনীর চৌধুরীর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকে নজীবউদ্দৌলা ও অন্যান্য চরিত্র ঐতিহাসিক হলেও তাঁদের প্রেমিকার চরিত্রগুলি একান্তভাবে অনৈতিহাসিক। নাট্যকার মূল চরিত্রের পাশে এই শ্রেণীর চরিত্র কৌশলের সঙ্গে সন্নিবেশ করায় তা কোন সময়ে অনৈতিহাসিক চরিত্র বলে মনে হয় না।

ঐতিহাসিক নাটক রচনায় নাট্যকারের স্বাধীনতা ও সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। ইতিহাসের কাহিনী অবলম্বনে ঐতিহাসিক নাটক রচিত হলেও নাট্যকারের কতগুলি সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবোধ প্রয়োজন। সমালোচকরা এই দিকটি 'ঐতিহাসিক সত্য' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ঐতিহাসিক সত্যের মধ্যে স্বীকৃত হল কাহিনীর মৌল রূপ, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও সময়কাল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধে এই দিকটি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যায়, "সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উল্টো করিয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ে। সেই এক দমকাতেই কাব্য একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়।" ঐতিহাসিক এই সত্যের ক্ষেত্রে উপন্যাস বা নাটকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করে জাতীয় চেতনা উদ্বোধনে সাহয়তা করতে চেয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকে ওসমান ও জগৎসিংহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। উপন্যাসে জগৎসিংহকে বীর ও তাঁর তুলনায় ওসমান ও কতলু খাঁকে ভীরু হিসেবে অঙ্কিত করলেও ইতিহাসে তাঁদের সম্পর্কে বিপরীত তথ্য বিদ্যমান। ইতিহাসে ওসমান খাঁ বীর ও জগৎসিংহ মদ্যপ ও কাপুরুষ হিসাবে চিহ্নিত।

(Jadunath Sarkar, ed. History of Bengal, Vol. II, 1948-241)

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক সত্যকে লংঘন করার অর্থ শিল্পসত্যের লংঘন। অনেক নাট্যকার ঐতিহাসিক সত্যের ওপর আঘাত না করে ইতিহাসে অনুল্লিখিত ও অনুদঘাটিত দিক কল্পনার সাহায্যে পূর্ণ করে তাকে নাট্যিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রসঙ্গক্রমে অজিতকুমার ঘোষ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের ইতিহাসনিষ্ঠা আলোচনা প্রসঙ্গে অপরেশচন্দ্রের 'রঙ্গালয়ের ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থ থেকে যে চিত্রটি উল্লেখ করেছেন এখানে তা উদ্ধৃত করা যায়। "গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতেন, তখন তিনি সে বিষয়ে যাহা কিছু ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক তথ্য সমস্তই পাঠ করিতেন। সিরাজদ্দৌলা লিখিবার পূর্বে তিনি মুর্শিদাবাদ ও সিরাজ সম্পর্কীয় যাবতীয় ঐতিহাসিক বিবরণ ও পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে নাটকের উপাদান বাছিয়া লইয়া ছিলেন।"

(নাটকের কথা পৃ. ১৭৪-৭৫)।

ঐতিহাসিক নাট্যকারের লক্ষ্য থাকে ঐতিহাসিক কাহিনীর মাধ্যমে একটি যুগের পরিবেশ ও আবহ সৃষ্টি করে সেই যুগটি ঘটনার মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলা। নাট্যিক প্রয়োজনে ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত হয় নাট্যকারের কল্পনাশক্তি। এই প্রয়োজন সাধনের জন্য নাট্যকার কৌশলের সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে কাল্পনিক কাহিনীর মিশ্রণ ঘটান। ঐতিহাসিক ঘটনার নাট্যরূপ প্রদানে নাট্যকার ঐতিহাসিক ভাবরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অঙ্ক বিভাগের মাধ্যমে চরিত্রের দ্বন্দ্ব প্রকাশের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেন। দ্বন্দ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে কাহিনী সংঘটনের সঙ্গে বলিষ্ঠ সংলাপও প্রয়োজন। সেজন্য, সামাজিক বা কাল্পনিক নাটকের সঙ্গে ঐতিহাসিক নাটকের ওজঃগুণবিশিষ্ট সংলাপের পার্থক্য বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

রক্তাক্ত প্রান্তর

'মহাশ্মশান'-এর কাহিনীর ঐতিহাসিক দিক

কবি কায়কোবাদ তাঁর 'মহাশ্মশান' কাব্যের কাহিনী গ্রন্থন করেছেন ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে। ইতিহাসের সত্য ঘটনা থেকে জানা যায়, মোঘল আমলে ভারতের পানিপথে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ্ এর রাজত্বের শেষ ভাগে আহমদ শাহ আবদালী পাঞ্জাব আক্রমণ করেন। যুদ্ধে যুবরাজ আহমদ শাহ পরাজয় বরণ করেন। এই পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে না পেরে তিনি পুনরায় আহমদ শাহের শাসনামলে দুবার ভারত আক্রমণ করে কাশ্মীর ও পাঞ্জাব অধিকার করেন। আহমদ শাহ আবদালী দুররানী চতুর্থবার ভারত আক্রমণকালে দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন দ্বিতীয় আলমগীর। এই সময় দিল্লী ও মথুরায় লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের রাজত্বকালে আহমদ শাহ আবদালী পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের পিছনে কতকগুলো কারণ ছিল।

প্রথম কারণ : এই সময় ভারতে মারাঠা জাতি তাদের সাম্রাজ্য যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত করে। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে। কয়েকটি দেশীয় শক্তি মারাঠা কর্তৃক অপদস্থ হওয়ায় তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। রোহিলা প্রধান নজীবউদ্দৌলা মারাঠাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আহমদ শাহ আবদালীকে ভারত আক্রমণের জন্য আহ্বান জানান।

দ্বিতীয় কারণ : আহমদ শাহ আবদালী পাঞ্জাব জয় করে তাঁর পুত্র তৈমুরকে পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত করেন। রঘুনাথ রাও এর অধীনে মারাঠারা তৈমুরকে বিতাড়িত করে পাঞ্জাব অধিকার করেন। এতে আবদালী শাহ ক্রোধান্বিত হয়ে নজীবদ্দৌলার আহ্বানে সাড়া দেন। অযোধ্যার নবাব তাঁর সাথে যোগ দেওয়ার পর ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে আহমদ শাহ আবদালী পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের পরাস্ত করেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অন্যান্য যুদ্ধের চেয়ে রাজনৈতিক কারণে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী (কে. আলী, পৃ. ১৪৭)।

কবি কায়কোবাদ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে তাঁর মহাকাব্য মহাশ্মশান রচনা করেন। মহাশ্মশান কাব্য সাতটি সর্গে বিভক্ত। প্রতিটি সর্গে রয়েছে পানিপথ প্রান্তর এবং সাথে যুক্ত হয়েছে পাত্র-পাত্রী ও তাদের কার্যকলাপ।

প্রথম সর্গে আছে পানি পথ প্রান্তর। মারাঠা ও আবদালীর শিবির ও যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় সর্গ : পানিপথ প্রান্তর। মারাঠা ও মুসলমানদের আবদালী সৈন্যদের মহাসমর।

তৃতীয় সর্গ : পানিপথ প্রান্তর। মুসলমান শিবির।

চতুর্থ সর্গ : পানিপথ প্রান্তর। দুররানী শিবির।

পঞ্চম সর্গ : পানিপথ প্রান্তর। কারাগৃহ মোসলেম শিবির।

ষষ্ঠ সর্গ : পানিপথ প্রান্তর। সরস্বতী নদীর তীর, বিশ্বনাথের শ্মশান, যোগিনী মূর্তি।

কাব্যে মারাঠা ও আবদালী বাহিনী প্রতিপক্ষ হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। দুই জাতিই প্রবল শক্তির অধিকারী। মারাঠা পক্ষে নেতৃত্ব দেন সদাশিব রাও আর মুসলিম পক্ষে নেতৃত্ব দেন আহমদ শাহ আবদালী। আহমদ শাহ আবদালী ছিলেন রণকৌশলে পারদর্শী, অসীম সাহসী ও বীর যোদ্ধা। আবদালীর সাথে ছিলেন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা। যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্ত ছিল প্রস্তুতি পর্ব। আবদালীর সৈনিকরা পানিপথ প্রান্তরে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে শিবিরে অবস্থান করে। অপর দিকে মারাঠা পক্ষকে উদ্বিগ্ন দেখা যায়। তাদের স্বগতোক্তি নিম্নরূপ : "এমনিভাবে অসহায়, অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় আর কতদিন কাটাবো। মুসলমানরা অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করছে, হত্যা করছে, লুটতরাজ করছে। তারা যুদ্ধ করবে না—সন্ধি চায়। কিন্তু মুসলমান সৈনিকগণ সন্ধি করবে না। সুতরাং এবার আমাদের পরাজয় অবিনার্য,' কারণ রণকৌশলে আহমদ শাহ আবদালী পারদর্শী। মারাঠা পক্ষ পরাজিত হওয়া লজ্জাকর তা স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়। নিজেদের ভাগ্য ও ভারতবর্ষের ভাগ্যের পরিণতির কথা ভেবে তাঁরা ভীত ও শঙ্কিত। সেজন্য তারা নিজেদের কিছুটা সামলে নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে দৃঢ় চিত্তে অগ্রসর হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করবে। শত্রুদের অবরোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যুদ্ধে তারা পরাজিত হলে বিশাল ভারতবর্ষ বিদেশীদের করতলগত হয়ে যাবে। সিংহাসন দখলের পর মুকুট তাদের মাথায় শোভা পাবে। পরাজয়ের গ্লানি মারাঠা জাতির পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। সুতরাং যে করেই হোক, হয় সন্ধি অথবা যুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে। প্রথম সর্গে এভাবে মারাঠা ও মুসলিম জাতির যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে দেখা যায়। দ্বিতীয় সর্গে প্রভাতেই যুদ্ধারম্ভের ঘটনা বর্ণিত। হিন্দু-মুসলিম উভয় পক্ষই বীর বিক্রমে যুদ্ধ করছে। তর্জন গর্জন ও গোলাবারুদের আওয়াজে পানিপথ এক ভয়াবহ রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। মুসলমান পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছেন কাবুলাধিপতি আহমদ শাহ আবদালী। অপূর্ব তাঁর রণকৌশল ও বুদ্ধিমত্তা। তিনি অসীম সাহসের অধিকারী। বীর যোদ্ধা হলেও তিনি মানবিক গুণ সম্পন্ন মানুষ। যুদ্ধ করতে যেয়ে স্বধর্ম ও স্রষ্টাকে বিস্মৃত হননি। সদাশিব রাওও আবদালী সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করছেন। কাব্যে একদিনের যুদ্ধের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধে চার লক্ষ সৈন্য অসংখ্য উট ও হাতি প্রাণ হারায়। অগণিত ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হয়। যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের জয় ও মারাঠা জাতির পরাজয় ঘটে। ইতিহাসে এই যুদ্ধ তিনমাস ব্যাপী স্থায়ী হয়। যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্র শক্তি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আবদালীর পক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করলেও তাঁরা এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, আহমদ শাহ আবদালী কাবুলে ফিরে যাওয়ার পর বহিঃশক্তির হাত থেকে ভারত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার শক্তি আর তাঁদের ছিল না। এই যুদ্ধেই ভারত ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি পত্তনের পথ সুগম করে দেয়।

কায়কোবাদের সমগ্র মহাশ্মশান কাব্যের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ দুটো সর্গে যুদ্ধের পটভূমি রচিত। তৃতীয় সর্গে যুদ্ধের পরে রণক্ষেত্রের দৃশ্যের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত। চতুর্থ সর্গে যুদ্ধের পর নীরব-নিস্তব্ধ পরিবেশের বর্ণনা।

পঞ্চম সর্গে জোহরা বেগম স্বামী ইব্রাহিম কার্দীর জন্য শোক প্রকাশ, অতীত স্মৃতিচারণ। ষষ্ঠ সর্গে গোরস্থানের বর্ণনা এবং সপ্তম সর্গে বিশ্বনাথের শ্মশান ও যোগিনীর বর্ণনা।

কায়কোবাদ কাব্যে কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা সংরক্ষণে বিশ্বস্ত ছিলেন। ইতিহাস সচেতনতার পাশাপাশি তিনি কল্পনার দৃষ্টিতে যুদ্ধেক্ষেত্রের ভয়াবহ রূপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ লক্ষ্য করলেই এই মন্তব্যের যথার্থতা বোঝা যাবে। কাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্র আহমদ শাহ্ আবদালী, ইব্রাহিম কার্দী, সুজাউদ্দৌলা, নজীবউদ্দৌলা ইতিহাস থেকে গৃহীত। চরিত্রগুলো স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাঁরা সাহসী, মাতৃভূমি ও ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। স্বদেশের জন্য তাঁদের অপরিসীম ভালবাসার রূপটি কবি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশ ও ভয়াবহতা প্রথম সর্গে লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

এই সেই পানিপথ? দারুণ প্রান্তর?
এই সেই স্থান? সেই ভীষণ শ্মশান?
সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ ভারত সন্তান
দিয়েছিল ধর্মযুদ্ধে আপনার প্রাণ?

(মহাশ্মশান, প্রথম সর্গ)

দ্বিতীয় সর্গেও যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ রূপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

শুনি এ সঙ্গীত ধ্বনি স্তব্ধ পানিপথ
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে; নৈশ সমীরণ
গাইল বিষাদে যেন।

Dhaka University Institutional Repository

অথবা,

প্রলয়ের শিঙ্গা সম এ সঙ্গীত ধ্বনি
কি এক আতঙ্ক যেন দিল ছড়াইয়া
চারদিকে নিদ্রোত্থিত স্তব্ধ প্রকৃতি
উঠিল কাঁপিয়া ভয়ে সে ভীষণ স্বরে।

অথবা,

দিন দিন পানিপথ কাঁপিল সভয়ে
কাঁপিল সভয়ে পুনঃ প্রকৃতি সুন্দরী
কাঁপিল সভয়ে পুনঃ স্তব্ধ বিভাবরী
কি এক আতঙ্ক যেন উঠিল ভাসিয়া।

কায়কোবাদ এভাবে যুদ্ধের যে ভয়াবহ রূপ কাব্যে প্রকাশ করেছেন তা শিল্প কৌশলের পরিচায়ক। কাব্য পাঠ করার সময় আত্মবিস্মৃত হয়ে যুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হয় এবং পাঠকদের প্রাণে অজান্তেই ভীতির সঞ্চার হয়।

'মহাশ্মশান'-এর প্রধান চরিত্র আহমদ শাহ আবদালী, সুজাউদ্দৌলা, নজীবউদ্দৌলা, ইব্রাহিম কার্দী, সদাশির রাও, যশোবন্ত, মন্নুবেগ ওরফে জোহরা বেগম, বিশ্বনাথ রাও, যোগিনী, জাঙ্কাজী, বাহাও, নিমকোটল, বলজী, যাদুন, আতাখাঁ, সেলিনা, দিলীপ, বিশ্বনাথ, বালাজীরাও প্রভৃতি। মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন আহমদ শাহ আবদালী, সুজাউদ্দৌলা, নজীবউদ্দৌলা, মন্নুবেগ ও নিমকোটি। মারাঠাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন ইব্রাহীম কার্দী, বিশ্বনাথ রাও, সদাশির রাও, বলজী, যাদুন, জাঙ্কাজী, যোগিনী, যশোবন্ত বাহাও প্রভৃতি।

ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে যাঁদের চিহ্নিত করা যায় তাঁরা হলেন আহমদ শাহ আবদালী, নজীবউদ্দৌলা, সুজাউদ্দৌলা, বিশ্বনাথ রাও, সদাশিব রাও, ইব্রাহিম কার্দী, বাহাও, বিশ্বনাথ, জাঙ্কাজী, সিন্ধী প্রভৃতি। এসব চরিত্র ছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলো কবি কায়কোবাদের নিজস্ব সৃষ্টি।

(RC Majumder, PP 543-553)

আহমদ শাহ আবদালী, সুজাউদ্দৌলা, নজীবউদ্দৌলা, ইব্রাহিম কার্দী, বিশ্বনাথ রাও, নিমকোটি, সদাশিব রাও, জাঙ্কাজী প্রভৃতি চরিত্রগুলো ইতিহাসের মতই কাব্যে উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আহমদ শাহ্ আবদালী ইতিহাসে একজন সাহসী বীরযোদ্ধা, সেনাপতি ও সম্রাট হিসেবে চিহ্নিত। মহাশ্মশানেও তিনি মুসলিম পক্ষের দলনেতা, সাহসী, বীরযোদ্ধা, অপূর্ব রণকুশলী।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহিম কার্দী মারাঠা পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি পাশ্চাত্য কায়দায় রণকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত করা যায় :

"Ibrahim Khan Cardi, a brave Muslim artilleryman trained in Western methods of fighting under Bussy in the Nizams army, joined the Marathas."

(RC Majumder, P 548)

মহাশ্মশানেও কার্দী মারাঠা পক্ষ অবলম্বন করেন। আহমদ শাহ্ আবদালী ও ইব্রাহিম কার্দী দুই বীর সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করেছেন। নজীবউদ্দৌলা, সুজাউদ্দেলা ইতিহাসে উজ্জ্বল চরিত্র। ইতিহাসে নজীবউদ্দৌলা ছিলেন রোহিলা প্রধান। সুজাউদ্দৌলা ছিলেন অযোধ্যার নবাব। মহাশ্মশানে তাঁকে বীরেন্দ্র উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

যেমন,

বীরেন্দ্র সুজাউদ্দৌলা বলিতে লাগিল
বিপক্ষে সৈনিক দলে বামে ও দক্ষিণে
দণ্ডে দণ্ডে, পানিপথ করিয়া রঞ্জিত।

(দ্বিতীয় সর্গ)

ইব্রাহিম কার্দীকে বীর শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। মন্নুবেগ পুরুষ বেশে হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধ করেন।

'জোহরা বেগম তার পুরুষ বেশে
ধ্বংসিহে মারাঠা সৈন্য সুতীক্ষ্ণ শায়কে
মুহুর্মুহু।'

অথবা,

'মন্নুবেগ হস্তী পৃষ্ঠে বসিয়া সক্রোধে
বধিতে লাগিল বহু মহারাষ্ট্র সেনা।

(২য় সর্গ)

নজীবউদ্দৌলাকেও বীরেন্দ্র উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

'উৎসাহে নজীবউদ্দৌলা উঠিলা গর্জিয়া
সমগ্র মোগলে সৈন্য কাঁপায়ে প্রান্তর।'

(২য় সর্গ)

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র বলা হয়েছে,

'সংহারিয়া অসংখ্য মোস্লেম।
অমনি নজীবউদ্দৌলা ছুটিলা সে দিকে
ঝড় বেগে অকস্মাৎ একটি কলম্ব
দংশিল ভীষণ বেগে উরগের মত।
পেশবা পুত্রের বাস চক্ষের উপরে
সজোরে বীরেন্দ্র শর ফেলিলা উপাড়ি।

(২য় সর্গ)

সদাশিব রাও কাব্যে যোদ্ধা হিসাবে চিহ্নিত :

'এক লম্ফে সাদশিব উঠিল আস্ফালি
ভূমি হতে, অন্য অশ্বে করি আরোহন
সেই দণ্ডে, খড়্গাঘাতে বধিতে লাগিলা
উজিরের সৈন্য দল।

(২য় সর্গ)

আবার,

'সদাশিব গর্জিয়া ভৈরবে
মারিলা ভীষণ অসি আবদালীর শিরে
পূর্ণবলে সে তীব্র প্রহার
মুহূর্তে আবদালী শাহা মারিয়া হুঙ্কারি
তরবার; দুজনে প্রচণ্ড বিক্রমে
যুঝিতে লাগিলা।

(মহাশ্মশান ২য় সর্গ)

প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় অসীম সাহস ও বীরত্ব। প্রত্যেক বীরের মধ্যেই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রচণ্ডতম বাসনা। মুসলিম পক্ষ প্রথম থেকেই নিশ্চিত যে তাঁরা জয়ী হবেন। হিন্দু পক্ষ প্রথমে যুদ্ধ করতে চায়নি, তাঁরা যুদ্ধ সম্পর্কে একটা অনীহা প্রকাশ করেছেন। হিন্দু, মুসলিম উভয়েই ভারত মাতার সন্তান। উভয়ে সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে বসবাসের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রধান। মারাঠা পক্ষ সন্ধি করতে চাইলেও মুসলিম পক্ষ প্রস্তাবে সম্মতি জানায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

এই যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্র শক্তি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মুসলমানরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করা সত্ত্বেও তাঁরা এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, আহমদ শাহ্ আবদালী কাবুলে চলে যাওয়ার পর বহিঃশক্তির হাত থেকে ভারত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার শক্তি আর তাঁদের ছিল না। এই যুদ্ধেই ভারত ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি পত্তনের পথ সুগম করে দেয়।

'মহাশ্মশানে' কবি কায়কোবাদ ইতিহাস আশ্রিত কাহিনী অবলম্বন করে মহাকাব্য রচনার প্রয়াস পেয়েছেন এবং অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতীয় চেতনাকে প্রাধান্য দান করেছেন।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে হিন্দু মুসলমানের একটি ঐতিহাসিক সংগ্রামকে কাহিনীর প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে কায়কোবাদ দুই বীর জাতির বীরত্বের কাহিনী সমান সহানুভূতি ও বেদনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাব্যে গ্রহণ করেছিলেন। অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মহাশ্মশান কাব্যের ভূমিকায় তিনি বলেছেন,

"আমার এই কাব্যে আমি কোন সম্প্রদায়ের লোককেই আক্রমণ করি নাই। আমি হিন্দুদিগের প্রতি তেমন কোন ব্যবহার করি নাই যাতে তাঁদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যে স্থানে যে টুকু হওয়া দরকার এবং যাহা না হইলে কাব্যের অঙ্গহানি হইত, আমি কেবল তাহাই চিত্রিত করিয়া উহার প্রকৃত বর্ণ ফুটাইয়া দিয়াছি। আমি এই চিত্র নিরপেক্ষভাবেই অঙ্কিত করিয়াছি।

হিন্দুদিগকে হীণ বর্ণে চিত্রিত করি নাই বলিয়া আমার স্বজাতীয় ভাতৃগণ আমাকে মন্দ বলিতে পারেন। কিন্তু সত্যের অপলাপ করিবার অধিকার আমার নাই। তবে আমি মুসলমান, মুসলমানদিগের প্রতি আমার সহানুভূতি ও হৃদয়ের টান আছে কি না, তাহা যিনি কাব্য বিশ্লেষণ করিয়া কবি হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সক্ষম, তিনিই বুঝিতে পরিবেন। অন্য পক্ষে বিশেষত হিন্দুদিগকে কাপুরুষ সাজাইয়া, ভীরুতার বর্ণে রঞ্জিত করিয়া মুসলমানদিগের কি লাভ? কাপুরুষ বধে মুসলমানদিগের কি বীরত্ব? শৃগাল বধ করিতে রমণী পারে, সিংহ বধ করিতে বীরেরই দরকার; তাই হিন্দুদিগের বীরত্ব প্রদর্শন করিতে আমি কৃপণতা করি নাই।

আমি তাহদিগের সেই ভীষণ বীরত্ব যথাযথভাবে চিত্রিত করিয়া বিজয়ী মুসলমান বীর পুরুষদিগের বীরত্বের মাত্রা আরও অধিক বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি। মুসলমানগণ বীর পুরুষ, হিন্দুগণও বীর পুরুষ, এই দুই বীর জাতি হৃদয়ের উষ্ণ শোণিতে আপনাদিগের জাতীয় গৌরব ও ভীষণ বীরত্বকালের অক্ষয় পদে লিখিয়া গিয়াছেন; যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ইতিহাস থাকিবে ইহাদের বীরত্ব ও জাতীয় গৌরবের কথা ততদিন তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ইহা উভয়

Dhaka University Institutional Repository

জাতির পক্ষে গৌরবের কথা, তবে হিন্দুগণ বিজিত ও বিধ্বস্ত, মুসলমানগণ জয়দৃপ্ত ও বিজয় গৌরবে সম্মানিত। একজাতি দেশের জন্য, ধর্মের জন্য হৃদয়ের পবিত্র শোণিতে স্বদেশ রঞ্জিত করিয়া আত্মপ্রাণ বলিদান করিয়াছেন, অন্যজাতিও দেশের জন্য, ধর্মের জন্য, স্বজাতির কল্যাণের জন্য, হৃদয়ের পবিত্র শোণিতে স্বদেশ প্লাবিত করিয়া বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন; কমে কে? উভয় জাতির বীরত্বই প্রশংসার।"

(মহাশ্মশান গ্রন্থের ভূমিকা)

এই ভূমিকা থেকে কবি মনের প্রকৃতি ও কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব। পরবর্তীকালে নাট্যকার মুনীর চৌধুরী 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটক 'মহাশ্মশান'-এর কাহিনী অবলম্বন করে রচনা করেন। তিনি যুদ্ধের পরিণতি দেখানোর জন্য নাটক রচনা করেননি। তাঁর মধ্যে ছিল যুদ্ধ বিরোধী চেতনা। যুদ্ধ মানুষকে শুধু ধ্বংসই করে। তাই যুদ্ধ নয়, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার মাঝে মানুষ বেঁচে থাকুক, নাট্যকার মুনীর চৌধুরী এই প্রত্যাশায় নাটকের কাহিনী গড়ে তোলেন।

রক্তাক্ত প্রান্তর-এর কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা

মুনীর চৌধুরী 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের কাহিনী নিয়েছিলেন কবি কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' মহাকাব্য থেকে। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এই নাটকের পটভূমি। তিনটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ পানিপথ প্রান্তরে সংঘটিত হয়। প্রথম যুদ্ধটি হয় ১৫২৬ সালে সম্রাট বাবরের সাথে ইব্রাহিম লোদীর। যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদী পরাজিত ও মৃত্যুবরণ করেন। বাবর জয়লাভ করার ফলে মোঘল শক্তির সূত্রপাত ঘটে। দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৫৫৬ সালে মোঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে হিমুর। যুদ্ধে হিমু পরাজয় বরণ করেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৬১ সালে কাবুল অধিপতি আহমদ শাহ্ আবদালী ও মারাঠা শক্তির মধ্যে। মারাঠা বাহিনীর নেতৃত্ব করেন বালাজি রাও পেশোয়া।

পানিপথের যুদ্ধের ইতিহাস শোকাবহ ও ভয়াবহ। হিন্দু-মুসলিম দুই শক্তি পরস্পর পরস্পরের শক্তি প্রতিহত করার সংকল্প নিয়ে যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধের পরিণাম মারাঠা শক্তির পরাজয় ও পতন; মুসলিম শক্তির জয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ। যুদ্ধে অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি ও রক্তপাত হয়। ভারতের ইতিহাসে এই অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি ও রক্তপাতের ঘটনা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। মুসলিম পক্ষ জয়লাভ করলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বিপুলভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলাফল মানবিক দৃষ্টিতে যেমন বিষাদপূর্ণ তেমনি জাতীয় জীবনের জন্য দুঃখজনক।

রক্তাক্ত প্রান্তরের বিষাদময় ঘটনা অবলম্বনেই নাটকের কাহিনী গঠিত। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও ইব্রাহিম খা, শাহাদাৎ হোসেন, আকবর উদ্দিন প্রমুখ পূর্বসূরীদের পথ অনুসরণ করেন মুনীর চৌধুরী। নাটকের কাহিনী ইতিহাসের পটভূমিতে গঠিত হলেও হিন্দু-মুসলিমকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার এবং সঙ্কীর্ণ ধর্ম গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মানবীয় ঐক্যের আদর্শ লক্ষণীয়। নাট্যকারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধবিরোধী মনোভাব প্রকাশ করা। নাটকের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল মানুষের হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত জীবনকে যেভাবে আন্দোলিত করে তার উন্মোচন। ইতিহাসের সত্য ঘটনা প্রচারের উদ্দেশ্য নাট্যকারের ছিল না। তিনি মনে করতেন, ইতিহাসের মৃত ঘটনারাশিকে নতুন পরিচর্যা দান করে তাকে মঞ্চে নিজস্ব স্বপ্ন ও প্রত্যয়ের বাহন রূপে ব্যবহার করতে পারবেন বলেই ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছেন। কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করলে যে দিকটি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে তা হল জীবন-যুদ্ধের ভয়াবহ দিক ও অপরিমেয় ক্ষয়ক্ষতি। 'রক্তাক্ত প্রান্তর'-এর কাহিনী বিশ্লেষণ করলেও এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। নাট্যকার নাটকের কাহিনীতে শুধু ঐতিহাসিক সত্যতার ওপর জোর দিলে মানবিক আদর্শের প্রতিফলন ঘটত না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের ইতিহাস থেকে উপকরণ ও অনুপ্রেরণা নিয়ে মানবানুভূতির প্রকৃতি উন্মোচন করা। ইতিহাস থেকে তিনি যে এক বিশেষ উপলব্ধি অনুভব করেছিলেন তাকেই কল্পনা ও নাটকে প্রাণদান করেছেন।

সংক্ষেপে রক্তাক্ত প্রান্তরের কাহিনী

ভারতের পানিপথ প্রান্তরে মুসলিম ও মারাঠা শক্তি একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। যুদ্ধের জন্য দূর্গ গড়ে তোলা হয়েছে। প্রহরীরা দূর্গ পাহারা দিচ্ছে। মুসলিম শক্তির পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আহমদ শাহ্ আবদালী এবং মারাঠা শক্তির পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কাবুলের অধিপতি ইব্রাহীম কার্দী। একসময় ফরাসীদের নিকট থেকে রণবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করার পর ভারতে কোন মুসলিম রাষ্ট্রপতির অধীনে চাকরি না পেয়ে মারাঠাধিপতি পেশোয়ার (বালজি রাও পেশোয়া) অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন এবং নিজ কর্ম দক্ষতায় সেনাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

জোহরা বেগম ইব্রাহিম কার্দীর স্ত্রী। জোহরা বেগমের পিতা মেহেদী বেগকে মারাঠা বাহিনী হত্যা করে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধের জন্য স্বামীর প্রতি বিরাগ বশতঃ গৃহত্যাগ করেন। তিনি পিতৃহন্তা মারাঠা বাহিনীর বিরুদ্ধে আহমদ শাহ্ আবদালীর সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। বীরাঙ্গণা জোহরার ছদ্মনাম মন্নুবেগ। মুসলিম এবং মারাঠা শক্তি যখন মুখোমুখি তখন জোহরা ছদ্মবেশে মারাঠা কন্যা হিরণবালার সাহায্যে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে মারাঠা পক্ষ ত্যাগ করতে অনুরোধ জানান। জোহরা বেগম স্বামীর মনোভাব পরিবর্তনে ব্যর্থ হন। নির্দিষ্ট দিনে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে উভয় পক্ষেই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও রক্তপাত হয়। মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। ইব্রাহিম কার্দী গুরুতর আহত হয়ে মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী ও কারাগারে আততায়ীর হাতে নিহত হন। জোহরার সঙ্গে ইব্রাহিম কার্দীর মিলন হয় না। জীবনে এক অসহনীয় শূন্যতা নেমে আসে। এখানেই নাটকের যবনিকাপাত ঘটে। যবনিকাপাত ঘটলেও নাটকটি প্রেম, বিরহ ও মানবিক গুণ সম্পন্ন। ইব্রাহীম কার্দীর মৃত্যুতে জোহরা বেগমের যে মানসিক যন্ত্রণা শুরু হয় তার সাথে পাঠক হৃদয় ব্যথিত হয়।

চরিত্র বিচার

রক্তাক্ত প্রান্তর 'মহাশ্মশান'-এর কাহিনী অনুসরণে রচিত হলেও চরিত্র নির্মাণে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। এখানে ঘটনার ঘনঘটা বা চরিত্রের বাহুল্য নেই। তিনটি অঙ্কে নাটকটি সমাপ্ত। দৃশ্যসংখ্যা আটটি। প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য ও তৃতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য। নাটকে চরিত্র সংখ্যা এগারটি। নাটকের প্রধান চরিত্র হলো– আহমদ শাহ্ আবদালী, ইব্রাহিম কার্দী, নবাব নজীবউদ্দৌলা, নবাব সুজাউদ্দৌলা, আতা খাঁ, দিলীপ, বশির খাঁ, রহিম শেখ, জোহরা বেগম, জরিনা বেগম, হিরণ বালা, কিছু সৈনিক ও প্রহরীবৃন্দ।

নাটকের ঐতিহাসিক চরিত্র আহমদ শাহ্ আবদালী, ইব্রাহিম কার্দী, নবাব নজীবউদ্দৌলা, নবাব সুজাউদ্দৌলা প্রভৃতি। রহিম শেখ, বশির খাঁ, জরিনা বেগম, নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি। জোহরা বেগম, হিরণ বালা, আতা খাঁ, দিলীপ চরিত্র মহাকাব্য থেকে গৃহীত। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো ইতিহাস ও কাব্যের মতোই নাটকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ইতিহাস এবং মহাকাব্যে এরা যেমন প্রধান ভূমিকা রেখেছেন নাটকেও সমশ্রেণীর ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসে ইব্রাহিম কার্দীর পরিচয় একজন সৈনিক হিসাবে। মাহাকাব্যে তিনি মারাঠা বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। ব্যক্তি

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ হিসেবে তিনি একজন কর্তব্যপরায়ণ রণকুশলী, সত্যনিষ্ঠ এবং বীর সৈনিক। তিনি অকৃতজ্ঞ নন, তাঁর হৃদয়ে ছিল এক আত্মক্ষয়ী দ্বন্দ্ব। তাঁর সৈনিক জীবনের পরিণতি কাব্য ও নাটকে একইভাবে লক্ষণীয়। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের সাথে নিজের ভাগ্য ছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। নাটকের ঘটনার সাথে তাঁর নিয়তি ছিল নির্ভরশীল, তাই যুদ্ধ শেষে মুসলিম শিবিরে বন্দী হওয়া এবং মৃত্যুবরণ করা স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

ইতিহাসে ইব্রাহিম কার্দীর স্ত্রী হিসেবে জোহরা বেগমের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। মহাশ্মশান কাব্যে ও নাটেকে তাঁর পরিচয় আছে একজন সাহসী বীর সৈনিক হিসেবে। মন্নুবেগ ছদ্মনামধারী একজন কোমলমতি নারী আর ছদ্মবেশের বাইরে তিনি একজন বীর সৈনিক। নাটকে এই জোহরা বেগমই ঘটনাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায়। নাটকের প্রধান চরিত্র ইব্রাহিম কার্দী ও তাঁর স্ত্রী জোহরা বেগম। সৈনিক জীবনের কৃতজ্ঞতা বোধ ও একনিষ্ঠ সাধনায় ব্রত এ নারী। নারী শুধু কন্যা-জায়া-জননী ব্যতীত একজন বীর সৈনিকের ভূমিকাও যে পালন করতে পারে তা এই দুই প্রধান চরিত্র থেকে উপলব্ধি করা যায়।

ইতিহাসে সুজাউদ্দৌলার পরিচয় পাওয়া যায় অযোধ্যার নবাব হিসেবে। নাটকেও সেই পরিচয়ে তিনি পরিচিত। ইতিহাসে তিনি একজন উজ্জ্বল চরিত্র। কিন্তু নাটকে ইতিহাসের মতো তাঁকে অত সক্রিয় থাকতে দেখা যায় না। এখানে তিনি একজন পথ নির্দেশকারী দার্শনিকের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ধীর স্থির ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, সহজেই চারপাশের মানুষের মর্মস্থল অনুধাবন করতে পারতেন। তাই তিনি রাজপ্রসাদের মধ্যে থেকে বুদ্ধির প্রয়োগে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন। তিনি জানতেন যে যুদ্ধের মাধ্যমে কোন স্থায়ী সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সংগ্রামের চেয়ে শান্তি, বন্দীত্বের চেয়ে মুক্তি মানুষের জীবনে অনেক বড়।

নবাব সুজাউদ্দৌলার মতো নবাব নজীবউদ্দৌলাও ইতিহাসের এক উজ্জ্বল চরিত্র। ইতিহাসে নজীবউদ্দৌলা ছিলেন রোহিলা প্রধান। নাটকে তিনি রোহিলা পাঠান হিসেবে পরিচিত। তিনি প্রবল আবেগসম্পন্ন ও আদর্শবাদী। তিনি জোহরা বেগমের রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেও দেশপ্রেমিক।

আহমদ শাহ্ আবদালী ইতিহাসে এক বিশেষ চরিত্র। তাঁকে দেখা যায় একজন নেতা, সাহসী বীর যোদ্ধা, সেনাপতি ও সম্রাট হিসেবে। নাটকে তিনি কাবুলেশ্বর, রণকুশলী, বীর, সাহসী ও বিচক্ষণ। তাঁর নেতৃত্ব বহু বিভক্ত ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্য ও শৃঙ্খলা দান করেছে। নাটকে তিনি মুসলিম পক্ষের সর্বাধিনায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

আতা খাঁ, দিলীপ, বশির খাঁ এবং রহিম শেখ এই নাটকের ইতিহাস বহির্ভূত সাধারণ চরিত্র। বশির খাঁ ও রহিম শেখ নাটকে আহমদ শাহ্ আবদালীর দেহরক্ষী ও প্রহরী। আতা খাঁ ও বশির খাঁ কৌতুক ও হাস্যরসাত্মক চরিত্র। দিলীপ দুর্বৃত্ত কিন্তু রঙ্গরসের আধার। জরিনা বেগম নজীবউদ্দৌলার স্ত্রী। তাঁরা একে অপরের প্রতি আসক্ত। স্বামীর ভালবাসার প্রত্যাশী জরিনা বেগম, অন্যদিকে সৈনিক জীবনে নজীবউদ্দৌলা একজন কর্তব্য পরায়ণ সৈনিক। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ছোট স্বার্থকে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। জরিনা বেগম ছিলেন মহাকাব্যে নবাব পত্নী। সুখ-স্বচ্ছন্দ্যে স্বামীর সাহচর্যে জীবন ছিল মধুর। নাটকে তিনি একজন সাধারণ সৈনিকের স্ত্রী মাত্র। স্বামী বিচ্ছেদ জরিনা বেগমের জন্য অসহনীয় যন্ত্রণা। স্বামীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত সংলাপে তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'আপনি অন্ধ চরিতার্থতা লাভের একটা অলীক মোহে মত্ত হয়ে আপনি আপনার পৌরুষ, আপনার সাহস, আপনার শোভা, আপনার শক্তি, আপনার প্রাণ মাঠে-প্রান্তরে ছড়িয়ে ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছেন। সেখানে শুধু লাশ-রক্ত। আপনার দামের কদর সেখানে কে করবে? আমি উষ্ণ আমি জীবন্ত। কেন আমাকে ত্যাগ করবেন? আমাকে দান করুন। প্রতি কণা ভালবাসা শতগুণ প্রাণবন্ত করে ফিরিয়ে দেবো। যুদ্ধ পড়ে থাক।'

(রক্তাক্ত প্রান্তর, ২ অঙ্ক ২য় দৃশ্য)

মুনীর চৌধুরী নাটকের চরিত্র-চিত্রন বা ঘটনা সংস্থাপন কৌশলে সর্বত্রই নাটকীয় দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলেছেন।

নাটকে অনৈতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্র

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক নাট্যকাররা ইতিহাসকে আশ্রয় করে নাটক লিখতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে ইতিহাসের কাহিনীর সঙ্গে কল্পিত উপাদানে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নাটক রচিত হতে থাকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শ্রেণীর রচনার পথিকৃৎ। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্র লাল রায় প্রমুখ নাট্যকার তাঁদের অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটকে হিন্দু মুসলমানের বিরোধের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। দেশপ্রেমমূলক ঐতিহাসিক রোমান্টিক নাটকের প্রবর্তক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর নাটকে বাংলা ঐতিহাসিক নাট্যধারায় একটি বিশেষ ধারা লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় মীর মোশাররফ হোসেন আংশিক ইতিহাস ও পুঁথি সাহিত্যের কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে 'বিষাদ সিন্ধু' রচনা করেন। সংগত কারণেই গ্রন্থখানি ঐতিহাসিকতার দিক থেকে মর্যাদা পায়নি। বিষাদসিন্ধুর বিপরীতে ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে কায়কোবাদ 'মহররম শরীফ' কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যে কবি ইতিহাস সচেতনতার সঙ্গে সাজাত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাটক লেখার আদর্শ কিছুটা পরিবর্তন হয়। এই সময় যুদ্ধের অকল্যাণকর অবস্থা ও বর্বরতার নিন্দা করে কিছু নাটক রচিত হয়। এই প্রভাব মুনীর চৌধুরীর ওপরও লক্ষ্য করা যায়।

মুনীর চৌধুরীর নাটকের ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে দেশপ্রেম, মানব প্রেম প্রভৃতি উপাদান গ্রহণ করার ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়। মুনীর চৌধুরীর সমসাময়িক ঐতিহাসিক নাট্যকারদের মধ্যে আসকার ইবনে শাইখ উল্লেখযোগ্য (১৯২৫)। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'রক্তপথ', 'অনেক তারার হাতছানি', 'আগ্নিগিরি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'আগ্নিগিরি'তে নাট্যকার ফকির আন্দোলনের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে একটি লুপ্ত প্রায় অধ্যায়কে পুনরায় জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে অতীতের পটভূমিতে দেশপ্রেমের অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। আসকার ইবনে শাইখ আর মুনীর চৌধুরীর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো শাইখ ইতিহাসের পটভূমি অবলম্বনে দেশপ্রেম, অতীত কৃষ্টি ও সংস্কৃতি উপস্থাপনের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতেন। অন্যদিকে, মুনীর চৌধুরী ইতিহাসের সত্যতাকে গ্রহণ ও কাহিনীগত কাঠামো পটভূমিকা হিসাবে নির্বাচন করে যে নাটক রচনা করেছেন তা দেশ-কালের সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে চিরন্তন মানব-মানবীর হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন। এখানেই 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের স্বাতন্ত্র্য।

কাহিনী ও চরিত্রগত দিক থেকে বিস্তারিত আলোচনা করলে এই সত্যতার সমর্থন পাওয়া যায়। 'রক্তাক্ত প্রান্তর'-এর মূল কাহিনী পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। নাট্যকার শুধুমাত্র যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করেই নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটাননি। সেখানে তিনি কল্পনার আশ্রয়ে কিছু উপকাহিনী অন্তর্ভুক্ত করে যুদ্ধের কাহিনীকে বিস্তৃত পরিসরে স্থাপন করে ঐতিহাসিক কাহিনীকে পূর্ণতা দান করেছেন। উপকাহিনী বা শাখা কাহিনীর রূপায়নে কয়েকটি চরিত্রের সমাবেশ ঘটাতে হয়েছে। নাটকে

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক এবং প্রধান চরিত্র হিসেবে আহমদ শাহ্ আবদালী ইব্রাহিম কার্দী, নবাব নজীবউদ্দৌলা, সুজাউদ্দৌলা ছাড়াও নাট্যকার প্রধান ঐতিহাসিক চরিত্রের সাথে অনৈতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে নাট্যকাহিনীর বিন্যাস করেছেন।

মারাঠা দলের সেনাবাহিনীর ভিতরে ইব্রাহিম কার্দীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মারাঠা দলে যোগদানকারী কার্দী তাদের সেনানায়ক। ইতিহাসে তাঁর স্ত্রী জোহরা বেগমের কাহিনী অনুপস্থিত। কিন্তু নাটকে তাঁর বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যকার ইব্রাহিম কার্দীর সঙ্গে স্ত্রী জোহরা বেগমের উপস্থিতির বর্ণনা অতি কৌশলে উপস্থাপন করেছেন।

জোহরা বেগম ও ইব্রাহিম কার্দী স্বামী-স্ত্রী। একজন সৎ কর্তব্যপরায়ণ বীর সৈনিক হয়েও কার্দী কোন মুসলিম বাহিনীতে যোগদানের সুযোগ না পেয়ে মারাঠা বাহিনীতে যোগ দেন। এই সূত্রে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সংঘাতের সূত্রপাত হয়। প্রথম সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে কার্দী মুসলিম সৈনিক হয়ে মারাঠা বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করার ঘটনায়। দ্বিতীয় সংঘাত জোহরার বাবা মেহেদীবেগকে মারাঠা বাহিনী হত্যা করার ঘটনার মধ্যে দিয়ে জোহরা পিতৃহত্যার প্রতিশোধের স্পৃহা পোষণ করে বীরাঙ্গণা হয়ে স্বজাতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। জোহরা বেগমের ইচ্ছা ইব্রামি কার্দী মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসা লক্ষ্য করা যায়। জোহরা রূপবতী, প্রেমময়ী ও পতিপ্রাণা।

স্বজাতির প্রতি ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জোহরা স্বামীকে ত্যাগ করলেও প্রেমের বহ্নিতে স্বামী বিচ্ছেদে দগ্ধ হতে থাকেন। নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে শত্রু শিবিরে ছুটে যান কিন্তু পর মুহূর্তে বীরাঙ্গনা রূপে আবির্ভূত হন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। একদিকে ভালবাসা অপরদিকে প্রতিশোধের স্পৃহার দ্বন্দ্বে তিনি ক্ষতবিক্ষত। মনুবেগ ছদ্মনামে তিনি একবার বীরাঙ্গনা মূর্তি ধারণ করেন আবার পতিপ্রাণা প্রেমময়ী নারী হিসাবে জীবনকে সফল করার প্রত্যাশায় তাঁর জীবনে নেমে আসে চরম দুর্যোগ। যুদ্ধ শেষে স্বামী প্রাণত্যাগ করার পর তিনি নিজেও প্রাণ বিসর্জন করেন। নাট্যকার ইব্রাহিম কার্দীর সৈনিক জীবনের সাথে দাম্পত্য জীবনের সংযোগ ঘটিয়েছেন জোহরা বেগমের মাধ্যমে। আবার জোহরা বেগম শুধুমাত্র একজন সৈনিকের স্ত্রী হিসাবে ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারতেন কিন্তু তাঁকে বীরাঙ্গনা হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করে তাঁর নারী জীবনের দুটো রূপ দেখান হয়েছে। নাট্যকার তাঁকে সরাসরি বীরাঙ্গনা রূপে চিহ্নিত করেননি। তাঁর নেপথ্যে কারণ উপস্থাপন করেছেন। নাটকে ইব্রাহিম কার্দী ও

Dhaka University Institutional Repository

জোহরা বেগমের দাম্পত্য জীবনে ও সৈনিক জীবনের কাহিনী প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রাধান্য পেয়েছে। মূল কাহিনীর সাথে শাখা কাহিনী যুক্ত হওয়ায় নাটকে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে।

ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে শুধুমাত্র যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করলে দ্বান্দ্বিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হতো না। জোহরা বেগমের নারীসত্তা ও সৈনিকসত্তা নির্দেশে নাট্যকারের শিল্প কুশলতার পরিচয় বহন করে।

ইব্রাহীম কার্দীর জীবনে উপকাহিনী সংযোগের মাধ্যমে চরিত্র ও ঘটনার যেমন পূর্ণতা পেয়েছে তেমনি অন্যান্য চরিত্রেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, নবাব নজীবউদ্দৌলা একজন রোহিলা পাঠান। যুদ্ধে গমনকালে স্ত্রী জরিনা বেগমের সাহচর্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে বলে তিনি মনে করেন। যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে শিবিরে অবস্থানকালে মন্নুবেগের প্রতি নজীবউদ্দৌলার প্রেম নিবেদন মানবিক দুর্বলতারই পরিচায়ক। এখানেও শাখা কাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। নাট্যকারের যুদ্ধ বিরোধী চেতনা এখানে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল।

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার চরিত্র বিশ্লেষণ করলেও যুদ্ধবিরোধী চেতনা লক্ষ্য করা যায়। নবাব সুজাউদ্দৌলা তীক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। তিনি আহমদ শাহ আবদালীর আমন্ত্রণে মুসলিম বাহিনীর পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করতে আসেন কিন্তু শিবিরে অবস্থানকালে তাঁর তেমন উৎসাহ লক্ষণীয় নয়। ধীর স্থির, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী একটি চরিত্র। নাটকে তিনি একজন দার্শনিক নরপতি ও যোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছেন। কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে সমাধানের পথ তিনিই নির্দেশ করতেন। হঠাৎ যুদ্ধের প্রতি অনীহা পাঠককে বিস্মিত করে। মারাঠা শিবির আক্রমণ তিনি নিরর্থক মনে করেন। তিনি অযোধ্যার লুণ্ঠনকারীদের উচ্ছেদ করার কোনো সার্থকতা অনুভব করেননি। নিষ্ক্রিয়ভাবে অন্দরমহলে বসে বুদ্ধির ক্রীড়া অভ্যাসই বড় কাজ বলে মনে করেন। যুদ্ধ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত যে নবাব মারাঠাদের নিরতিশয় পাষণ্ড বলে জানতেন, তাদের রক্ত দিয়ে হলি খেলতে চাইতেন, পদতলে তাদের অস্থিচূর্ণ করে মাটির নীচে তাদের শব পুঁতে ফেলতে চাইতেন অথচ যুদ্ধের সময় তিনি উদাসীন। তাঁর এই উদাসীনতার জন্য নবাব নজীবউদ্দৌলার একটি উক্তি মনে পড়ে। নজীবউদ্দৌলা সুজাউদ্দৌলাকে বলেছেন, 'বিউলীর প্রান্ত রে তোমার যে মূর্তি দেখেছি, তার সঙ্গে তোমার আজকের এই উক্তির কোন সঙ্গতি নেই। তোমার চোখে চেতনার সর্বাঙ্গে আজ যে শৈথিল্য, যে ঔদাসীন্য, যে নির্বিকারত্ব প্রত্যক্ষ করছি তা সত্যি অপ্রত্যাশিত। কাল বিকেলেও তুমি অন্য মানুষ ছিলে।'

Dhaka University Institutional Repository

নবাব সুজাউদ্দৌলা উত্তরে বলেছেন, 'মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়, কারণে অকারণে বদলায়, সকালে বিকালে বদলায়।' জোহরার প্রতি স্নেহপরায়ণতা, কার্দী বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আবদালীর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ, সর্বোপরি অগাধ বিশ্বাস তাঁকে মহিমান্বিত করেছে।

(রক্তাক্ত প্রান্তর ২ অঙ্ক ২য় দৃশ্য)

নাটকে মারাঠা তরুণী হিরণ বালা ও আতা খাঁকে নিয়ে গঠিত হয়েছে আর একটি উপকাহিনী বা Subplot. আতা খাঁ শিশুকালে মারাঠা কর্তৃক অপহৃত হয় এবং বিন্ধ্য গিরিতে আশ্রয় নেয়। সে অমর নামে মারাঠা শিবিরে বড় হয়। এখানে থেকেই হিরণবালার সাথে তার সখ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা। হিরণবালার প্রতি সে প্রেমাসক্ত ও ভালোবাসায় আত্মলীন। অপরদিকে, মারাঠা সৈনিক দিলীপ তাকে ভালোবাসলেও তার প্রতি অনুরক্ত নয় বরং তার সঙ্গ তার কাছে অসহনীয়। দিলীপের শত্রুতার জন্য তার প্রাণ সংহারেও দ্বিধাহীন। অমরের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তার উক্তিতে, 'অমর বলো, আতা খাঁ বলো, মনে মনে তাকে আমি স্বামী বলে গ্রহণ করেছি। তাকে আমি ভালবাসি। এঘরে তার প্রবেশাধিকার আছে।' এখানে নাটকের প্রধান কাহিনীর সাথে অপ্রধান বা শাখা কাহিনী যুক্ত হয়েছে প্রেমকাহিনীর মাধ্যমে স্বতন্ত্র একটি আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য। হিরণবালা ও দিলীপ ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। মহাশ্মশানে কবি এই চরিত্র দুটোর যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন। মহাশ্মশান কাব্যে বাইশটি সর্গ জুড়ে এদের প্রেম কাহিনী বর্ণিত। নাটকে তাদের কাহিনী এত ব্যাপক সময় ধরে বর্ণিত না হলেও এদের কাহিনী নাটকে বর্জিত হয়নি। নাটকে আতা খাঁ একজন গুপ্তচর, হিরণবালা ও দিলীপ মারাঠা তরুণ-তরুণী। এক সঙ্গে শিবিরে অবস্থান করায় একে অপরের প্রতি প্রেমানুরাগ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, তাই নাটকের কাহিনী গতিশীল করতে উপকাহিনীগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

নাটকের প্রধান প্রধান চরিত্র ও ঘটনা ইতিহাস থেকে সংগৃহীত হলেও অপ্রধান চরিত্রগুলো ইতিহাস বহির্ভূত, কবি ও নাট্যকারের সৃষ্টি।

নাটকের সংলাপ

নাটকে কাহিনীর সম্প্রসারণ ও চরিত্র বিস্তারের ক্ষেত্রে সংলাপের গুরুত্ব অপরিসীম। সংলাপের সাহায্যে নাটকীয়তা সৃষ্টির মাধ্যমে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। নাট্যকার চরিত্রানুযায়ী সংলাপ সৃষ্টি করে থাকেন। প্রকৃত সংলাপ ব্যবহারের মধ্যেই নাটকীয় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, ভাষার আড়ম্বর বা দীর্ঘ সংলাপ চরিত্রকে নিস্প্রভ করে তোলে। গ্রামীণ জীবনের কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচিত হলে সংলাপে গ্রামীণ ভাষাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যক্ষেত্রে শিক্ষিত শহরবাসীর চরিত্রে চলিত রীতির ব্যবহার স্বাভাবিক। নিম্নশ্রেণীর চরিত্রে বিশেষ অঞ্চলের ভাষারূপ ব্যবহারের প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্রের আদর্শানুযায়ী ভাষা ব্যবহৃত হলেও একটি দিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আড়ম্বরহীন বা সাধু রীতির ভাষা সাধারণত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়ক হয় না। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসাবে ঐতিহাসিক নাটক বিবেচনা করা যায়। এই শ্রেণীর নাটকের সংলাপ সাধারণত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও সাধু গদ্যরীতি সম্পন্ন হয়। ওজস্বী সংলাপ নির্মাণে অলঙ্কার সমৃদ্ধ সমাসবদ্ধ পদও অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। বিশেষত রাজন্যবর্গের ভাষায় গাম্ভীর্য রক্ষার্থে এই শ্রেণীর সংলাপের ব্যবহার অপ্রচলিত নয়। এক্ষেত্রে আরো একটি দিক উল্লেখযোগ্য। নাটকের সংলাপ গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিই ব্যবহৃত হতে পারে। সাধারণত কাব্যধর্মী নাটকে পদ্যের সংলাপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেক সময় একই নাটকে গদ্য ও পদ্য এই দুশ্রেণীর সংলাপ ব্যবহারের রীতিও সম্পূর্ণ অপ্রচলিত নয়। প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের উল্লেখ করা যায়। এখানে উচ্চ শ্রেণীল সংলাপ পদ্যে এবং সাধারণ শ্রেণীর চরিত্রের সংলাপে গদ্য ব্যবহৃত। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে নবীন মাধব ও বিন্দু মাধব এবং অন্যক্ষেত্রে তোরাপের সংলাপ সমশ্রেণীর নয়। এখানে সাধুরীতি ও আঞ্চলিক রীতি ব্যবহৃত। নাটকের সংলাপের প্রকৃতি নির্ভরশীল চরিত্র ও ঘটনার পরিবেশের ওপর। অনেক নাট্যকার অপেক্ষাকৃত নাতিদীর্ঘ সংলাপের মাধ্যমে নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে আগ্রহী, আবার অনেকে দীর্ঘ সংলাপের সাহায্যে ভাবাবেগ প্রকাশে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে একটি দিক সবাই নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছেন যে, চরিত্রানুযায়ী সংলাপ ব্যবহার না হলে নাটকের ওজঃগুণ হ্রাস পায়। নিচে নাটকে ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণীর সংলাপের উদাহরণ দেওয়া হল।

১. কবর, মুনীর চৌধুরী : সংক্ষিপ্ত সংলাপ

আমিন : বাবা

আপা : কেন?

আমিন : সত্য কথা বলেনি বলে। চুরি করেছিলে বলে।

আপা : খুব লেগেছিল তো না?

খোকা : একটু।

(নাটক-কবর, পৃ. ৪৪)

Dhaka University Institutional Repository

২. নীলদর্পণ, দীনবন্ধু মিত্র : সাধুরীতির সংলাপ

সাধু। ধর্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, করিতেছি না এবং করিবার ক্ষমতাও নাই।

৩. নীল দর্পণ, দীনবন্ধু মিত্র : আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ

তোরাপ। মুই এই নাতি নদীতে সেৎরে পার হয়ে ঘরে যাব। মোর নছিবির কথা আর কি শোনাবা; মুই মোক্তার সুমুন্দির আস্তাবলের ঝরকা ভেঙ্গে পেলিয়ে একেবারে বসন্ত বাবুর জমিদারীতে পেলিয়ে গ্যালাম। তারপর নাতকরে জরু ছাবাল ঘর পোরলাম।

(নাটক-নীল দর্পণ, পৃ. ৪২)

নাটকের সংলাপ বৈচিত্র্যের উপস্থিতি কাহিনী চরিত্র ও রস উপস্থাপনে বিশেষ সহায়ক হয়।

বাস্তব জীবনের ভাষারূপ গদ্যই হলো নাটকের ভাষা।

নাট্যকার নাটকের নেপথ্যে অবস্থান করে সংলাপের মাধ্যমে নাটকের ভাবাবেশ সৃষ্টি করে থাকেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কাহিনীর ধারা ও দ্বন্দ্ব সংলাপ অবলম্বন করেই প্রকাশিত হয়। সেজন্য নাটকের সংলাপ নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের প্রধান দুটি চরিত্র ইব্রাহিম কার্দী ও জোহরা বেগম। নাটকের কাহিনীর ক্রমবিকাশের মাধ্যমে চরিত্র দুটির দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, সমাজের সাথে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়। ইব্রাহিম কার্দী ও জোহরা বেগমের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই উভয়ের জীবনে নেমে এসেছে করুণ পরিণতি। পাশ্চাত্য রণবিদ্যায় পারদর্শী ও অসীম সাহসী সৈনিক ইব্রাহিম কার্দী প্রথম জীবনে কোন মুসলিম বাহিনীতে চাকরি না পেয়ে পরিশেষে বাধ্য হয়ে মারাঠা বাহিনীতে যোগ দেন। অপরদিকে স্ত্রী জোহরা বেগম পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য এবং জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করেন। একজনের প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি রক্ষার সঙ্গে অন্যজনের স্বজাতি প্রীতির সংঘাতের ফলে শুরু হয় উভয়ের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকটিকে চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

মারাঠা ও মুসলিম বাহিনীর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধই নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সমস্ত দেশ-কালকে অতিক্রম করে আধুনিক যুগ ও জীবনে সমস্যারূপ নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। নাট্যকার নাটকের প্রধান চরিত্রসমূহের মধ্যে আধুনিক জীবন চেতনা আরোপ করে যে সংকটের সৃষ্টি করেছেন এবং চরিত্রের পূর্ণতা দান করেছেন তার সঙ্গে কালের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হতে সাহায্য করেছে সংলাপ। যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে জোহরা বেগম তাকে মারাঠা বাহিনী পরিত্যাগ করতে

Dhaka University Institutional Repository

বললে কর্তব্যপরায়ণ ইব্রাহিম কার্দীর পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। মুসলিম বাহিনী ও স্ত্রীর প্রতি তার প্রবল ভালবাসা ছিল। এখানেই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব শুরু হয়। একদিকে তিনি যুদ্ধের অশুভ দিকের কথা চিন্তা করেছেন, অন্যদিকে স্ত্রীর প্রতি প্রেমের বেদনায় ভেঙ্গে পড়েছেন। শিবির থেকে ছদ্মবেশে জোহরা বেগম স্বামীর সাথে দেখা করে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিতে বলায় তিনি বলেছেন,

কার্দী : "যে ফিরে যাবে সে আমি হবো না। সে হবে বিশ্বাসঘাতক। সে হবে ইব্রাহিম কার্দীর লাশ। তাকে দিয়ে তুমি কি করবে? তুমি কাঁদছো? ভারতে মুসলিম শক্তি জয়যুক্ত হোক, তার পূর্ব গৌরব সে ফিরে পাক বিশ্বাস করো এ কামনা আমার মনে অহরহ জ্বলছে। কিন্তু ভাগ্য আমাকে প্রতারিত করেছে। সে গৌরবে অংশ গ্রহণের অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। আমার সংকটের দিনে যারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, কর্মে নিযুক্ত করেছে, ঐশ্বর্য দান করেছে সে মারাঠাদের বিপদের দিনে চুপ করে বসে থাকব? পদত্যাগ করব? দলত্যাগ করব? সে হয় না জোহরা। আমি নিশ্চিত জানি, জয়-পরাজয় যাই আসুক, মৃত্যু ভিন্ন আমার মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। এ সময় তুমি আমার কাছ থেকে চলে যেও না জোহরা। চারদিকে বড় অন্ধকার। মাঝে মাঝে রক্তের লাল ছোপ মাখানো অন্ধকার। বাদবাকী সব কালো কালো ঘোর অন্ধকার। জোহরা আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো। যখন অন্ধকারে শ্বাসরোধ হয়ে আসবে তখন যেন অনুভব করতে পারি তোমার মেহেদী পরা হাতে আমার রক্তহীন দেহ আঁকড়ে ধরে রেখেছে, জোহরা।"

(রক্তাক্ত প্রান্তর, ১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য)

এই সংলাপে ইব্রাহিম কার্দীর দেশ ও স্বজাতির প্রতি, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে সততা ও আদর্শ যা নাটকের দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। নাটকের সংলাপ নাটকের প্রয়োজনে কখনো হ্রস্ব ও দীর্ঘ হতে পারে আর তা নাটকের গতিময়তা বাড়ায়। এখানে সংলাপ দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্য দিয়ে গতিময়তার সৃষ্টি হয়েছে। জোহরা বেগম ইব্রাহিম কার্দীর এই উক্তিতে আবেগে আপ্লুত হলেও মারাঠাদের প্রতি তার ঘৃণা ও প্রতিশোধের স্পৃহা সব আবেগকে সংহত করতে সমর্থ হয়।

জোহরার উক্তি : "আমি মেহেদী বেগের কন্যা। মারাঠা দস্যুরা আমার পিতাকে হত্যা করেছে। এই শিবিরে তোমার আমার মাঝখানে আমার পিতার লাশ শুয়ে আছে। আমি তোমার কাছে এগুবো কি করে? তোমার হাতে হাত রাখবো কি করে?"

(রক্তাক্ত প্রান্তর, ১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য)

Dhaka University Institutional Repository

রক্তাক্ত প্রান্তরে সমাজ পরিবেশ ও ব্যক্তির সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বের সংকটকে জোহরা বেগম ও ইব্রাহিম কার্দী কেউ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ফলে উভয়ের জীবনে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে। তারা মুখোমুখি হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। পানিপথ প্রান্তর রক্তে রঞ্জিত হওয়ার পর সবচেয়ে বেশি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে জোহরার অন্তর। ইব্রাহিম কার্দী যুদ্ধে আহত হয়ে কারাগারে বন্দী হয়েছে। প্রেমময়ী স্ত্রী জোহরা সবকিছুর বিনিময়ে তাকে ফিরে পেতে চাইলেও কেউ জানতেন না কারাগারের এক রক্ষী বহুদিন থেকেই কার্দীর জীবন ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল।

রক্ষিদের উক্তি

রহিম : আমার ছোট ভাই। আমার দিলের টুকরো। ওরা ওকে খুন করেছে।

বশির : আমরা তার বদলা নেবোই। মারাঠাদের মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে তবে ঘরে ফিরবো।

রহিম : আমি আর একজনের জন্য অপেক্ষা করবো।

বশির : কার জন্য?

রহিম : ইব্রাহীম কার্দীর জন্য। বেঈমান! মুসলমান হয়ে গোলামি করেছে দস্যু পেশোবার। কুঞ্জরপুর দূর্গ ওরা জয় করেছে ইব্রাহীম কার্দীর রণকৌশলের জোরে। মারাঠা সৈন্যদের কামান বন্দুক চালাতে শিখিয়েছে ইব্রাহিম কার্দী। আমার সোনা ভাইয়ের জীবনের খোয়াব তোপ বেগে উড়িয়ে দিয়েছে কার্দী। যদি সুযোগ পাই এ নাঙ্গা হাত দিয়ে ওর বুকের পাঁজর উপড়ে ফেলবো। চুমুক দিয়ে ওর বুকের রক্ত পান করবো। তার পর শান্ত হবো। তার পর ঘুমুতে যাবো।

(রক্তাক্ত প্রান্তর, ১ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য)

কার্দীকে নিয়ে যে এত বড় প্রতিজ্ঞা করেছিল তার হাত থেকে কার্দী রেহাই পায়নি। ইব্রাহিম কার্দীর মৃত্যুর পর জোহরা বেগম আর্তনাদ করতে থাকে ইব্রাহিম, ইব্রাহিম, ইব্রাহিম। তারপর বলতে থাকে–

জোহরা : তুমি কেন সাড়া দিলে না ? কেন জেগে উঠলে না? কেন ঘুমিয়ে পড়লে? আমি অত কষ্টের আগুনে পুড়ে, মনের বিষে জর জর হয়ে এত রক্তের তপ্তস্রোতে সাঁতরে পার হয়ে তোমাকে পাবার জন্য ছুটে এলাম আর তুমি কি না ঘুমিয়ে পড়লে। ঘুমের পর পর অতল তলে ডুবে রইলে যে, আমি এত চিৎকার করে ডাকলাম তবু একবারও শুনতে পেলে না। আহা! ঘুমোও! আমি তোমাকে জাগাবো না। তোমার ঘুম দেখে আমি বুঝেছি, অনেক দিন তুমি ঘুমাওনি। চোখের দু'পাতা মুদে মনের আগুনের

Dhaka University Institutional Repository

লক্‌লকে শিখাতে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আড়ালে ঠেলে দিতে পারোনি। কষ্ট ঘুমের বড় কষ্টে ভুগছো তুমি। ঘুমাও! আরো ঘুমাও! প্রাণ ভরে ঘুমাও!

(রক্তাক্ত প্রান্তর,৩য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য)

এই সংলাপে জোহরা বেগমের শোকার্ত মনের সমস্ত প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে। সংলাপটি দীর্ঘ হলেও মানবিক গুণসম্পন্ন। রক্ষী রহিম শেখের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে আহত কার্দী শেষপর্যন্ত কারাগারে প্রাণ হারালো। জোহরার বাকি জীবনে একবারের জন্যও কার্দীকে পায়নি। পরিবেশও চরিত্রানুযায়ী সংলাপ ব্যবহারও লক্ষণীয়। কার্দীর মৃত্যুতে জোহরা বেগম শোকার্ত না হয়ে সংলাপ প্রলাপের আকারে প্রকাশিত হলে দৃশ্যটি পাঠকের মনে সংবেদন সৃষ্টি করতে পারতো না।

২য় অঙ্কের ২য় দৃশ্যে জরিনা বেগম ও নজীবউদ্দৌলার কিছু সংলাপ লক্ষণীয়। জরিনা বেগম নজীবউদ্দৌলাকে যুদ্ধে যেতে দিতে রাজি নন।

জরিনা : অন্য কেউ থাক। আপনি আমায় তদারক করুন। আমাকে জাগিয়ে রাখুন। আমাকে ঘুম পাড়িয়ে যান। আমি তো জাত সৈনিক নই। আমার জেগে থাকতে কষ্ট হয়। ঘুমিয়ে পড়তে আরও কষ্ট।

নজীব : তুমি নিজে চেষ্টা না করলে আমি তোমাকে সাহায্য করবো কি করে।

জরিনা : আমার উভয় দিকে বিপদ। আপনি এত অল্প সময় ধরে থাকেন যে, কখন চলে যান এ ভয়ে চোখের পাতা এক করতে পারি না। যখন চলে যান তখন সকল ঘুম কেড়ে নিয়ে যান।

নজীব : কি করতে বলো?

জরিনা : আমার কাছে থাকুন। আমার সামনে ঘুমোন। আমি বসে বসে দেখি।

নজীব : আর বাইরে যে কাজ আমার জন্য অপেক্ষা করছে তার ব্যবস্থা কে করবে?

জরিনা : অন্য কেউ যাবে।

নজীব : আমি না গেলে নয়।

জরিনা : এত বড় যুদ্ধ। লাখ লাখ লোক যেখানে শরীর উজাড় করে রক্ত ঢেলে দেবে। আপনি না গেলেও দেবে।

জরিনা : (অন্যত্র) আপনি অন্ধ চরিতার্থতা লাভের একটা অলীক মোহে মত্ত হয়ে আপনার পৌরুষ, সাহস, আপনার শোভা, আপনার শক্তি, আপনার প্রাণ মাঠে-প্রান্তরে

Dhaka University Institutional Repository

ছড়িয়ে ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছেন। সেখানে শুধু লাশ, রক্ত, আপনার দামের কদর সেখানে কে করবে? আমি উষ্ণ, আমি জীবন্ত, কেন আমাকে ত্যাগ করবেন? আমাকে দান করুন প্রতি কণা ভালবাসার শতগুণ প্রাণবন্ত করে ফিরিয়ে দেবো। যুদ্ধ পড়ে থাক।

নজীব : আমি হয়তো সত্যি অন্ধ। কিন্তু তুমি আমার চেয়েও অন্ধ। এত অন্ধ যে তোমার চরাচর বিলুপ্তকারী ভালাবাসার প্রবলতায় তুমি যে কখন আমার সমগ্র জীবনটাকেও একটা ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আটক করে রাখতে চাইছো তা তুমি নিজেও জান না। যদি জানতে তাহলে শিউরে উঠতে। আমার চেহারা চিনতে পারতে না। নবাব নজীবউদ্দৌলার যে বিরাট মূর্তি তোমার ভালবাসার স্পর্শে আরো বিস্তৃত স্ফীতকায় হয়ে উঠে সেটাই কুঁকড়ে কুঁকড়ে এত নগণ্য বিবর্ণ হয়ে যেত যে, তখন তুমি তাকে ছুঁতে চাইতে না।

জরিনা বেগমের স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা নজীবউদ্দৌলার যুদ্ধে যাবার অনুপ্রেরণার কাছে অতি গৌণ হয়ে আছে। সংলাপে নবাব নজীবউদ্দৌলা একজন দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ সৈনিক হিসাবে নাটকে চিত্রিত। অন্যদিকে, জরিনা বেগমের পতিপরায়ণতার চিত্রও সুন্দরভাবে প্রকাশিত। এদের সংলাপে নাটকীয়তার সঙ্গে সহজ ভাষা ব্যবহৃত। সংলাপ নাটকের কাহিনীকে প্রসারিত করতে সাহায্য করেছে। নবাব সুজাউদ্দৌলার কিছু সংলাপ এখানে উদ্ধৃত করা যায়।

সুজা : শব্দটা একবার মনে হয় উত্তর দিক থেকে আসছে। আবার মনে হয় দক্ষিণ দিক থেকে আসছে। কিছুতেই জায়গাটা ঠাহর করতে পারছি না। তবে কেউ যে একটা সঙ্কেত পাঠাবার চেষ্টা করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন পক্ষের লোক কাকে কি সংবাদ পাঠাচ্ছে কে জানে।

মন্নু : খুব সম্ভব আতা খাঁ।

সুজা : ওহ্!

মন্নু : আমাকে সংকেত পাঠাতে চেষ্টা করছে হয়তো।

সুজা : ওহ্ আমি খামোখা উদ্বিগ্ন হচ্ছিলাম।

মন্নু : উদ্বেগের কারণ হয়তো মিথ্যে নয়। ঐ যে আবার বেজে উঠলো। আমাকে বলে গিয়েছিল যে, বিপদে পড়লে সঙ্কেত পাঠাবো।

(রক্তাক্ত প্রান্তর, ২য় অঙ্কের ৩য় দৃশ্য)

Dhaka University Institutional Repository

দুজনের সংলাপে উদ্বিগ্নতা এবং এক অজানা ভীতি প্রকাশিত। ইব্রাহীম কার্দীর মৃত্যুর পর নবাব সুজাউদ্দৌলা বলেছেন :

সুজা : আল্লাহ যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যই করেন। বাদশার যিনি বাদশা খোদা তিনি মুক্তির ফরমান জারি করেছেন।

(রক্তাক্ত প্রান্তর, ৩য় অঙ্কের ৩য় দৃশ্য)

এখানে নিয়তি নির্ধারিত দিক প্রতিফলিত। ইব্রাহিম কার্দীর হৃদয়ের আত্মক্ষয়ী দ্বন্দ্বের স্বরূপ একই প্রকৃতির। কৃজ্ঞতাবোধের বিবেক তাকে তার প্রগাঢ় পথে পরিচালিত করে। প্রথম থেকেই সে অনুভব করে যে, এক মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের সঙ্গে তার ভাগ্য অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা। তবে এও সত্য যে, যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কোন ফলাফলই তার বিধিলিপিকে পরিবর্তন করতে পারতো না। তার নিজের বুদ্ধি বিবেক ও হৃদয়বৃত্তিই পরিবেশের বিরুদ্ধে শক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে আত্মবিকাশের সংঘটন অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। প্রতিকুল নিয়তির নির্মম নির্দেশে সে নিপীড়িত হয়। অনিবার্যভাবে মর্মান্তিক পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যু বরণ করে।

নাটকে কিছুটা কমেডির সুর লক্ষ্য করা যায়। যেমন,

মারাঠা : আলাপ করতে চাও করো। তার জন্য নাঙ্গা তলোয়ার মুঠ করে ধরবে কেন? গলাটা যদি কেটে ফেল তাহলে স্বর বের হবে কোথা দিয়ে?

বশির : আমরা শুধু এন্তেজার করবো। শুধু টহল দিয়ে বেড়াবো ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে। আমরা হচ্ছি পাহারাদার। ঠুলি পরা কলুর বলদ। ঘুরবো আর ঘুরবো। মাঝে মাঝে হেঁকে উঠবো, খবরদার! কোন হ্যায়? তারপর সালাম ঠুকে বলবো. ঠিক হ্যায়। আবার টহল দিয়ে বেড়াবো।

(রক্তাক্ত প্রান্তর, ১ম অঙ্কের ১ম দৃশ্য)

নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন : নাটকের স্বভাব ও অন্তরের আচরণ ও উক্তির বৈশিষ্ট্য রূপায়ণে আমি অন্যের নিকট ঋণী নই। আমার নাটকের চরিত্র-চিত্রন, ঘটনা সংস্থাপন ও সংলাপ নির্মাণের কৌশল আমার নিজস্ব। নাট্যকারের ভাষ্যানুযায়ী নাটকের শিল্পকুশলতার বৈশিষ্ট্যের জন্য সমস্ত প্রশংসার দাবিদার। বিষয়, পরিবেশ অনুযায়ী সংলাপ নিরূপণ সার্থক ও সুন্দর।

Dhaka University Institutional Repository

চিঠি

ভূমিকা

'চিঠি' নাটক সমকালীন প্রেক্ষাপটে লিখিত। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যে লালিত চিরন্তর এবং বাস্তব ঘটনার চিত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই নাটকে। নাটকে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে খণ্ড খণ্ড ঘটনা সমাবেশের মাধ্যমে। নাটকের ঘটনা বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং হাস্যরসাত্মক। নাটকের সূত্রপাত হয়েছে একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা দিতে কিছু ছাত্রের অসম্মতি, পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেবার দাবিতে আন্দোলন, ভিন্ন মত পোষণকারী ছাত্রদের প্রতি বল প্রয়োগ, পুলিশ অফিসারের আকস্মিক আবির্ভাব, পরীক্ষায় শীর্ষস্থান দখলের প্রতিযোগিতা, ছাত্রীর প্রতি ছাত্রীর গোপন ঈর্ষা, প্রতিপক্ষ ছাত্রকে পুলিশ কবলিত করার চক্রান্ত, শিক্ষককে নিয়ে কার্টুন অঙ্কনের আমোদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিপক্ষের প্রচারপত্র সংগ্রহের হাস্যকর প্রচেষ্টা ইত্যাদি ঘটনা অন্তর্ভুক্ত।

নাটকের নামকরণের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিষয়বস্তুর সঙ্গে নামকরণের সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে। মুনীর চৌধুরীর মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে এটি একটি। নাটকটি তিন অঙ্কবিশিষ্ট। প্রতিটি অঙ্ক তিনটি দৃশ্য সম্বলিত।

দৃশ্য পরিচিতি

প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

এই দৃশ্য পরিকল্পিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনচিত্র অবলম্বনে। এদের শিক্ষাজীবন, হোস্টেল জীবন, প্রেম, পরীক্ষা পিছানোর জন্য ছাত্রসভা, ছাত্র আন্দোলন, পরীক্ষার হল বর্জন ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপিত।

প্রথম অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

পুলিশ অফিসার আসাদুজ্জামান সরকারি কর্মকর্তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি তদন্ত করার জন্য তাঁর উপর দায়িত্ব অর্পিত। নোট চুরির ব্যাপার নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি।

প্রথম অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে অপহৃত খাতা উদ্ধারের প্রচেষ্টা।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

বিভাগীয় সেমিনার শুরু। মীনা কর্তৃক তারেকের খাতা ফেরত দেওয়া ও ছাত্রদের আচরণের জন্য ধিক্কার দেওয়া। ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে নারী-পুরুষজনিত সংঘাত। আকস্মিকভাবে প্রক্টরের আগমনে উপস্থিতিদের নীরবতা পালন ও পাঠে মনোনিবেশ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

খালেদের খেলার ব্যাট ভেঙ্গে ফেলার জন্য সোহরাবকে তিরস্কার। ছাত্র আন্দোলনের শ্লোগান প্রচার। রাত ১২টা নাগাদ ছাত্রদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। প্রক্টর কর্তৃক মিস মীনা মিনহাজকে লেখা পত্রের লেখকের অনুসন্ধান। প্রক্টরের প্রতি সোহরাবের অবাধ্যতা। ছাত্র কর্তৃক বালতিতে কিছু একটা দুর্গন্ধজাতীয় তরল পদার্থ ঢেলে দেয়া।

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

আসন্ন পরীক্ষা উপলক্ষে জোর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ছাত্রদের সভাকক্ষে সমবেত হওয়া। সভার মাধ্যমে ছাত্র ঐক্য গঠন করে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের জন্য একমত হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে। তিনজন ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে। অন্যান্য ছাত্ররা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তৃতীয় অংক ॥ প্রথম দৃশ্য

মিস মীনা খায়েরের হারিয়ে যাওয়া খাতার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। ছাত্র সোহরাবের হাতে খাতা পড়ায় তার বিচলিত হওয়া। ইতোমধ্যে প্রক্টর হাসান তাঁর পোর্টফোলিও ব্যাগের মধ্যে মীনার হারানো খাতা উদ্ধার করে আনেন। খাতার মাঝে যে বিষয় উল্লেখ করা ছিল তার জন্য মীনাকে তিরস্কার করেন। ছাত্রসভায় নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা না দেবার ঘোষণা দেওয়ার জন্য তিরস্কার করা। প্রক্টর হাসান মিস মীনা মিনহাজের ভাই।

তৃতীয় অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

ছাত্রদের আন্দোলন পরিশেষে কোন্দলে পরিণত হয়। ছাত্রদের মধ্যে একতার পরিবর্তে দলাদলি দেখা দেয়। এক পক্ষ অপর পক্ষের কাছে তাদের কার্যকলাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তারা আন্দোলনে অগ্রসর হয় এবং মতবিরোধ আরও প্রকট আকার ধারণ করে। পুলিশ ছাত্রবাসে ঢুকে নেতাদের তল্লাসী করে। এমন সময় পুলিশ অফিসার আসাদ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে সোহরাবের

Dhaka University Institutional Repository

খোঁজে। কারণ জানা যায়, ভাইয়ের শাসনে মিস মীনা নিজের বুকে নিজেই গুলি চালাতে উদ্যত হয়। এ খবর শোনা মাত্র ছাত্ররা ছুটে যায় তাকে দেখার জন্য।

তৃতীয় অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

মীনা বাড়িতে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। মীনার ভাই (প্রক্টর) মীনাকে দরজা খোলার জন্য অনুরোধ জানায়। প্রেসিডেন্ট রমিজ, ছাত্র সোহরাব, আসাদ, আফতাব এবং প্রত্যেকেই মীনাকে সবিনয় অনুরোধ জানিয়েছে তাকে আত্মহত্যা না করার জন্য। আন্দোলকারীরা বশ্যতা স্বীকার করেছে। অন্যান্যরা কেউ মীনাকে আয়ত্তে আনতে পারেনি। সোহরাবই একমাত্র ছাত্র যে কৌশল অবলম্বন করে আত্মহত্যার হাত থেকে মীনাকে বাঁচিয়ে নিজের আয়ত্তে আনতে পেরেছে। মীনা সোহরাবের কথায় ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে সোহরাবের কাছে ধরা দেয়। এভাবে 'চিঠি' নাটকের কাহিনীর সমাপ্তি টানা হয়।

নাটকের কাহিনী ও কাহিনীর বৈচিত্র্য

'চিঠি' নাটকের কাহিনী রূপায়িত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংগনে অনুষ্ঠিত বাস্তব ঘটনা নিয়ে। নাট্যকার প্রথম দৃশ্য গড়ে তুলেছেন ছাত্রাবাসের একটি কক্ষকে কেন্দ্র করে। কক্ষটিতে একই বর্ষের তিনজন ছাত্র সোহরাব, খালেদ ও তারেক অবস্থান করে। এরা প্রত্যেকেই স্বপ্রতিভায় উজ্জ্বল। প্রত্যেকেই কোন একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে অস্থিরতায় আক্রান্ত। নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকেই একটি খাতা অন্যের হস্তগত হয়। খাতা বেহাত হওয়ার কারণ হিসেবে জানা যায় যে, একজন ছাত্র একজন ছাত্রীকে উদ্দেশ্য করে খাতার ভিতরে একটি রোমান্টিক ও আকর্ষণীয় চিঠি লিখেছে। একদিন ক্লাশের প্রতিভাবান ছাত্র সোহরাবের নিকট থেকে তারেক টিউটোরিয়াল খাতা ধার নিয়েছিল। বিভাগীয় সেমিনার থেকে তেজস্বিনী সহপাঠী মিস মীনা মিনহাজ খাতাটি ছিনিয়ে নেয়। পরীক্ষা আসন্ন, শীর্ষস্থান অধিকার করতে হবে একই চেতনায় খাতাটির জন্য সোহরাব উদগ্রীব হয়ে ওঠে। খাতা না পাওয়ায় এক সময় তারেকের উপর ক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু কে, কখন খাতাটি আত্মসাৎ করেছে তা জানা যায় না। খাতার মালিক ক্রমশ সন্দেহপ্রবণ হয়ে ছাত্রদের দোষারোপ করে। খাতাকে কেন্দ্র করে একটি রহস্য লুকিয়েছিল যা সোহরাবের অজানা ছিল। খাতাটির ভেতরে মিস মীনা মিনহাজকে উদ্দেশ্য করে 'তাহমিনা' সম্বোধন করে খালেদের হাতে একটি চিঠি লেখা ছিল। রহস্য ঘনীভূত হওয়ার কারণ চিঠির লেখা

Dhaka University Institutional Repository

খালেদের হাতের আর অন্তরের কথা তারেকের। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরীক্ষায় শীর্ষ স্থান অধিকার করার প্রতিযোগিতা এবং ছাত্রীর প্রতি গোপন ঈর্ষা।

কাহিনীর সূত্রপাত এবং ক্রমবিকাশ এখান থেকেই। পরবর্তী পর্যায়ে কাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রতিপক্ষ ছাত্রকে পুলিশ কবলিত করার হীনমন্যতা, শিক্ষককে নিয়ে কার্টুন অঙ্কনের আমোদ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রচারপত্র সংগ্রহের চেষ্টা। ছাত্র কোন্দল, ছাত্র কর্তৃক ছাত্রীকে প্রেম নিবেদন, নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা না দেওয়ার জন্য আন্দোলন প্রভৃতি শাখা কাহিনী। খাতাকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দলাদলি, মতদ্বৈততা ছাত্রদের ধরার জন্য তল্লাশী করার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক পর্যায়ে বাকবিতণ্ডায় রূপ নেয়। শেষ পর্যায়ে সভা-সেমিনার চলতে থাকে। ছাত্র ঐকমত্য গড়ে তোলার জন্য আহবান জানানো হয়। খাতাকে কেন্দ্র করে ছাত্র সোহ্‌রাব ও ছাত্রী মীনা মিনহাজের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। নাটকের উল্লেখিত প্রষ্টর জনাব বদরুল হাসান চিঠির ব্যাপারটি নিয়ে মীনাকে শাসন করেন। এতে মীনা ঘরের দ্বাররুদ্ধ করে আত্মহত্যার জন্য চেষ্টা করে। ছাত্র-শিক্ষক এ সংবাদ জানার পর তাদের বাড়িতে ছুটে যান এবং মীনাকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত সোহরাবের ভূমিকায় মীনা আত্মহত্যার মত জঘন্য অপরাধ থেকে নিজেকে বিরত রাখে ও সোহরাবের কাছে ধরা দেয়। এভাবে চিঠি নাটকের কাহিনী ব্যঙ্গাত্মক হাস্যোজ্জ্বল ঘটনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়।

নাটকের আঙ্গিকগত দিকে বৈচিত্র্য বিদ্যমান। চিঠিকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে তাতে নাটকে বৈচিত্র্য এসেছে। পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করার চেষ্টা, প্রেম নিবেদন, ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতি বাস্তব চিত্র নাটকে অন্তর্ভুক্ত। সামান্য চিঠিকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রকট আকার ধারণ করায় ঘটনার মধ্যে নাট্যিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। নাটকে লক্ষ্য করা যায় যে, ক্লাসের সেরা ছাত্রের টিউটোরিয়াল খাতা অপর ছাত্র পড়তে নিয়ে তাতে ছাত্রীর কাছে চিঠি লেখা এবং খাতা হস্তান্তর করা। জনৈক ছাত্রী খাতা হাতে পায় ও চিঠি তার দৃষ্টিগোচর হয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো খাতার মালিক একজন আর সম্বোধন করেছে অন্যজনকে। খাতা হারানো, খাতা খুঁজে না পাওয়া, প্রেমপত্র লেখা, ছাত্রীদের উত্যক্ত করা, খাতা চুরির দায়ে অন্যকে সন্দেহ করা এসবই নাটকের বিশেষ ঘটনা। কিন্তু নাটকের রস ঘনীভূত হয়েছে অন্যখানে। চিঠিতে হাতের লেখা খালেদের আর অন্তরের কথা তারেকের। ডাইরেক্ট এ্যাকশনের প্রথম শিকার হয়েছেন প্রষ্টর নিজে। প্রষ্টর সাহেবের কার্যকলাপ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি দায়িত্ব পালন

Dhaka University Institutional Repository

করতে গিয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন যা, কৌতুক নাটক বা কমেডি সৃষ্টি হয়েছে। অপর একটি ঘটনাও লক্ষ্য করার মতো। খাতা চুরির ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছে। মীনার আত্মহত্যার প্রচেষ্টা, ছাত্র কর্তৃক শিক্ষকের গায়ে তরল দুর্গন্ধজাতীয় পদার্থ ঢেলে দেয়া এসবই ঘটনার বৈচিত্র্য ও কৌতুক রস সৃষ্টি করেছে। পুলিশ অফিসার আসাদউজ্জামানের সাথে অধ্যাপক সাহেবের একটা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লক্ষণীয়।

পূর্ববর্তী নাটকের সাথে আঙ্গিক ও কাহিনীগত পার্থক্য

'চিঠি'-এর পূর্ববর্তী নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৬২)। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' মূলত ঐতিহাসিক নাটক। এ নাটকের পটভূমি ১৭৬১ সালের পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গঠিত। নাটকের অংক বিভাগ তিনটি, দৃশ্য সংখ্যা আটটি। পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা তের জন। তবে ঐতিহাসিক চরিত্রের পাশাপাশি কাল্পনিক সাধারণ চরিত্র স্থান পেয়েছে।

'চিঠি' নাটকটি 'রক্তাক্ত প্রান্তর'-এর পরে লেখা। এর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্নতর। নাট্যকারের কাহিনী সমকালীন প্রেক্ষাপটে ও বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, পরীক্ষা, ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষকদের ত্রুটি, ছাত্রদের অতিরঞ্জিত ভাব প্রভৃতি বিষয়কে নাট্যকার সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। 'চিঠি' ও 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকের আলোচনায় দেখা যায় যে, নাটক দুটি একটি থেকে অপরটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। নাট্যকারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে, নাট্যকারের মনের পরিবর্তনশীলতা। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' রচনা করার চার বছর পর চিঠি নাটকটি রচিত হয়। সময়ের ব্যবধান বেশি না হলেও নাটক দু'টোর আঙ্গিকগত ও কাহিনীগত পার্থক্য অনেক। একটি ঐতিহাসিক, অপরটি সামাজিক। একটিতে যুদ্ধ, যুদ্ধের জয়-পরাজয়, প্রতিহিংসা স্পৃহা, বিশ্বাসঘাতকতা। অপরটিতে ছাত্র-ছাত্রীর রাজনীতি, আন্দোলন, প্রেম প্রভৃতি আলোচিত।

সংলাপের বৈশিষ্ট্য

সংলাপ প্রয়োগে নাট্যকারের দক্ষতা লক্ষণীয়। নাটকে সংলাপের মধ্য দিয়ে বাস্তব দ্বন্দ্ব সংঘাত, ব্যঙ্গ, বিদ্রোহ, তিরস্কার, ঘটনার অসঙ্গতি ফুটে উঠেছে। নাটকে প্রক্টর অধ্যাপক বদরুল হাসান একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। এই চরিত্রের মধ্যে অসঙ্গতি আছে, কৌতুকপ্রিয়তা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রক্টর অধ্যাপক স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু সে দায়িত্ব-কর্তব্য যখন কোন অধ্যাপক পালন করতে যেয়ে মাত্রাতিরিক্ত করে

Dhaka University Institutional Repository

ফেলেন যা দর্শকের কাছে হাস্যকর মনে হয় ঠিক এ ধরনের এমন কাণ্ড করেছেন 'চিঠি' নাটকের প্রষ্টর অধ্যাপক বদরুল হাসান।

অধ্যাপক হাসান

এই যে পেয়েছি। একেবারে এক ঢং। বুঝলে আসাদ এই যে শ-শ লিফলেট এখানে দেখছ, এগুলো সব পরীক্ষা পেছাবার মহা-আন্দোলনের ঐতিহাসিক দলিলস্বরূপ। বছরের হিসেব ক্রমিক নম্বর দিয়ে সাজিয়ে রেখেছি। তোমরা পুলিশের লোক, এর আসল মূল্য কোনো দিন বুঝবে না। আত্মত্যাগের মহাকীর্তি ঘোষণা করে যুগ যুগ ধরে এই মহান আন্দোলনের ধারা প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসছে। আন্তরিকতায়, সংঘবদ্ধতায় উচ্চকণ্ঠতা আর সকল জাতীয় আন্দোলনের কাছে তুচ্ছ। মিউজিয়ামের কিউরেটর ডক্টর দানী বলেছেন যে, তিনি এগুলো ইস্পাতের মলাটে বাঁধাই করে এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রাখবেন। তোমাদের কাছ থেকে এটা না পেলে আমার গোটা সংগ্রহটাই কানা থেকে যেত।'

(চিঠি, ১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

ওপরের অংশটি লক্ষ্য করলে সংলাপ রচনায় নাট্যকারের রসানুভূতি হাস্যরসাত্মক মনোভাবের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। পুলিশ অফিসার আসাদুজ্জামান ও ছাত্র আফতাবের সংলাপে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে।

আসাদ : আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে বসে আপনাদের কাণ্ডকারখানা দেখেছি। আর দেখতে চাই না। আপনারা দুজ'ন আরো সরে দাঁড়ান। মিস রুমার কাছ থেকে খাতা ছিনিয়ে নিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করছেন কি; আমি সত্যি সত্যি আপনাদের হাজতে চালান দিয়ে দেব।

আফতাব: আপনি আমাদের হুমকি দিচ্ছেন? দেশের গোটা ছাত্রশক্তি আমাদের পশ্চাতে। আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমরা তরুণরাই দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আমরাই হলাম আগামী দিনে জাতীয় মন্ত্রী পরিষদ সদস্য, দেশের শাসনকর্তা।

(চিঠি, প্রথম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)

ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব ছাত্রী মীনা ও ছাত্র সোহরাবের সংলাপেও পাওয়া যায়। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির মাধ্যমেই নাটকে গতিশীলতা আনা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সোহরাব : আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম যে, আপনার আধুনিকতাটা একটা ভঙ্গি মাত্র। আসলে তার গভীরতা আপনার প্রসাধনের প্রলেপের চেয়ে বেশি নয়।

মীনা : আপনি যে মুক্ত বুদ্ধির বড়াই করেন সেটাও একটা ভণ্ডামি। আদর্শের যে বুলি প্রচার করেন তা আগাগোড়া মেকি। রুচি, শিক্ষা, ভদ্রতার যে মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ান, সেটা খুলে ফেললে ভেতর থেকে যা বেরিয়ে পড়বে তা ইতর, গ্রাম্য, নোংরা।

(চিঠি, ২য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য)

রমীজের সংলাপে ছাত্র রাজনীতির সুর আছে।

রমীজ : আজকে আমতলায় এক বিরাট ছাত্র সভার আয়োজন করেছিলাম, তাতে আমরা সাধারণ ছাত্ররা, সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, আমরা আমাদের আগামী যাবতীয় পরীক্ষা সমূহের তারিখ পেছানোর জন্য জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলবো। যদি কর্তৃপক্ষ তারিখ পিছিয়ে দিতে রাজি হন ভাল, না হলে আমরা পরীক্ষা বর্জন করতে বদ্ধপরিকর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পরীক্ষা পেছানোর দাবি নিয়ে আন্দোলন করেও সফল হতে না পেরে ডাইরেক্ট এ্যাকশনে যাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখানে ছাত্রআন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ছাত্র আফতাবের উক্তিতে দেখা যায় :

আফতাব: ডাইরেক্ট এ্যাকশন। ডাইরেক্ট এ্যাকশন ছাড়া কখনও কোনো বড় কাজ সিদ্ধিলাভ করেনি। শুধু শ্লোগান দিয়ে কে কবে রাজ্য জয় করেছে।

(চিঠি, ১ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য)

'চিঠি' নাটকের সংলাপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি কটাক্ষও আছে। ২য় অঙ্কের ৩য় দৃশ্যে ছাত্র আফতাবের উক্তিতে এর প্রকাশ ঘটেছে।

আফতাব: বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জবরদস্তি করে নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা চালু করে দিতে চান। তাতে আমরা কতল হই, তলিয়ে যাই, হারিয়ে যাই, তাতে তাঁদের কিছু এসে যায় না। তাঁরা কেবল চান আইন রক্ষা করতে। নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা আরম্ভ করে দিতে। আমরা জানি না, এদেশের আইনের অর্থ কি? নির্দিষ্ট অর্থ কি? পরীক্ষার অর্থ কি? অন্যের দফারফা করার জন্য এদেশে আইনের নামে উত্তেজিত নয় কে? আবার প্রয়োজন পড়লে এই আইনেরই ঘাড় মটকায়নি কে? বারটা বাজায় নি কে? তাকে কাঁচকলা দেখায়নি কে? আইন কি কেবল তাদের বেলাতেই অনড়? পূর্ব নির্দিষ্ট বস্তু

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতাশালীর ছলে বলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হয়নি কখনো। শুধু আমাদের পরীক্ষাই এক জায়গায় আটকা পড়ে থাকবে? এটা কি এই মহাবিদ্যালয়ের আখেরী পরীক্ষা? এর পরে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, বিশ্ববিদ্যালয় কি এই আশাই পোষণ করে? তবে আমরাও বলে রাখি, আমরা কি আশা পোষণ করি। কর্তৃপক্ষের গোঁয়ার্তুমির গোড়া আমরা উপড়ে ফেলব। টিম্বাকটুর এই পরদেশি ভাই-চ্যান্সেলরকে আমরা মোম্বাসা চালান করে দেব।

(চিঠি, ২য় অঙ্ক ৩য় দৃশ্য)

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে অধ্যাপক হাসানের উক্তিতে সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্য করা যায়। শ্রেণীকক্ষে সহপাঠীদের সাথে বইপত্রের লেনদেন স্বাভাবিক ব্যাপার। আবার কখনো বা বইপত্র হারিয়ে যাওয়া, চুরি হওয়া, আত্মসাৎ করা এগুলো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার হলেও 'চিঠি' নাটকে খাতা চুরি যাওয়া নিয়ে থানা-পুলিশ করা, ডায়েরি করার মধ্য দিয়ে শুধু কৌতুক-রস নয়, সাধারণ ঘটনা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়ায় কাহিনী ক্রমশ অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করেছে।

হাসান : কে বা কারা নাকি তার মূল্যবান নোট খাতা চুরি করেছে। এতে নাকি সে পরীক্ষায় বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, চোর বহুল পরিমাণে লাভবান হতে পারে। টাকার অঙ্কে এই লাভ ক্ষতি হিসাব করে ডায়েরিতে লিখিয়ে এসেছে।

(চিঠি, ১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য)

এই দৃশ্যেই অন্য একটি জায়গায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে প্রক্টর হাসান ও পুলিশ অফিসার আসাদুজ্জামানের উক্তিতে।

হাসান : সুখে আছো। অষ্ট প্রহর চোর-ডাকাতের সঙ্গে ওঠ্‌বস কর। ইচ্ছে হওয়া মাত্র ওদের এক প্রস্থ ডাণ্ডাপেটা করে নিলে। ওরাও কিছু ঠাণ্ডা হলো, তোমার চিত্তও কিছু সাফ-সতুরা হলো। আমাদের সংকট তোমরা বুঝকে কি করে?

আফতাব: তোমাদের আবার সংকট কি? কাজ করো বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন না প্রক্টর হয়েছ, কিন্তু তাই বলে তো তুমি আর পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব নাওনি, তুমি মূলত অধ্যাপক। দেশের সত্যিকারের কবি, নেতা, কারিগর সব তোমাদের পায়ে মাথা রেখে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কী নোবেল প্রফেশান, আর তুমি কি না আমাদের চাকরির সঙ্গে তোমাদের সমান দায়িত্বে তুলনা করছো?

(চিঠি, ১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আফতাবের উক্তিতে বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে। সে শিক্ষককে নিয়ে বিদ্রূপ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। বিদ্রূপের কারণ মিস মীনা মিনহাজ একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটি টিউটোরিয়াল খাতায় এ-মার্ক পেয়েছে। চৌকির নিচ থেকে যখন চারটে টিউটোরিয়াল খাতা বের করে রমীজ এবং আফতাব দেখছিল তখন তারা প্রতিটি খাতাতে রিমার্ক লক্ষ্য করে এবং আফতাব বিদ্রূপ সহকারে নিম্নোক্ত উক্তি করে।

আফতাব: কাণ্ডটা দেখছ রমীজ! মনে হয় যেন, এখানে এসে অধ্যাপকের এক A হরফ ছাড়া বাদবাকি বর্ণ পরিচয় বেবাক লোপ পেয়েছে। সবগুলো টিউটোরিয়াল রিমার্কই A A A! একেই বলে মুখ দেখে নম্বর! আহা! কী আমার অধ্যাপকরে! লম্বা চওড়া কথার ঠেলায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত, ওদিকে নিজের সব এ পা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন, সুযোগ পেলেই বৃন্দাবনের বাঁশুরিয়া! কো-এডুকেশনের আদত মজা ওরাই লুটছেন আমরা কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে মরি।

(চিঠি, ১ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য)

নাট্যকারের ঘটনা বিন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, চটুল, রসিকতাপ্রিয়তা। মুনীর চৌধুরী নাট্যকার হিসাবে ব্যাঙ্গাত্মক ও রসাত্মক সংলাপ সৃষ্টিতে অত্যন্ত দক্ষ। সংলাপের ভাষা নাট্যকার নিজে বিনির্মাণের মাধ্যমে কাহিনী নির্বাচন করে ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক স্থাপন করে ঘটনানুযায়ী বিভিন্ন চরিত্রের মুখে উপযুক্ত সংলাপ ব্যবহার করেছেন। এতে স্থান, কাল, পাত্র ও ঘটনা একটা বাস্তবানুগ রূপ লাভ করে চরিত্রগুলোও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। সংলাপের মাধ্যমে রঙ্গরসিকতা প্রকাশ করার জন্য নানা রকম শব্দ ব্যবহৃত যেমন, বুজরকি, গমগিন, পেরেশান, মালুম, নাখাস্তা, এলাজ, মুসাবিদা, খামোশ, দেখভাল, রসুমত, আখ্‌ত, কোশেশ, গান্দা, সহি-গলদ, বুলন্দ, ফয়সালা, মোম্বাসা, টিম্বাকটুর ক্যারিক্যাচার, পোর্টেট, এসপার ওসপার, কভিনেহি, আইডিয়া প্রভৃতি।

নাট্যিক বৈশিষ্ট্য

নাটক রচনায় মুনীর চৌধুরীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তিনি বাস্তব ঘটনাকে প্রত্যক্ষভাবে নাটকে উপস্থাপন করেন। সামাজিক অসঙ্গতিগুলো কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অথবা হাল্‌কা কৌতুকের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। নাটকের আঙ্গিক নির্মাণে নাট্যকারের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তিনি ঘটনা বর্ণনায় ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করে ফ্ল্যাশব্যাক রীতিতে নাট্যিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতি নাটকের শুরুতেই লক্ষ্য করা যায়। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই ছাত্র সোহরাব, খালেদ, তারেক এদের কথোপকথনের মধ্যে বোঝা যায় যে, ঘটনা পূর্বেই ঘটে গেছে। ক্ষোভ-দ্বন্দ্ব রাগ ঘটনা ঘটার পরে প্রকাশ পেয়েছে। সোহরাবের টিউটোরিয়াল খাতা সহপাঠি তারেক পড়তে নিয়েছিল। খাতাটি নির্দিষ্ট সময়ে সোহরাবকে ফেরত দিতে পারেনি। সামনের পরীক্ষা খারাপ হবে ভেবে সোহরাব শঙ্কাবোধ করেছে। খাতাটি পড়তে নিয়ে হারিয়ে ফেলা বিষয়টি সোহরাবের নিকট ক্ষোভের ও রাগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সোহরাবের উক্তি দিয়ে নাটক শুরু হয়েছে। সোহরাব, তারেক ও খালেদের সংলাপ তুলে ধরলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

সোহরাব : তোমার এই হতভম্ব ভাব, এই সরলতা, হকচকানো চাহনি, এই যুক্তিহীন রুদ্ধকণ্ঠ আমার মনে বিন্দুমাত্র সহানুভূতির উদ্রেক করে না।

খালেদ : ওকে এবার ছেড়ে দাও সোহরাব। আরম্ভ করেছো সেই বিকেল থেকে। এখন শেষ রাত। সেহরীর প্রথম ঘণ্টা পিটিয়ে দিয়েছে। এবার ওকে রেহাই দাও।

তারেক : আমি ইচ্ছে করে দেইনি। নিয়ে এলো।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই তিনজন ছাত্রের উক্তিতে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে, ঘটনা পূর্বে ঘটেছে, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে পরে। ঘটনার প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পরবর্তী পর্যায়ে। সোহরাবের পরবর্তী একটি উক্তিতে নাট্যকারের রচনার কৌশলে সম্পূর্ণ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এগুলোই নাট্যকারের বৈশিষ্ট্য, নাট্যিক কৌশল ও ফ্ল্যাশব্যাক রীতি।

সোহরাব : তুমি দুগ্ধপোষ্য শিশু। বাহু বলহীন। চরণ টলোমলো। তাই তোমার কাছ থেকে মিস মীনা মিনহাজ অবলীলাক্রমে খাতাটা কেড়ে নিয়ে গেলো। অবুঝ তুমি, কিছুই করতে পারলে না। এসব কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার?

(চিঠি, ১ম অঙ্ক ১ম দৃশ্য)

সোহরাব ও খালেদের উক্তিতে দ্বন্দ্বের দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। পাঠকদের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য।

'চিঠি' নাটকে যথেষ্ট দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিদ্যমান। কাহিনীর দ্বন্দ্ব দিয়েই নাটকের সূত্রপাত। সংঘাত লক্ষ্য করা যায় ছাত্র-ছাত্র, ছাত্র-ছাত্রীর বিভিন্নধারিক সম্পর্কের মধ্যে। পরীক্ষা পিছানোর দাবি

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সংঘাত আছে খাতা চুরি ও নেপথ্য প্রেম অবলম্বনে। ছাত্র-শিক্ষকের সংঘাত আছে ছাত্রীর টিউটোরিয়াল খাতায় বেশি নম্বর দেবার জন্য। পুলিশ অফিসার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের মধ্যে সংঘাত আছে নীতির প্রশ্নে। ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘাত আছে আন্দোলন বন্ধের ব্যাপারে।

নাটক যেভাবে শুরু হয়েছিল শেষ হয়েছে অন্যভাবে। কাহিনীতে পরীক্ষা পিছানোর দাবি এবং আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পেলেও খাতা চুরির ঘটনা ছিল মুখ্য ব্যাপার। নাটকের পট পরিবর্তিত হয়েছে ছাত্রদের দাবি ও ছাত্র আন্দোলনের কারণে; পরিসমাপ্তি ঘটেছে ছাত্রীর আত্মহত্যার প্রচেষ্টা ও প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে।

ছাত্র বনাম ছাত্র এবং ছাত্র ও ছাত্রীকেন্দ্রিক যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়েছিল তা নাটকের মধ্যে একটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। পরীক্ষা পিছানো দাবি নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিরোধের দানা বেঁধে ঘনীভূত হয়ে পক্ষ-বিপক্ষে রূপ নেয় এবং এর চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে ছাত্রদের মাঝে মারামারি ও শিক্ষককে হেয় করার ঘটনার মধ্য দিয়ে।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে ছাত্র তারেক ও খালেদ যখন সোহরাবকে মীনা মিনহাজের সঙ্গে আপোস করতে বলে তখন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সোহরাবকে খুব দৃঢ় থাকতে দেখা যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হতে রাজি কিন্তু আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে রাজি নয়। খাতার ব্যাপারটি নিয়ে যার সাথে তার মনোমালিন্য ঘটেছে পরিশেষে তার কাছে মাথা নত করা সোহরাব কোনক্রমেই মেনে নিতে পারেনি। যেমন–

তারেক : পাগলামী করোনা সোহরাব। আমরা সবাই তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। কেবল এইটুকু তোমার কাছে মিনতি, আমাদেরও একটু উপকার কর। মিস মীনা মিনহাজের কাছে যাও। ভেঙে পড়। ধরা দাও।

সোহরাব : দু'দিন আগে তোমরা কেন একথা বললে না, দু'দিন আগে কেন তোমরা আমাকে জোর করে পাঠালে না? আমার সকল অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাকে তখন কেন পঙ্গু করে দিলে না? কত সহজে জয়ী হয়ে ফিরতে পারতাম। যখন আমার সর্বস্ব লুণ্ঠিত তখন তোমরা এসেছ পথ দেখাতে। মিস মীনা মিনহাজ এখন জানে যে আমি তার রাফখাতা আদ্যোপান্ত পড়েছি। জানে যে তার হৃদয়ের গোপন নিবেদন চোরের

Dhaka University Institutional Repository

মতো বেআব্রু করে দেখে নিয়েছি। এখন যতই আমার হৃদয়ের গোপন নিবেদনকে চিৎকার করে ব্যক্ত করি না কেন, সে মনে করবে সবি মিথ্যা, সব কৃত্রিম, সব কেবল দয়া দেখানো আর করুণা প্রকাশ করা। আমাকে সে সহ্য করতে পারবে না। যত কাছে ছুটে যাব তত বেশি আমাকে অপমান করবে, আমাকে তিরস্কার করবে। আঘাত করবে, তাড়িয়ে দেবে। হয়তো ভাইয়ের কোমর থেকে পিস্তল খুলে নিয়ে আমাকে গুলি করে বসবে। আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমি যাব না, যাব না, যাব না!

(চিঠি ॥ ৩য় অঙ্ক ২য় দৃশ্য)

পুলিশ অফিসার আসাদুজ্জামান ছাত্র সোহরাবকে খোঁজার ভঙ্গিমাটা এমন যেন সোহরাবকে ধরেই হাজতে দেবে। কিন্তু পরে যখন তাকে খুঁজে পায় তখনকার ভঙ্গিমাটা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। পুলিশ অফিসার ছাত্রকে খোঁজা মানেই ভীত হওয়া। ছাত্রকে খুঁজে পেয়ে তার কাছে নিজের বোনের জীবনের জন্য আত্মসমর্পণ করার ঘটনার মধ্য দিয়ে বিস্ময় রস প্রকাশ পেয়েছে।

পুলিশের খোঁজার মুহূর্ত থেকে খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত সময়টুকু খুব ভীতিকর অবস্থার মধ্যে কাটে। মনে হয় পাহাড়ের চূড়া থেকে গভীর জঙ্গলের তলদেশে ফেলে দেবার উপক্রম। সোহরাবকে সঙ্গে করে নেবার জন্য যেভাবে অনুরোধ করেছেন তা একপ্রকার আত্মসমর্পণই বলা যায়।

পুলিশ অফিসার আসাদ : সোহরাব কার নাম?

তারেক : (এগিয়ে এসে) কোথায় যেতে হবে বলুন।

আসাদ : আপনার নাম সোহরাব?

খালেদ : আমার নাম সোহরাব।

আসাদ : আমি দেরি করতে পারছি না। আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না। সত্যি বলুন কার নাম সোহরাব?

রমীজ : (এগিয়ে এসে) কি হয়েছে? আপনি সোহরাব, সোহরাব হোসেনকে চাইছেন? এর নাম সোহরাব। (সোহরাবকে দেখিয়ে)

আসাদ : উহ্ বাঁচলাম। কেবল ভয় হচ্ছিল বুঝি আপনাকে ধরতে না পারি। দোহাই আপনার একমুহূর্ত দেরি করবেন না। আপনি শিগ্‌গীর আমার সঙ্গে চলুন। আমি মীনার ভাই। আমাকে বাঁচান।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র-আন্দোলন, সমাজে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মাঝে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অসংগতি চলছিল তা যেন এক নিমিষেই থেমে গেল তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে এসে।

এখানে লক্ষণীয় যে ছাত্র-শিক্ষক, সহপাঠী পুলিশ অফিসার সবাই একটি জীবনকে বাঁচানোর জন্য অতীতের সব ঘটনাকে অতিক্রম করে এসেছে। সবার মাঝে একই চিন্তা। কি করে মীনার জীবন বাঁচানো যায়। অন্যান্য ছাত্র থাকতেও সোহরাবই ছাত্রদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। মীনাদের বাড়িতে সবাই যখন তাকে অনুরোধ করছে রুদ্ধ ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসার জন্য সোহরাব তখন আর এক নাটকীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। প্রক্টরের অতিমাত্রায় ডিউটি পালন করা নিয়ে এখানেও তাকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করে।

সোহরাব : (প্রক্টরকে) আপনি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? কি ডিউটি দেবার জন্য অপেক্ষা করছেন? দরজার ওপাশে এক ভদ্রমহিলা পিস্তল ধারণ করে আছেন। এক পাশে কৌতূহলী জনতা। আপনি এখনও আশঙ্কা করেন নাকি যে এখানেও একটা নৈতিক অধঃপতনের সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে? নিজের কাজের সুবিধার জন্য খাতা-চিঠি হাত করে একটা অমূল্য জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এখন কি শেষটুকু দেখে যাবার জন্য অপেক্ষা করছেন?

এরপর সোহরাব নিজেই মীনার কাছে ধরা দিয়ে তার জীবন বাঁচায়। সোহরাবের মীনার কাছে দরা দেবার মধ্যেও একটা নাটকীয়তা আছে। সে স্বেচ্ছায় মীনার কাছে ধরা দেয়নি। তারই জীবন বাঁচানোর কারণে এবং মীনার বড় ভাইয়ের অনুরোধে মীনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সোহরাবের নিজের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে একটা মহত্তর জীবনে উত্তরণ করেছে। মীনা আত্মহত্যা থেকে বিরত থাকার জন্য অন্যদের অনুরোধ রক্ষা করেনি। যার উপর তার যত বেশি রাগ-ক্ষোভ ছিল পরিশেষে তার কাছেই ধরা দিয়েছে।

মীনাকে সোহরাবের বাধ্য করার কৌশলটা নাটকীয়তায় পূর্ণ। প্রক্টর ও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের বিতাড়িত করার কৌশলও নাটকীয়। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের শেষে সোহরাবের দীর্ঘ উক্তির পুরোটাই নাটকীয়। প্রথমে মীনাকে আপনি সম্বোধন করে তার পরক্ষণেই তুমি সম্বোধন করে অন্তরঙ্গতায় ভরিয়ে দেয় কার্যকলাপের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে, যার কারণে মীনা নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। মান-অভিমানের আবেগে আপ্লুত হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সোহরাব: মিস মীনা মিনহাজ! একটা সত্য কথা বলব? চটে গেলে আপনার একেবারে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আমারও থাকে না। কিন্তু সে কথা আলাদা। গতরাতে ছেলেদের সভায় আপনি যে কীর্তি করে এলেন তার মতো এমন নিচ আর হাস্যকর কাজ আর হয় না। আপনি চলে আসার পর ছেলেরা মিটিংএ আমাকে মেরেছে। আমার এখন ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে ধরে প্রহার করি। কিছু মনে করবেন না। যা বলার খোলাখুলি বললাম। অবশ্য এসব কথা বলার জন্য এখন আসিনি। বেঁচে থাকলে মারামারি করার অনেক সুযোগ পাব। আমি যা বলতে এসেছিলাম সে অন্য কথা।

মীনা! মীনা! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আমি সোহরাব, সোহরাব তোমাকে ডাকছি। মীনা! মীনা! আমি লিফলেটের রুস্তম নই, জ্বলজ্যান্ত সোহরাব! তোমাকে ডাকছি মীনা! মীনা! দরজা খোল! মীনা দয়া করে আমার সব কথা শোন। আজ মিথ্যে কথা বলতে পারব না। হ্যাঁ, আমি তোমার খাতা পড়েছি। না পড়লে জীবনের একটা মহত্তম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকতাম। ভাগ্যিস পড়েছিলাম। অন্ধকারে দুর্গের মধ্যে নিজেকে আটক করে রেখেছিলাম। আত্মস্তুতির কারুকাজ করা বর্ম পরে সেই অন্ধকারে মহানন্দে ডুবতে বসেছিলাম। হঠাৎ সামনে তোমার খাতার পাতা খুলে গেল। কী আনন্দ, দুর্গের পর পরীক্ষা প্রাকার শূন্যে মিলিয়ে গেল। যেই শুনলাম তুমি বিপন্ন, কঠিন বর্ম গলে অঙ্গে মিশে গেল। রুদ্ধ দুয়ার মুক্ত আমি বেরিয়ে এসে পাগলের মতো চিৎকার করে তোমাকে ডাকছি, মীনা! মীনা! সাড়া দাও। বেরিয় এস। মুক্ত, জীয়ন্ত সোনার তুমি, বেরিয়ে এস। শাস্তি দাও, অপমান কর, উপহাস কর, প্রহার কর, তবু বেরিয়ে এস। যদি স্বেচ্ছায় না আস আমি সবলে তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে আসব। এই রুদ্ধ দুয়ার আমি ভেঙ্গে ফেলব। ঘরে প্রবেশ করে যদি দেখি আমার অঙ্গ প্রাণহীন, তাকেই গ্রহণ করব। একই অস্ত্রে নিজের দেহ তোমার পাশে স্থাপন করব। কিন্তু তবু তোমার কাছে আসব। আসবই আসব। আসব।

শেষ দৃশ্যে সোহরাবের এই দীর্ঘ উক্তিতে মিস মীনা মিনহাজ নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি। আত্মহত্যা ভুলে গিয়ে, হাতের পিস্তল বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোহরাবের ডাকে সাড়া দিয়ে পর্দা ঠেলে ফেলে বেরিয়ে আসে। লাল মুখ ও বোরুদ্যমান অশ্রু নিয়ে সে সোহরাবের দিকে ধাবিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই নাটকীয়তার মধ্যে নাটকের শেষ দৃশ্যের সমাপ্তি হয়। দৃশ্যটি উপভোগ করার মত। এই দৃশ্যে আর একজন ব্যক্তিকে চোখে পড়ে। তিনি প্রক্টর বদরুল হাসান। এই চরিত্রে যেমন আছে দ্বন্দ্ব, বিরোধ, হাসি, কৌতুক, ব্যঙ্গ তেমনি আছে বেদনা। দুঃখে, ঘৃণায় চাকরি থেকে তিনি পদত্যাগ করবেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

হাসান : মীনা, দরজা খুলে দাও। কোন ছাত্রীর সঙ্গে কোনোদিন আমি এরকম করে কথা বলিনি। আজ বলছি অনেক দুঃখে। প্রক্টর চাকরি বড় দুঃখের। সরকারি পুলিশ আমাদের জব্দ করতে চেষ্টা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে অষ্টপ্রহর হুকুমের ওপর রেখেছে। ছাত্ররা আমার গাত্রে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপ করেছে। আর আমার সহ্য হয় না। আমি এমনিতেও স্থির করেছি পদত্যাগ করব। আমার এই শেষ অবস্থায়, তুমি আত্মহত্যা করে আমাকে আমার জীবন নাশ করতে বাধ্য করো না। মীনা! দরজা খোল, দরজা খোল!

(চিঠি, শেষ দৃশ্য)

'চিঠি' নাকের কাহিনীর সূত্রপাত খাতা চুরি ও চিঠি দিয়ে হলেও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কিছুদূর এগোবার পরই মোড় নিয়েছে পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে। সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে। কাহিনীর ক্রমবিকাশও লাভ করেছে এরই মাধ্যমে।

এ করুণ অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান হয়েছে। পাঠক চিত্তে নিষ্কৃতি লাভের মধ্য দিয়ে স্বস্তি এসেছে। নাট্যকার সবসময় তাঁর উদ্দেশ্যকে, হাস্য কৌতুক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অসংগতি প্রভৃতির ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কবর

'কবর' নাটকের ঐতিহাসিক ভূমিকা রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল মূল চালিকা শক্তি। ভাষা ও সংস্কৃতির ঐক্যই ছিল জাতীয়তাবোধের মূল ভিত্তি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর যখন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত আসে তখন বাঙালি জনগণ বিশেষ করে যুব সম্প্রদায় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মূলত তখন থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে ভারত-পাকিস্তান আন্দোলনে বাংলাদেশের জনগণ যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ ভেবেছিলেন রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাঞ্জাবি আমলাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গঠিত মুসলিম লীগ সরকার বাঙালি জাতির উপর অত্যাচার নির্যাতন ও শোষণ চালাতে শুরু করে। অফিস-আদালতের ইংরেজি ও উর্দু ব্যবহারের পাশাপাশি খাম, পোস্টকার্ড প্রভৃতির মত ছোট-খাট ব্যবহারিক দ্রব্যের ওপরও উর্দু ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯৪৭ সালের শুরুতেই ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহল প্রতিবাদ শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর 'তমুদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ভাষা আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়।

গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার প্রস্তাব করেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ঢাকা শহরে ছাত্র সমাজ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করে। ১৯৪৮ সালের ১৫ই মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কাছে নতি স্বীকার করে সরকার একটা আপোষ চুক্তি করে। এই আপোষ চুক্তিতে সরকারি ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা চালু, গ্রেফতারকৃতদের মুক্তিদান, সংবাদ পত্রের উপর নিষধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবি মেনে নেয়া হয়।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব বাংলা সফরে এসে রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল, 'পাকিস্তানের

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু অপর কোন ভাষা নয়'। তিনি আরও বলেন যে, 'যারা রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দুর বিরোধিতা করবে, তারা পাকিস্তানের শত্রু।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা।' তাঁর এই উক্তির বিরুদ্ধে ছাত্ররা প্রতিবাদ জানায়। ঐ সময় পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রত্যেকেই ছিলেন উর্দুভাষী। তখন পাকিস্তানের রাজধানী ছিল করাচি। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ছয় কোটি নব্বই লাখ লোকের মধ্যে চার কোটি চব্বিশ লাখ লোক কথা বলতেন বাংলায়।

সরকারি ষড়যন্ত্রে বাংলা হরফ পরিবর্তন করে আরবি হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা করা হয়। এতে করে ছাত্র সমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯৫০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সরকারের ভাষা কমিটির রিপোর্টে উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট পেশ করলে পূর্ব বাংলার জনগণ বিক্ষুব্ধ হন। পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তান মুসলিম লীগের অধিবেশনে পল্টন ময়দানে জনসভায় ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা।' এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সকল রাজনৈতিক দল সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী রাষ্ট্র ভাষা দিবস পালন, হরতাল, পতাকা দিবস প্রভৃতি কর্মসূচি চলতে থাকে।

১৯৫২ সালে সরকার ১৪৪ ধারা জারি ও শোভা যাত্রা, সভা-মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ছাত্র সমাজ এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শোভাযাত্রাসহ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রাদেশিকে পরিষদ ভবনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাদের মুখে শ্লোগান ছিল 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই'। নুরুল আমীন ছিলেন তৎকালীন মুসলিম লীগ প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হুকুমেই ১৪৪ ধারা জারি হয় এবং ছাত্র মিছিলের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলি চালানো হয়। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় এম.এ. ক্লাশের ছাত্র বরকত, সালাম, আব্দুল জব্বার, প্রেস মালিকের ছেলে রফিক, বহু যুবক, রিক্সাওয়ালা আউয়াল এবং শফিকুর রহমান। এই শ্রেণীর পাশবিক পুলিশ হামলার প্রতিবাদে মুসলিম লীগ পরিষদ থেকে দল ত্যাগ করেন। পরিষদের সদস্য মৌলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, আজাদ পত্রিকার সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক আবুল কালাম শামসুদ্দিন প্রমুখ বাঙালির জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষা বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনই

Dhaka University Institutional Repository

ছিল না, এ আন্দোলন ছিল বাঙালির স্বাধীকারের আন্দোলন, জাতয়তাবাদী চেতনার উন্মেষের আন্দোলন। এটা হলো ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক দিক।

'কবর' নাটকে রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের আংশিক প্রতিকী কাহিনীর বৈশিষ্ট্য

কবর নাটক রচিত হয় ১৯৫৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় মুনীর চৌধুরী ছাত্র-জীবনের অবসান ঘটিয়ে শিক্ষকতার জীবনে পদার্পণ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে কাজ করছিলেন। ঐ সময় তিনি দ্বিতীয় বারের মতো কারারুদ্ধ হন। এবারের কারারুদ্ধ হওয়ার কারণ ছিল ভাষা আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সুশৃঙ্খল ও নিরস্ত্র আন্দোলনরত জনতার উপর গুলি চালায়। এই গুলিতে রফিক, সালাম প্রভৃতি ছাত্র নিহত হয়। সারা দেশ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রতিবাদ সভা আহ্বান করেন। সভার আয়োজনে মুনীর চৌধুরী অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। আন্দোলনে তাঁর অন্যতম সহকর্মী ছিলেন মোজাফফর আহমদ চৌধুরী। প্রতিবাদ সভায় একুশে ফেব্রুয়ারি হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করে একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়। তার ফলে ২৬শে ফেব্রুয়ারি মুনীর চৌধুরীসহ ঐ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক পৃথ্বিশ চক্রবর্তী, জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী যারা জেলে ছিলেন তাঁরা হলেন মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল হাশিম, মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন প্রমুখ। মুনীর চৌধুরী আড়াই বছর জেলে বন্দী ছিলেন। বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি 'কবর' নাটক রচনা করেন। ভাষা আন্দোলনের একজন কর্মী ছাড়াও তিনি একজন নিয়মিত রাজনীতিবিদ ছিলেন। বামপন্থী চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগ দেন এবং রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। 'কবর' নাটকে ভাষা আন্দোলনের ঘটনা পটভূমি হিসেবে আসলেও তা প্রত্যক্ষভাবে আসেনি, এসেছে পরোক্ষভাবে। কারারুদ্ধ হওয়ার কারণে ভাষা আন্দোলনকে প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়নি মুনীর চৌধুরীর। নাটকটিতে রহস্যময়তা ও কৌতুকময়তা বিদ্যমান। এখানে আংশিক প্রতীকি কাহিনীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। গোরস্থানের মূর্দা ফকির ও মূর্তিগুলো সে প্রতীকী কাহিনীর চিহ্ন বহন করছে। কবর থেকে মূর্তিগুলোর উঠে আসা এবং তারা মরবেও না কবরেও যাবে না বলে নেতা ও পুলিশ

Dhaka University Institutional Repository

ইন্সপেক্টর হাফিজের সাথে বাক-বিতণ্ডা; অন্যদিকে মূর্দা ফকিরও লাশ দাফন না করার জন্য প্রতিবাদ করেছে। নাটকটির এই দিক প্রতিবাদী চেতনার স্বাক্ষর বহন করে।

(আবু তৈয়ব চৌধুরী, মোজাম্মেল হক ও খালেদা খানম।
১৯৫২ সালের রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন, পৃ. ১০১-১০৫।)

কবর নাটকের কাহিনী

শেষ রাতের দিকে একটি গোরস্থানের দৃশ্য নাটকে অন্তর্ভুক্ত। কাহিনীতে একজন রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ ইন্সপেক্টর, হাফিজ, মূর্দা ফকির, একজন গার্ড ও দুইটি ছায়ামূর্তির কথোপকথন। গোরস্থানে গার্ড পাহারারত ছিল। নেতা এসে গার্ডকে খোঁজ করতেই পুলিশ ইন্সপেক্টর হাফিজের আগমন। নেতা ও হাফিজের বাক্যালাপ ও মদ্যপান। হাসপাতাল থেকে কিছু কাটালাশ এসেছে। তাড়াতাড়ি দাফন কাজ শেষ করার জন্য নেতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু লাশগুলো সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। হাফিজ বলেছিলেন, পৃথকভাবে লাশ দাফন করা দুরূহ ব্যাপার। তাঁরা ভাবছিলেন একটা গর্তে লাশগুলো দাফন করা যায় কিনা। এরই মধ্যে মূর্দা ফকির উপস্থিত হয়ে চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয়।

নেতার ইচ্ছা কারফিউ শেষ হওয়ার পূর্বেই লাশগুলোকে মাটিচাপা দিয়ে সরে পড়তে হবে, কারণ তারা ভাষার দাবিতে মিছিল করতে যেয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে। লাশগুলো এখনো দাফন করা হয়নি জানলে ছাত্ররা লাশ নিয়ে মিছিল করতে পারে বলে নেতার ধারণা। নেতা লক্ষ্য করছেন, লাশগুলো দাফন করা হয়েছে কিনা। পুলিশ ইন্সপেক্টর হাফিজ মূর্দা ফকিরকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। নেতা মূর্দা ফকিরকে একটুও সহ্য করতে পারছেন না। তিনি বলছেন, লাশের সঙ্গে মূর্দা ফকিরকেও দাফন করতে, তাহলে সে কোন ঝামেলা করবে না। পরিশেষে দু'জন ছায়ামূর্তির উপস্থিতি। তারা প্রতিবাদ করছে তারা আর মরবেও না, কবরেও যাবে না। এভাবে মূর্তিদের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে কাহিনী শেষ হয়।

চরিত্র সৃষ্টি

'কবর' নাটকটিতে চরিত্র সংখ্যা আছে মোট ছয়টি যেমন, রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ ইন্সপেক্টর, মূর্দা ফকির, গার্ড, দুইটি ছায়ামূর্তি। পুলিশ ইন্সপেক্টর চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন একজন সরকারি কর্মচারীর ছবি ভেসে ওঠে। রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশ ইন্সপেক্টর হাফিজের চরিত্রই

Dhaka University Institutional Repository

মূলত কবর নাটকটিকে ক্রম অগ্রসরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। নাটকটিতে প্রাণদান করেছে মূর্দা ফকির এবং ছায়ামূর্তিগুলো। এখানে নাটকে চরিত্রের বাহুল্য নেই।

নেতা ও হাফিজের চরিত্রে সংলাপের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন নেতা ও হাফিজের শ্রেণীগত রূপ প্রকাশিত হয়েছে, অপর দিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের চেতনাগত অন্তর্লোকও সুস্পষ্ট হয়েছে। বাহান্নের ভাষা আন্দোলনকে তৎকালীন সরকার কমিউনিস্ট ও ভারতীয় এজেন্টদের কাজ বলে প্রচার করেন। নেতার উক্তি তৎকালীন সরকারি ভাষ্যেরই প্রতিধ্বনি। যেমন–

নেতা : জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাওনি। ... কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাতে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমার মত ছেলেরা দেশের মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্বনাশ না দেখে তুমি বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছো না।

(কবর, পৃ. ৭৭)

মূর্দা ফকিরের সংলাপ লক্ষণীয়। সে কবরের মূর্দাদের আহ্বান করছে কবর খুঁড়ে মাটির ওপরে উঠে আসার জন্য। তার আহ্বান ভাষা আন্দোলনকে ছাড়িয়ে সমাজ জীবনের দ্বন্দ্বমুখর বৃহত্তর অঙ্গনকে স্পর্শ করেছে।

ফকির : ... তোরা কোথায় গেলি? সব ঘুমিয়ে নাকি? উঠে আয়। তাড়াতাড়ি উঠে আয়। সব মিছিল করে উঠে আয়। গুলি, গুলি হবে। ফূর্তি করে উঠে আয় সব!

(কবর, পৃ. ৮৩)

পরিবেশ

নাটকের নামকরণ ও ভূমিকানুযায়ী যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। হারিকেন, প্রদীপ ও দিয়াশলাইয়ের ব্যবহার নাটকের রহস্যময়তা, অশরীরী রূপ এবং নির্জন পরিবেশ সৃষ্টি করতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। 'কবর' সম্পর্কে নাট্যকার নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে এটি আমার দৃষ্টি উন্মোচনকারী শ্রেষ্ঠ লেখা।'

অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন, '... অনেকেই বলেছিল এমন একটা ছমছমে রহস্যময় পরিবেশের মাঝে মাঝে কৌতুকময়তার আবহ কেন সৃষ্টি করলাম।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, ভয়াবহতার মাঝে আমি সব সময় কোন না কোন উৎকট তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছি। এটি আমার জীবনের বোধ। যেমন কবর নাটকে নেতার অঙ্গভঙ্গি যথেষ্ট কৌতুকময়তার পেছনেও সেই একই ধারণা কাজ করছে।'

রহস্যময়তা ও কৌতুকময়তা নাটকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কৌতুকময়তা মুনীর চৌধুরীর জীবনবোধের একটি বিশেষ দিক। একটি সুগভীর বেদনাবোধ কৌতুকাবরণের আড়ালে উপস্থাপিত হয়েছে বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে। সংলাপের তীক্ষ্ণতায় ও পরিপাট্যে নাটকটি রহস্যময় ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

(বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, সুকুমার বিশ্বাস, পৃ. ১৯)

নাটকের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য

নাটকের আঙ্গিক বিচারে কাহিনী বা প্লট একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের অধিকারী। নাটক ও উপন্যাস মূলত কাহিনী নির্ভর হওয়ায় কাহিনী একটি প্রধান দিক হিসাবে বিবেচিত। নাটক রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীনকাল ও আধুনিককালে কাহিনী গ্রন্থনে আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য কিছুটা পরিবর্তিত হলেও তার গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। কাহিনী সামাজিক জীবনাবৃত্ত, ঐতিহাসিক কালবৃত্ত, পৌরণিক বা বস্তু নিরপেক্ষ (abstract) হতে পারে। একটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, নাটকের কাহিনীতে একটি পরিসমাপ্তি থাকে বলে নাটক একাঙ্কিকা হলেও তার মধ্যে কাহিনী গ্রন্থনে বিস্তার ও পরিসমাপ্তি থাকে। তার কারণ নাটকের কাহিনী গ্রন্থিত হয় জীবনের কোন সমস্যা অবলম্বনে এবং নাট্যকার কাহিনীর মধ্য দিয়ে দ্বন্দ্ব প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইটালীয় নাট্যকার এ দিকটি লক্ষ্য করে বলেছিলেন, Drama is action not confounded on philosophy. কাহিনীর মাধ্যমে কোন তত্ত্ব প্রচারিত হতে পারে অথবা চরিত্র নির্ভরও হতে পারে। মূলত নাটকের কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় গতির সঙ্গে কাহিনীর ক্রমবিকাশের সঙ্গে পরিণতি নির্দেশিত হয়ে থাকে।

নাট্যকার নাটকের কাহিনী একটি শৃঙ্খলার মাধ্যমে উপস্থাপন করে থাকেন। কাহিনীর প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়গুলো অংকের মাধ্যমে বিন্যাস করা হয়ে থাকে। নাট্যকার নিজের প্রয়োজন মত নাটকের অঙ্ক বিভাগ করে থাকেন। সাধারণভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে পাঁচটি অঙ্ক থাকে এবং নাট্যিক দ্বন্দ্বের প্রয়োজনে নাট্যকার একটি অঙ্ককে একাধিক অংশে বিভক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করে থাকেন। নাটকের এই পাঁচটি অঙ্ক মূলত নাট্যিক দ্বন্দ্ব বিভাগের ধারা অনুসারে করা হয়ে থাকে। নাট্যকার নিজের প্রয়োজন মত নাটকের অঙ্ক বিভাগ করে থাকেন। নাটকের এই পাঁচটি অঙ্ক মূলত নাট্যিক দ্বন্দ্ব বিভাগের ধারা অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে পাশ্চাত্য নাটকের কোন পার্থক্য নেই। নাটকের এই পাঁচটি অঙ্ক– ১. মুখ (Introduction) ২. প্রতিমুখ (Rising action) ৩. গর্ভ (Climax) ৪. বিষয় (Falling action) ও ৫. উপসংহার (Conclusion)।

(বিভাস রায় চৌধুরী, নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা, পৃ. ১৩৪৩-৪৮)

নাটকের এই অঙ্ক বিভাগ পিরামিডের আকৃতির সঙ্গে তুলনা করে নাট্যিক দ্বন্দ্ব নির্দেশ করার রীতি প্রচলিত। নাট্যিক দ্বন্দ্ব অনুসারে নাট্যকার অঙ্কগুলো সাজিয়ে থাকেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, নাট্যিক দ্বন্দ্ব অনুযায়ী প্রথমেই এই দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করতে পারে অথবা নাট্যিক দ্বন্দ্ব ধীর গতিতে অগ্রসর হয়ে ক্রমোচ্চ শাখায় উপনীত হতে পারে। এক্ষেত্রে একটি দিক লক্ষণীয় যে, পঞ্চমাঙ্ক নাটকে যেভাবে অঙ্ক বিভাজনের ক্ষেত্রে নাটকীয় দ্বন্দ্ব পাঁচটি পরিত্তের সাহায্যে নির্দেশ করা হয়, একাঙ্ক নাটকে তা সম্ভব নয়। নাটকে পঞ্চাঙ্কের প্রথা প্রচলিত থাকলেও সব নাট্যকার এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন না। অনেক নাট্যকারই অঙ্ক বিভাজন না মেনে পর পর ঘটনার বিন্যাস করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকের পঞ্চম অঙ্ক ও অঙ্ক প্রথা বর্জনসহ দুয়েরই বিকাশ লক্ষণীয়। তাঁর 'রক্তকরবী' নাটকে পঞ্চ অঙ্কের প্রচলিত প্রথা গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি প্রাচীন নাট্যকারদের মধ্যে অনেকেই এই প্রথা অনুসরণ করেননি। প্রসঙ্গক্রমে সফোক্লিসের 'ইডিপাস' নাটকের উল্লেখ করা যায়। অবশ্য প্রাচীন গ্রীসে নাটক ট্র্যাজেডি হিসাবে চিহ্নিত করে নাটকের দ্বন্দ্ব প্রকাশে ভিন্নতর প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হত।

কাহিনীর অবিচ্ছিন্ন ভাব ধরে রাখার প্রয়োজনে অঙ্ক বিভাগের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন অঙ্কের মধ্য দিয়েই চরিত্র সৃষ্টি, স্থান ও কালের ঐক্য এবং সংলাপ সৃষ্টি করা হয়। পাশ্চাত্য দেশ সেক্সপীয়রের নাটকে পঞ্চ অঙ্কের বিভাজন স্পষ্ট থাকলেও নরওয়েজীয় নাট্যকার ইবসেনের সময় থেকে অঙ্ক বিভাজনের প্রাচীন রীতি ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। পাঁচ অঙ্কের স্থানে তিন, দুই বা অঙ্ক গ্রহণের মনোভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নাটকের প্রথম অঙ্কে কাহিনীর প্রস্তাবনা বা সূত্রপাতের মাধ্যমে দ্বন্দ্বের পটভূমি বিস্তার করা হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বন্দ্বের সূত্রপাতের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক দ্বন্দ্বের প্রবলতার দিকটি প্রকাশিত হয়। এক

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষের দ্বন্দ্ব প্রবল আকার লাভ করে এবং তৃতীয় অঙ্কে দ্বন্দ্বের ক্রমোচ্চ অবস্থান দেখান হয়। এই অঙ্কেই দ্বন্দ্ব তীব্রতা লাভ করে এবং চতুর্থ অঙ্কে দ্বন্দ্বে তীব্রতা হ্রাসের সঙ্গে প্রবল প্রতিপক্ষের জয় ঘোষিত হয়। পঞ্চম অঙ্কে মূলত সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে জটিলতা মুক্তির মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে নাটকের শেষ অঙ্কে ঘটনার পূর্ণ পরিণতির সঙ্গে দর্শক মনের শ্রান্তিমোচন করাও হয়।

নাটকের প্রধান উপাদান কাহিনী বিবেচনা করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কাহিনীকে অবলম্বন করে নাটকের চরিত্র সৃষ্টি ও তার বিকাশের প্রয়োজন হয়। নাটকে কাহিনী নির্মাণের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নাটকের কাহিনীর মাধ্যমে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রয়োজনে আদি, মধ্য ও অন্ত এই তিনটি বিভাজনও প্রচলিত। গঠন কৌশলের মাধ্যমেই কাহিনীর মধ্যস্থিত দিকগুলির সংবদ্ধ রূপ দেওয়া সম্ভব। অন্যভাবে বলা যায় যে, কাহিনীর মধ্যস্থিত বিভিন্ন ঘটনার দৃঢ় সমৃদ্ধ রূপের প্রতিই সচেতন নাট্যকার দৃষ্টিপাত করে থাকেন। নাটকে প্রধান কাহিনীর সঙ্গে শাখা কাহিনীর অন্তর্ভুক্তি হলেও উভয়ের মধ্যে কাহিনীর ঐক্য বিদ্যমান থাকে।

এখানে একটিমাত্র দৃশ্যের অবতারণা করলেও মাত্র কয়েকটি চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এক প্রকার ভাব পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে কিছু নতুন চরিত্র হিসেবে কবরের মূর্দাদের উপস্থিত করে নতুন ভাব পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে মূর্দাদের মুখে ভাষা যুগিয়ে নাটকের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন। একটি মাত্র দৃশ্যের অবতারণা করলেও পঞ্চ অঙ্কবিশিষ্ট নাটকের বৈশিষ্ট্য এখানে নষ্ট হয়নি। 'কবর' নাটকে একটিমাত্র দৃশ্যের অবতারণার মধ্যেই নাটকের শুরু এবং পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ইডিপাস নাটকেও একটিমাত্র দৃশ্যের অবতারণার মধ্যে নাটকের শুরু এবং পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

(নাটকের কথা, অজিত কুমার ঘোষ, পৃ. ১৪)

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক একাঙ্কিকা

একাঙ্কিকা নাটকে পঞ্চম অঙ্কবিশিষ্ট নাটকের সঙ্গে নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র ও সংলাপের দিক থেকে পার্থক্য বিদ্যমান।

সংস্কৃত বা বাংলা বহু অঙ্কবিশিষ্ট, নাটকের মতই একাঙ্কিকা নাটকেরও প্রথম উদ্ভব হয় ভারতবর্ষে। একাঙ্কিকার লক্ষণ যে শুধু একটি অঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়, এর প্রধান লক্ষণ আয়তনের স্বল্পতায় এবং ঘটনার সংক্ষিপ্ততায়।

একটি অঙ্কের মধ্যে দৃশ্যের পর দৃশ্য যোজনা করে পূর্ণাবয়ব নাটক রচনা করলেই একাঙ্কিকার মর্যাদা পায় না, একাঙ্কিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, It one aspect, character, action, background, emotion.

("Dictionery of World Litrature", *P. 19*)

একাঙ্কিকার লক্ষণ হবে ছোট গল্পের মতই। ছোট গল্পের উদ্দেশ্য যেমন হবে– ক. সংক্ষিপ্ত এবং খ. সংবেদন হবে খুব তীব্র, তেমনি একাঙ্কিকার লক্ষ্যও হবে অবিমিশ্র, উপায় হবে অবান্তর শূন্য ও অপরিহার্যটুকু এবং সংবেদনা হবে তীব্র সংবাদী।

এই কারণেই একাঙ্কিকাকে পরিস্থিতিতে চরম উদ্দীপক করতে হয়, চরিত্রকে করতে হয় একাধারে ব্যক্তি এবং প্রতিনিধি এবং অসাধারণ অবস্থার সম্মুখীন অসাধারণ ব্যক্তি।

একাঙ্কিকায় চরিত্রের বিকাশ দেখাবার সুযোগ থাকে না। তাই চরিত্রের প্রকাশ মুখ্য উদ্দেশ্য হয় না। অল্প পরিসরে জীবন সত্যের গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি এর লক্ষ্য। সার্বিকভাবে পরিস্থিতি, চরিত্র, সংবেদনা, উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ে যে একাঙ্কিকা উল্লেখিত আদর্শের যত নিকটবর্তী হয় তা তত প্রশংসনীয় সৃষ্টি আর যত দূরবর্তী হয় তা তত দূষণীয় হয়।

(নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, সাধন কুমার ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৭৩-৭৫)

একাঙ্কিকা নাটকের প্রতিষ্ঠা

মুনীর চৌধুরী একাঙ্কিকা নাটক রচনা করেন স্বাধীন নাট্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠার পর। ছোটগল্পের মতই একাঙ্কিকাও ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। ছোটগল্প দ্রুত প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মূলে ছিল সংবাদপত্র। সংবাদপত্রকে আশ্রয় করে ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবন সমালোচনার বিভিন্ন দিক

Dhaka University Institutional Repository

ছোটগল্পের আকারে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ করে নেয়। সংবাদপত্রের পত্রপুটেই ছোটগল্পের জন্ম ও পুষ্ট। কিন্তু একাঙ্কিকা রচনার প্রেরণার জন্য শুধু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাই যথেষ্ট ছিল না, একাঙ্কিকা রচনার মুখ্য প্রেরণা এসেছে একমাত্র রঙ্গালয়ে একাঙ্কিকা অভিনয়ের চাহিদা থেকেই। একাঙ্কিকা নাটিকা দৃশ্য কাব্যেরই বিশেষ এক প্রজাতি এবং অঙ্ক সংখ্যার ভিত্তিতেই এই শ্রেণী বিভাগ কল্পনা করা হয়েছে। অন্যদিকে একাঙ্কিকা হচ্ছে সেই শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য যা একটি অঙ্কের পরিসরে এবং স্বল্পায়তনে উপস্থাপিত হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্কবিশিষ্ট নাটক থেকে একাঙ্কবিশিষ্ট নাটকের পার্থক্য শুধু অঙ্ক বিভাজনে। একাঙ্কিকা নাটকের কাজ হলো একটিমাত্র অঙ্কের পরিসরে উপাস্থাপিত হওয়া। তাই একাঙ্কবিশিষ্ট নাটককে স্বল্পায়তন বৃত্তের দৃশ্য কাব্যও বলা যায়। স্বল্পায়তন বা স্বল্প পরিসরে উপস্থাপিত হওয়াই একাঙ্কিকার বিশেষ লক্ষণ।

প্রত্যেক শিল্পসামগ্রী কিছু অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এই এককত্ব বা সমগ্রত্ব প্রত্যেক শিল্পের অপরিহার্য লক্ষণভ একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের কোন বিচ্ছিন্ন অঙ্গকে একাঙ্কিকা নাটিকার মর্যাদা দেওয়া যায় না বা একটি অঙ্কের পরিসরে অসমন্বিত ঘটনার বিন্যাস থাকলেও একাঙ্ক নাটিকা হিসাবে চিহ্নিত হবে না। একাঙ্ক নাটিকা নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বৃত্ত, পরিসরে ছোট হলেও একটি সমগ্র কর্ম। একটি দৃশ্যে সম্পন্ন হলেও নাটকে থাকে একটি আদ্য একটি মধ্য ও একটি অন্তবিশিষ্ট কাহিনী।

আদ্যে একটি ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হবে, মধ্যে বিকাশ, অন্তে হবে ঔৎসুক্যের শেষ। অর্থাৎ একাঙ্কিকা নাটিকা স্বতন্ত্র শিল্পকর্মের মর্যাদা তখনই পাবে যখন স্বয়ংসম্পূর্ণ রসসম্পন্ন ঘটনাতন্ত্রতার মধ্যে থাকবে।

একাঙ্ক নাটকের লক্ষণ

একটি নাটকে আদি, মধ্য, অন্ত কি সে সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যায়। এ্যারিস্টটলের সূত্র ধরে বলা যায়, নাটকে আদি, মধ্য অন্ত প্রত্যেক বৃত্তিই সম্পূর্ণ, সমগ্র এবং আয়তনসম্মত কার্য উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

আদির ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে এ্যারিস্টটল বলেছেন, "a beginning is that which does not itself follow anything by casual necessity but after which something naturally is or comes to be." অর্থাৎ বৃত্তের আদ্য বা প্রারম্ভিকে থাকবে এমন ঘটনা যা অন্য পূর্ববর্তী ঘটনার অনিবার্য পরিণতি বলে মনে হবে না অথবা যা পূর্বের কোন ঘটনার আকাঙ্ক্ষা জাগাবে না, কিন্তু পরবর্তী ঘটনার অনিবার্য কারণ রূপে কাজ করে পরবর্তী ঘটনার ও পরিণতির আকাঙ্ক্ষা জাগাবে।

Dhaka University Institutional Repository

বৃত্তের মধ্যবর্তী সন্ধি বা ঘটনা হবে সেই ঘটনা যা পূর্ববর্তী ঘটনার কার্য এবং পরবর্তী ঘটনার কারণ অর্থাৎ মধ্য সন্ধিতে থাকবে এমন ঘটনা যা একাধারে পূর্বে ঘটনাপেক্ষী বা পরঘটনাভিমুখী। বর্তমানের মতোই তা অতীতের পরিণতি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নির্দেশ করবে।

অন্ত ঘটনা হবে, "That which itself naturally follows some other thing either by necessity or as rule, but has nothing following it." অর্থাৎ এমন ঘটনা যা পূর্ববর্তী ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি কিন্তু যার পরে অন্য কোন ঘটনার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এ্যারিস্টটল সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, সুগঠিত কোন বৃত্ত, "Must neither begin nor end at haphazard but confirm to these rules" এর সারমর্ম বা মূল কথা হল ছোট বা যেরূপ বৃত্তই হোক তার আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনা কার্যকারণ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আরম্ভ ও শেষ নিয়মের সূত্রে আবদ্ধ। আরম্ভকে বলা হয়েছে শেষের মূলাকরণ বা সম্ভাবনা এবং শেষকে চিহ্নিত করা হয়েছে আরম্ভেরই স্বাভাবিক বা সম্ভাব্য পর্যাবসান রূপে।

প্রারম্ভ এবং উপসংহার যেখানে অবিচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত, আদি, মধ্য, অন্ত যেখানে কার্যকরণ নিয়মসূত্রে আবদ্ধ। সেখানেই ঘটনাপরম্পরা সমগ্রতায় মণ্ডিত হয় এবং বৃত্ত মর্যাদা লাভ করে। বড় ছোট সব বৃত্তের পক্ষেই অত্যাবশ্যক এবং তা রক্ষা করতে গেলে যা যা অবশ্য পালনীয় একাঙ্ক নাটিকাকে তা পালন করতে হবে। একাঙ্ক নাটিকাকেও সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে গঠন উৎকর্ষ অর্জন করতে হবে। এসব বিষয়ে এবং নাটকীয়ত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে একাধিক অঙ্কের নাটকের সঙ্গে একাঙ্ক নাটিকার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

একাঙ্ক নাটকের প্রসার ও সমৃদ্ধি

ইংল্যান্ড ও আমেরিকার একাঙ্ক নাটকের ইতিহাস থেকে জানা যায়, বিংশ শতকের প্রথমার্ধেই একাঙ্ক নাটকের ব্যাপক প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটে। বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটক রচনা ও প্রযোজনার মূলে আছে পাশ্চাত্যের নানা অভিজ্ঞতা। এদেশে প্রথমে একাঙ্কিকা নাটকের উৎসব দিয়েই একাঙ্ক নাটকের প্রতি প্রথম মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়। তারপর একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজনের মধ্য দিয়ে এর প্রসারের ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৫ সালে থিয়েটার সেন্টারের উদ্যোগে প্রথমে একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং একাঙ্ক নাটকের প্রসার লাভ করতে থাকে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই একাঙ্ক নাটকের জোয়ার আসে 'নবজন্ম', 'দৈনন্দিন', 'সম্রাজ্ঞী',

Dhaka University Institutional Repository

'আয়না', 'এক পশলা বৃষ্টি', 'বুদবুদ' প্রভৃতি একাঙ্কিকার মধ্য দিয়ে। আর একাঙ্কিকা যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা হলেন, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, অন্নদা শঙ্কর রায়, বনফুল, মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

একাঙ্ক নাটকের বৈশিষ্ট্য

বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটক একান্তভাবেই বিংশ শতাব্দীর ফসল। একাঙ্ক নাটকের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, যেমন– ১. সময় সংক্ষেপ ২. অব্যবসায়ী প্রচেষ্টা ৩. আঙ্কি নৈপুণ্য ও ৪. সমাজ সচেতনতা। এই চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছাড়াও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয় যেমন, ঘটনার সময় ব্যাপ্তি ও অভিনয়ের সময়ে ব্যাপ্তি প্রায় একরূপ হতে হবে। তাছাড়া, একাঙ্ক নাটকে বহু চরিত্র ও ঘটনার বিচিত্রতা ও আবর্তময়তা এই নাটকের ধর্মবিরোধী। এখানে কাহিনীর মধ্য দিয়ে নাটকে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করার সুযোগ কম। কারণ স্বল্প পরিসর ঘটনা ও স্বল্প বিস্তৃত সময়ের মধ্যে এই নাটতকে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। সেজন্য চরিত্রের মধ্যে যে জটিলতা ও পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি থাকে সেগুলি পরিস্ফূট করে নাটকের মধ্যে তীব্র নাট্যিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে হয়। এগুলো ছাড়াও ঘাত-প্রতিঘাত, অন্তর্দ্বন্দ্ব, নাট্যোৎকণ্ঠা, বিস্ময় ও আকিস্মকতা প্রভৃতি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়।

একাঙ্ক নাটকে পরস্পরবিরোধী প্রকৃতির সমাবেশ নাট্যকার যত বেশি পরিমাণে করবেন ততই নাট্য গুণসমৃদ্ধ হবে। এখানে নাটকীয়তা সৃষ্টির আরও একটি উপায় হলো নাট্যোৎকণ্ঠা জমিয়ে তোলা, কারণ সাসপেনস্ বা নাট্যোৎকণ্ঠা সমস্ত নাটককে চুম্বকের মত ধরে রাখে। একাঙ্ক নাটকের বিস্তৃতি কম বলে এই নাটকের মধ্যে চরিত্রের বাহুল্য এবং ঘটনার বৈচিত্র্য আনা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চ অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক

নাটকে স্বাভাবিক ও প্রচলিত অঙ্কের সংখ্যা পাঁচ। পঞ্চ অঙ্ক বিভাগ রীতি বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ইবসেন প্রমুখ নাট্যকারের সময়ে নাটকে তিন অঙ্কের রীতি প্রবর্তিত হয়। তখন থেকে নাটকের অঙ্ক সংখ্যা কমপক্ষে তিন এবং সাধারণভাবে পাঁচ অঙ্কে দাঁড়ায়।

পঞ্চ অঙ্ক নাটকের সঙ্গে একাঙ্ক নাটকের পার্থক্য

পঞ্চ অঙ্ক বা বহু অঙ্কবিশিষ্ট নাটকের সঙ্গে একাঙ্ক নাটকের যে পার্থক্য রয়েছে তা হল নাটকের আয়তনের পরিসর ও কাহিনী গ্রন্থনের মধ্যে। পঞ্চমাঙ্ক নাটকের নাট্যকারকে বৃহদায়তন বৃত্তের বিস্তৃত পরিসরে উল্লেখিত সমস্যার সমাধান করতে হয় আর একাঙ্ক নাটিকার নাট্যকারকে স্বল্পায়তন বৃত্তের সংকীর্ণ পরিসরে সমস্ত কিছু সম্পাদন করতে হয়।

বহু অঙ্ক নাটকে বৃহৎ আয়তন তার প্রতিপাদ্যের বিস্তার সম্ভাবনার মধ্যেই নিহিত থাকে। একাঙ্ক নাটকে বৃত্তের স্বল্প আয়তন ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের দেশ-কাল-পাত্র সাপেক্ষতার উপরে নির্ভর করে। অনেকাঙ্ক ও একাঙ্ক নাটকের মধ্যে উপসংহার অভিমুখী একটি আরোহণশীল ক্রমগতি থাকে। তেমনি একাঙ্ক নাটিকার স্বল্পকালব্যাপী কার্যেও আরম্ভ থেকে উপসংহার পর্যন্ত ক্রমপরিণতি এবং আরোহণ থাকা প্রয়োজন। মোট কথা বহু অঙ্ক নাটক সমগ্রতার একটি বৃহৎ ক্ষেত্র এবং একাঙ্ক নাটিকা সমগ্রতার সংকীর্ণ একটিমাত্র ক্ষেত্র। স্বল্প পরিসরে দ্বন্দ্ব জটিলতার মধ্য দিয়ে নাটকের দ্রুত পরিণতি ঘটানোই হলো এই নাটকের উদ্দেশ্য। এখানে পরিসর ছাড়া অন্য ক্ষেত্রের পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। যেমন পূর্ণাঙ্গ নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের অবতারণা করে কিংবা ঘটনার প্রধান ধারার সঙ্গে নানা উপধারার সংযোগ করে কৌতূহলোদ্দীপক ভাবের বিচিত্রতা সৃষ্টি করার সুযোগ থাকে। অন্যদিকে, একাঙ্গ নাটকে চরিত্র বা কাহিনী নিরূপণে এ সুযোগ নেই। বৈচিত্র্যের স্থলে ঐক্য এবং বিস্তারের স্থলে দ্রুত গতিই হলো একাঙ্ক নাটকের আদর্শ।

একাঙ্ক নাটকের সংলাপেরও একটা বিশিষ্টতা আছে। পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংলাপের মাঝে মাঝে যে ব্যাখ্যা ও বিস্তার দেখা যায়, একাঙ্ক নাটকে তা অনুসৃত হয় না। এই নাটকের সংলাপ সংক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্র হয়, কারণ এখানে অল্প কথায় অনেক বেশি ভাব ব্যক্তের প্রয়োজন হয় বলে সংলাপের

Dhaka University Institutional Repository

বাক্য ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী হয়। বিরোধী উক্তি, শ্লেষগর্ভ মন্তব্য, গূঢ় অর্থপূর্ণ বাক্য বিন্যাস একাঙ্ক নাটকে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(সাধন ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৭২)।

একাঙ্ক নাটকে অল্প সময়ের মধ্যে জীবনের একটি খণ্ডাংশ আভাসে ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে সমগ্র জীবনের রস আস্বাদন করা যায়।

পূর্ণাঙ্গ নাটকে কাহিনী বিস্তারের মধ্যে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব, বিরোধ, বৈচিত্র্য, বৈপরীত্য, নাট্যোৎকণ্ঠা ও আকস্মিকতা ইত্যাদি নাট্য উপাদানের মধ্য দিয়ে ঘনীভূত নাট্যরস সৃষ্টি করা হয়। একাঙ্ক নাটকে বিস্তারের অভাবে ঘনীভূত নাট্যরস জমে উঠতে পারে না।

দৃশ্য বিভাগ থাকলেই একাঙ্ক নাটক হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। আবার একটি মাত্র দৃশ্য থাকলেও একাঙ্ক বলা যায় না। উদাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মালিনী' নাটকের কথা বলা যায়। 'মালিনী' নাটকটি চারটি দৃশ্যে বিভক্ত হলেও একাঙ্ক বলা যায় না। আবার 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' তে একটি মাত্র অঙ্ক থাকা সত্ত্বেও একাঙ্ক নাটক রূপে গ্রহণ করা যায় না, কারণ এখানে বহু চরিত্র ও ঘটনার বিচিত্র আবর্তময়তা থাকায় এগুলো একাঙ্ক নাটকের ধর্ম বিরোধী।

একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দিলীপ কুমার মিত্র লিখেছেন, "একাঙ্ক নাটক হলো একক কাহিনী সম্পন্ন অবিচ্ছিন্ন দ্রুত উত্থান-পতনবহুল ঘটনাসমৃদ্ধ পরিমিত আয়তন, আদি মধ্য অন্ত্য সমন্বিত দৃশ্যকাব্য যা একদিকে এক দৃশ্যময় স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্তে সংবৃত্ত অপর দিকে দ্বন্দ্ব সংক্ষুব্ধ রস সমৃদ্ধ ভাব নিবিড় রচনা।"

পঞ্চাঙ্ক নাটকের বৈশিষ্ট্য

নাটককে দৃশ্য কাব্য ও শ্রব কাব্য বলা হয়ে থাকে, কারণ দৃশ্য কাব্যে ঘটনা পুঞ্জে বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে দৃশ্য স্থাপন করে দেখানো যায় অথবা কাহিনীর কালকে ক্রমান্বয়ে ঘটনার ক্রমবিন্যাসের ধারাকে বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত করে দেখান হয়।

এ্যারিস্টটল নাটকের এই পর্ব ভাগ বা অঙ্ক বিভাগ সম্পর্কে বলেছেন, একটি ঘটনার মধ্যে আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য এই তিনটি পর্ব থাকে। আদ্য পর্বে থাকে ঘটনার সূত্রপাত। মধ্য পর্বে ঘটনা পরিণতির দিকে বিবর্তন ও পরিণতিতে ঘটনার উপসংহার।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চাঙ্ক নাটকে মূল কাহিনীর সঙ্গে কার্যকারণ যুক্ত উপকাহিনী থাকলেও একাঙ্ক নাটকে শাখা কাহিনী থাকার কোন সুযোগ নেই। একটি নাটকে সংলাপ তার প্রধান অবলম্বন হওয়ায় প্রথমে কাহিনীর কাঠামো নির্মাণ করে ঘটনার সূচনা, বিস্তৃতি ও সমাপ্তির একটা ক্রমিক ধারা থাকে। ঘটনাগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে কাহিনী বিস্তার লাভ করে চরিত্রের বিকাশ ঘটায়। ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও কাহিনীর আদি মধ্য অন্ত থাকে। নাটকের ঘটনা এমনভাবে গাঁথা থাকে যাতে রসঐক্য ব্যাহত না হয়।

নাটকে দ্বন্দ্বময় চরিত্র সৃষ্টি প্রধান একটি দিক হিসেবে বিবেচিত। নাটকে প্রধান চরিত্র, বিরোধী চরিত্র এবং সহযোগী চরিত্র নাট্য ঘটনার গতি সঞ্চার করে। অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা প্রাধান্য পেলে নাটকের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেক নাটকে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী চরিত্র থাকে। উত্থান ও পতনোন্মুখ চরিত্রই নাটকে প্রাধান্য পায়। পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনীর গতি দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময় চরিত্রের বিকাশ ঘটে। তাছাড়া, স্থান কালানুগ পরিবেশ রচনা, সম্ভাব্য স্থলে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত প্রদান প্রভৃতি কাহিনীকে পরিণতির পথে এগিয়ে দেওয়া নাট্য সংলাপের কাজ। সংলাপ ভাবাবেগ সৃষ্টির উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজনীয়, কারণ ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নাটক জমে ওঠে। ভাবাবেগ অবলম্বনেই নাটকে রসের সৃষ্টি হয়।

নাটকের সংলাপে গাঢ় সংগতি থাকা দরকার। নাটকে গানও এক প্রকার সংলাপ।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, একটি সার্থক পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনায় নাটকের ঘটনার গতিশীলতা, সম্ভাব্যতা সৃষ্টির শক্তি প্রভৃতি উপাদানের সঙ্গে নাট্যকারের বুদ্ধদীপ্ত পূর্ণাঙ্গ নাটক সৃষ্টি করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

নাট্যকার মুনীর চৌধুরী

অল্প বয়স থেকেই মুনীর চৌধুরী প্রতিভাদীপ্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। সে সময়ে তাঁর মনে নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ জন্মে। খেলাধুলা ও বিদ্যানুরাগের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। যুক্তিতর্ক ও বক্তৃতায় ছিলেন পারদর্শী। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পাঠ্যাবস্থাতেই ঘনিষ্ঠ আকর্ষণ গড়ে ওঠে।

বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ার পরেই তিনি সাহিত্য রচনা শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন নাটক মঞ্চস্থ ও অভিনয় শুরু করেন। মুনীর চৌধুরী সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেন প্রাবন্ধিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে। পরবর্তী জীবনে তিনি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেন। সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর প্রধান অঙ্গন ছিল নাটক। তাঁর নাটক রচনার কাল ১৯৪৩ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত।

দেশ বিভাগের পর ঢাকা বেতারের জন্য তিনি স্বনামে-বেনামে বহু ছোট নাটক লেখেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ঢাকা বেতারে নাট্য বিভাগ চালু রাখার দায়িত্ব ভার এসে পড়ে নাজির আহমদের উপর। তিনি ছিলেন মুনীর চৌধুরীর বড় ভাই কবীর চৌধুরীর সহপাঠী। তিনিই প্রথম মুনীর চৌধুরীকে নাটক লিখে দেবার জন্য অনুরোধ জানান। এই অনুরোধ রক্ষা করার জন্য নাটক রচনার সূত্রপাত ঘটে।

অধ্যাপনার সময় 'রক্তাক্তপ্রান্তর', 'কৃষ্ণকুমারী', 'সারেং', 'ডক্টরস ক্লাব', 'বিজয়া', 'জবানবন্দী', 'মাটির ঘর', 'শেষরক্ষা' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় ও পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় রচনা করেন একাঙ্ক নাটক 'মিলিটারী'। প্রগতিশীল রাজনৈতি চেতনাসমৃদ্ধ গভীর আবেদনময় নাটক 'নষ্ট ছেলে'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অস্থায়ী লেকচারের পদে নিযুক্ত থাকাকালীন কিছু ইংরেজি নাটক অনুবাদ করেন। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটক রচনা করে ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। নাটক ছাড়া জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি পুরস্কৃত হন। যেমন, 'মীরমানস' রচনা করে 'দাউদ' পুরস্কার লাভ করেন। রাজনীতির জন্য ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত 'সিতরা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব অর্জন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মুনীর চৌধুরীর নাট্য সাধনার কাল ১৯৪৩-১৯৭১ পর্যন্ত। অধ্যাপনা পেশা হলেও নাটক রচনা তাঁর জন্য নেশা ছিল। তিনি ছাব্বিশটি মৌলিক নাটক রচনা করেন। তার মধ্যে 'রক্তাক্ত প্রান্তর' ও 'চিঠি' মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক ও অবশিষ্ট বারোটি একাঙ্কিকা। তাঁর জীবিতকালেই অনেকগুলো নাটকের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়। ঢাকা বেতারের জন্য স্বনামে ও বেনামে যে নাটক রচনা করেন সেগুলোও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর নাটকের সংখ্যা অনুবাদমূলক তিনটি, মৌলিক নাটক দুটি, আর বারোটি একাঙ্কিকা।

মুনীর চৌধুরীর একাঙ্কিকাতে রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ যা তাঁর মনকে আলোড়িত করেছিল তারই বুদ্ধিদীপ্ত প্রকাশ ঘটেছে একাঙ্কিকাগুলোতে।

নাট্যকারের মৌলিক একাঙ্কিকার তালিকা নিম্নরূপ :

১. নওজোয়ান কবিতা মজলিস (১৯৪৩)
২. সংঘাত (১৯৪৩)
৩. গুণ্ডা (১৯৪৪)
৪. একটি মশা (সন উল্লেখ নেই)
৫. নেতা (সন উল্লেখ নেই)
৬. ঢাক (সন উল্লেখ নেই)
৭. গতকাল ঈদ ছিল (সন উল্লেখ নেই)
৮. একাঙ্কিকা (১৯৪৫)
৯. রাজার জন্মদিনে (১৯৪৬)
১০. বেশরিয়তি (১৯৪৭)
১১. মানুষ (রচনা ১৯৪৭) প্রথম প্রকাশ (১৯৫০)
১২. পলাশী ব্যারাক (রচনা ১৯৪৮)
১৩. ফিট কলাম (রচনা ১৯৪৮)
১৪. আপনি কে (রচনা ১৯৪৮) প্রথম প্রকাশ (১৯৫৫)
১৫. নষ্ট ছেলে (রচনা ১৯৫০)
১৬. মিলিটারী (রচনা ১৯৫০)
১৭. কবর (রচনা ১৯৫৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৫)
১৮. দণ্ড (রচনা ১৯৬২)
১৯. একতলা দোতলা (রচনা ১৯৬৫)

Dhaka University Institutional Repository

২০. দণ্ডকারণ্য (রচনা ১৯৬৫)

২১. কুপোকাৎ (রচনা ১৯৬৬)

২২. মর্মান্তিক (রচনা ১৯৬৭)

২৩. দণ্ডধর (রচনা ১৯৬২)

২৪. বংশধর (রচনা ১৯৬৭)

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা

১. একটি মশা

২. নেতা

৩. গুণ্ডা

৪. বেশরিয়তি

৫. গতকাল ঈদ ছিল

৬. নওজোয়ান কবিতা মজলিস

৭. একাঙ্কিকা

৮. সংঘাত

৯. ঢাক

১০. কুপোকাৎ

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত মৌলিক একাঙ্কিকা নাটক

'মানুষ' নাটিকা রচিত হয় ১৯৪৭ সালে এবং গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। কাহিনী গড়ে উঠেছে ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অবলম্বনে। নাটিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা দশ।

'পলাশীব্যারাক' রচিত হয় ১৯৪৮ সালে ও প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। এই নাটিকার কাহিনীও গড়ে উঠেছে ১৯৪৮ সালের অসাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে। পৃষ্ঠা সংখ্যা দশ।

'ফিটকলাম' নাটিকাটি রচিত ও প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। কাহিনী গড়ে উঠেছে ১৯৪৮ সালের ঘটনা কেন্দ্র করে। দশ পৃষ্ঠা সম্বলিত নাটিকা।

'আপনি কে'-এর রচনাকাল ১৯৪৮ সাল এবং প্রকাশকাল ১৯৫৫ সাল। কাহিনী গৃহিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিচিত্র পোষাকে বনভোজন করতে যাওয়া এবং ভুলক্রমে খাদ্য

Dhaka University Institutional Repository

দ্রব্য ফেলে যাওয়ায় খাদ্যের অভাবের জন্য নিদারুণ পরিস্থিতি ও মনের সংঘাত। তাদের অনুসরণকারী গোয়েন্দা খাদ্য দ্রব্য নিয়ে তাদের সম্মুখে হাজির হয়। তখন তারা তার পরিচয় জানতে চায় ও দেবতা অবতার বলে আখ্যা দেয়। নাটকটি তের পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এখানে গৌণভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনার দিক অন্তর্ভুক্ত।

'নষ্ট ছেলে' একাঙ্কিকার রচনা ও প্রকাশকাল ১৯৫০ সাল। কাহিনী বিধৃত হয়েছে ১৯৪৮ সাল ও তার পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে। নাটিকার দৃশ্য সংখ্যা দুই ও পৃষ্ঠা সংখ্যা সতের।

'মিলিটারী' মৌলিক একাঙ্কিকা, রচনা ও প্রকাশ ১৯৫০ সাল। কাহিনী ১৯৫০ সালের কারফিউ ও সাধারণ মানুষের কার্যকলাপকে নিয়ে গঠিত। নাটকের পৃষ্ঠা সংখ্যা দশ।

'কবর' ১৯৫৩ সালে রচিত ও ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত। অন্যান্য নাটিকার মধ্যে 'কবর' একটি গুরুত্বপূর্ণ একাঙ্কিকা। এর কাহিনী গড়ে উঠেছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। নাটিকাটি একটি অঙ্ক ও একটি দৃশ্য সম্বলিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা বাইশ।

'দণ্ড' রচনাকাল ১৯৬২ সাল। কাহিনী স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক জীবনের কথোপকথন। একটি অঙ্কে ও নয়টি পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রকাশ কাল জানা যায়নি।

448491

'দণ্ডধর' ১৯৬২ সালে রচিত। প্রকাশ কাল জান যায়নি। এটিও মৌলিক একাঙ্কিকা। এই নাটিকায় জগৎ ও জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অন্তর্ভুক্ত। অঙ্কের সংখ্যা এক ও পৃষ্ঠা সংখ্যা ঊনিশ।

'দণ্ডকারণ্য' রচনাকাল ১৯৬৫, প্রকাশকাল ১৯৬৬ সাল। এটিও মৌলিক একাঙ্কিকা। রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে বর্তমান কালের ঘটনার মেলবন্ধন। একটি অঙ্কে ও ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

'একতলা দোতলা' দণ্ডকারণ্যের সমসাময়িক কালে অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে রচিত ও প্রকাশিত। বাস্তব অভিজ্ঞতার কাহিনী এখানে রূপায়িত। একটি অঙ্কে ও বারোটি পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

'মর্মান্তিক' রচনাকাল ১৯৬৭ সাল। প্রকাশ কাল জানা যায়নি। লোকপ্রিয় পাশ্চাত্য সঙ্গীত অবলম্বনে কাহিনী পরিকল্পিত। একটি অঙ্কে বিভক্ত, তেইশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি।

'বংশধর' ১৯৬৭ সালে রচিত। প্রকাশকাল নেই। মৌলিক একাঙ্কিকা। কাহিনীতে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রকাশ লক্ষণীয়। একটি অঙ্ক চৌদ্দ পৃষ্ঠা সম্বলিত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা

মুনীর চৌধুরীর একাঙ্কিকাগুলি পরবর্তীকালে আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। তিনি চারখণ্ডে মুনীর চৌধুরীর রচনাবলী সম্পাদনা করেন। প্রথম খণ্ডে নাট্যকারের মৌলিক নাটক অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে 'রাজার জন্মদিনে' ছাড়া সবগুলো নাটিকাই স্থান পেয়েছে। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত নাটক হল : 'একটি মশা', 'নেতা', 'গুণ্ডা', 'বেশরিয়তি', 'গতকাল ঈদ ছিল', 'নওজোয়ান কবিতা মজলিস', একাঙ্কিকা 'সংঘাত', 'ঢাক', 'কুপোকাৎ' ও 'মর্মান্তিক'।

কবীর চৌধুরী লিখিত মুনীর চৌধুরীর জীবনীমূলক গ্রন্থে রচনাপঞ্জী অনুচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ৩২-৩৩), 'রাজার জন্মদিনে' (১৯৪৬) নাটিকাটির নাম এবং রচনাকালের উল্লেখ থাকলেও আনিসুজ্জামান সম্পাদিত প্রথম খণ্ডে 'রাজার জন্মদিনে' রচনাকালের কোন উল্লেখ নেই। গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্যতার কারণে বর্তমান অভিসন্দর্ভ করা সম্ভব হয়নি।

'নওজোয়ান কবিতা মজলিস'

এই একাঙ্কিকার রচনাকাল ১৯৪৩ (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত)। এর কাহিনী নওজোয়ানদের সাহিত্য পাঠের মজলিস অবলম্বনে গ্রন্থিত। একটি অঙ্কে, দুটি দৃশ্যে, উনিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

'সংঘাত'

রচনাকাল ১৯৪৩ সাল। নাটিকাটি 'প্রতিরোধ' পত্রিকায় প্রকাশিত ও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। কাহিনীতে স্থান পেয়েছে কবিদের সমালোচনা ও ব্যঙ্গ। বাংলা ১৩৫০ সালের চৈত্র সংখ্যায় 'প্রতিরোধ' পত্রিকায় নাটিকাটি প্রকাশিত হয়। একটি অঙ্কে ও চার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

'গুণ্ডা'

রচনাকাল ১৯৪৪ সাল। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত। সমাজ সমালোচনামূলক রচনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক চরিত্র নিয়ে ঘটনা আবর্তিত। একটি অঙ্কে ও বারো পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

'একাঙ্কিকা'

রচনা ১৯৪৫ সাল। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। সমাজ সমালোচনামূলক রচনা। বাংলা ১৩৫০ সালে বৈশাখ সংখ্যায় 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। একটি অঙ্কে ও ছয় পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

'বেশরিয়তি'

রচনাকাল ১৯৪৭ সাল। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত তবে বাংলা ১৩৫০ সালে শ্রাবণ সংখ্যায় 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটিও সমাজ সমালোচনামূলক রচনা। একটি অঙ্কে আট পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

'ঢাক'

চল্লিশ দশকের রচনা। সঠিক সন তারিখ পাওয়া যায়নি। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। বিষয়বস্তুতে সমাজ সমালোচনা স্থান পেয়েছে। একটি অঙ্কে ও চৌদ্দ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে।

'গতকাল ঈদ ছিল'

চল্লিশ দশকের রচনা। রচনাকাল জানা যায়নি। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। সমাজ সমালোচনামূলক রচনা। এক অঙ্ক বিশিষ্ট; পৃষ্ঠা সংখ্যা নয়।

'একটি মশা'

রচনার তারিখ পাওয়া যায়নি। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী চেতনার বিদ্রূপাত্মক প্রকাশ ঘটেছে বিষয়বস্তুতে। অঙ্ক সংখ্যা এক, পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচ।

'নেতা'

রচনার নির্দিষ্ট সন তারিখ পাওয়া যায়নি। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। নাটিকার নামকরণ করেছেন সম্পাদক। বিষয়বস্তু ১৯৫৩ সালে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলনে ক্ষমতাসীন দলের সংঘাতের কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। আঠারো পৃষ্ঠায় ও একটি অঙ্কে সম্পন্ন।

'কুপোকাৎ'

রচনাকাল ১৯৬৬ সাল। এটিও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। শিশুদের উপযোগী করে নাটিকাটি রচিত। একটি অঙ্কে ও ছয় পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

মুনীর চৌধুরীর গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত নাটিকাগুলির অধিকাংশই সমাজ সমালোচনামূলক রচনা। দুই-তিনটিতে প্রাধান্য পেয়েছে রাজনীতি ও তৎকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সমাজ সমালোচনামূলক কাহিনী ব্যঙ্গ কৌতুকের মাধ্যমে পরিবেশিত।

একাঙ্কিকার মূল্যায়ন

'মানুষ'

সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার নাটক। এর রচনাকাল ১৯৪৭ ও প্রকাশকাল ১৯৫০ সাল। ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত। নাটকে চরিত্রের সংখ্যা সাত, বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন এবং লোকটা ও লোকজন।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু গুণ্ডারা স্নেহময় পিতার সন্তান মোর্শেদকে হত্যা করে। পুত্র শোকে পিতা উম্মাদ হয়ে পড়েন। আম্মা সম্বিতহারা হওয়ার উপক্রম। ভিতরে বাইরে ত্রাসের রাজত্ব চলছে, বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। মোর্শেদকে ছুরি মেরে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেছে একথা ফরিদ পিতাকে জানায়। এ খবর পিতা বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি কল্পনা করছেন যে, মোর্শেদের গলা কেটে হয়তো দেহ ও মুণ্ডু পৃথক করে মুণ্ডুটা কাসার থালায় সাজিয়ে ফেরি করে বেড়াচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। এ দৃশ্য দেখে দলের লোকজন বাহ্বা দিচ্ছে।

অন্যদিকে ছোট খোকা ভীষণ আহত হলেও ঔষধ আনতে যাওয়ার উপায় নেই। এমন সময় রহতম খবর দেয় যে, পাড়ায় একজন হিন্দু গুণ্ডা ঢুকেছে। ফরিদ মোর্শেদের খুনের বদলা নেবার জন্য পাগল প্রায়। ছোট খোকা রোগ যন্ত্রণায় কাতর। সেই মুহূর্তে ঘরের জানালার কাঁচ ভেঙ্গে ধূতি পাঞ্জাবী পরে একটি লোক ঘরে ঢুকে পড়ে। পিস্তল হাতে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? লোকটি জবাব দিল, আমি 'মানুষ'।

লোকটি জাতিতে হিন্দু, পেশায় চিকিৎসক, এসেছিল বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে। আসার পর হঠাৎ দাঙ্গা শুরু হওয়ায় বের হতে পারেনি। মুসলমান বন্ধুও সাহস করে তাকে জায়গা দেয়নি হিন্দু বলে। তাই আগন্তুক নিরাপদ স্থানের খোঁজে বের হয় এবং এক পর্যায়ে ফরিদদের ঘরে ঢুকে পড়ে। ফরিদের আব্বা খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ হলেও তাঁর মধ্যে ছিল প্রখর মানবতাবোধ। তার অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'বন্ধুর বাড়ির চেয়ে এটা বেশি নিরাপদ এ আশ্বাস তোমায় কে দিয়েছে।' লোকটি জবাব দিয়েছিল, আমি আশ্রয় দাবি করছি না, প্রার্থনা করছি।

ইতিমধ্যে ছোট খোকার অবস্থা মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে। বাড়ির সদস্যরা যখন উৎকণ্ঠিত লোকটি তখন ব্যাগ থেকে ডাক্তারী সরঞ্জাম বের করে চিকিৎসায় লেগে যায়। তাকে সন্ধানের জন্য লোকেরা বাড়ি বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। আগন্তুক ডাক্তার একথা জেনে খান্দানী পরিবারের মা তাঁর মশারীর নিচে তাঁর শয্যায় আশ্রয় দিয়ে বিধর্মী ডাক্তারের প্রাণ রক্ষা করেন। ঘরের জিনিসপত্র ওলট-পালট করে লোকেরা চলে যায়। ফরিদ এসে আব্বাকে আগন্তুকের পরিচয় জানতে চাইলে লোকটি নিজেই বলে 'আমি মানুষ'। ছোট খোকা পূর্বের তুলনায় একটু সুস্থ। অপর ভাইয়ের শোকে বোন জুলায়খা ফরিদের বুকে মাথা রেখে ডুকরে কাঁদতে থাকে। সন্তানের শোকে আব্বা কাঠ হয়ে গেছেন, তাঁর চোখে উন্মাদনার ছাপ। আগন্তুক তখনও ছোট খোকার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে কপালে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করছেন। 'মানুষ' নামের একাঙ্কিকার কাহিনীর এখানেই যবনিকা।

Dhaka University Institutional Repository

'মানুষ' একাঙ্কিকায় মানুষের আত্মাহুতি এবং মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশিত। 'আমি মানুষ' সংলাপটি এ নাটকের মর্মবাণী। সন্তানহারা শোকাকুল মা ও পিতা অমঙ্গল আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়েও একজন হিন্দু ডাক্তারকে আশ্রয় দিয়েছেন নিরপরাধ মানুষের জীবন রক্ষার জন্য। এই নাটকের কাহিনীর এখানেই সার্থকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব। এখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে ফরিদ। কিন্তু কাহিনী সাম্প্রদায়িকতার আবর্তে আবদ্ধ থাকেনি। নাটিকাটির পটভূমি রাজনীতি আশ্রিত হলেও এখানে মানবতার সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। নাটিকার পরিবেশ সৃষ্টিতে তরুণী জুলেখার মধ্যে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া কণ্ঠের আকাশ কাঁপানো হুংকার একদিকে বন্দে মাতরম্ অন্যদিকে তীব্র অন্ধকারভেদ করে পাল্টা ধ্বনি আল্লাহু আকবর কিছুক্ষণের জন্য সব স্তব্ধ করে দিয়ে উৎকণ্ঠা ও আকস্মিকতার সৃষ্টি করছে।

'নষ্ট ছেলে'

সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত 'নষ্ট ছেলে' নাটিকাটির রচনাকাল ১৯৫০ সাল। নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে ১৯৪৮ সাল ও তার পরবর্তী সময়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। পাকিস্তান লাভের পর বাঙালি জাতির বাংলা ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীদের আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দেন মুনীর চৌধুরীর বামপন্থী সহোদরা নাদেরা বেগম। এই নাটকে তাঁর পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রয়েছে।

এক আত্মগোপনকারী রাশেদাকে ঘিরে নাটিকাটির কাহিনী আবর্তিত। নাটকে ইতিহাস সচেতনতা লক্ষণীয় তবে প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি কটাক্ষও লক্ষণীয়। নাট্যকার সমাজ সচেতন ছিলেন বলে শিক্ষিত বর্ণচোরাদের ভিন্ন দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

নাটকের পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা নয় জন। এঁরা হলেন বাবা-মা, ভাই-বোন ও কয়েকজন পুলিশ।

নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে স্বাধীনতা উত্তর কালের রাজনৈতিক পটভূমিতে। মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেমে যাঁরা নিজের জীবনের সুখ-শান্তি বিসর্জন ও পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত আত্মগোপন করে ফিরেছে এ নাটকের নায়িকা রাশেদা তাদেরই একজন। রাশেদার পিতা মুনাফাখোর স্বার্থবাদী। তিনি তাঁর মেয়েকে বে-আব্রুভাবে বাইরে বেড়ানোর জন্য ত্যাগ করেছেন। এসব লাঞ্ছনা তাকে কর্তব্যপথ থেকে বিচলিত করতে পারেনি। এই বিপ্লবী নায়িকাকে ধরবার জন্য পুলিশ পুরস্কার ঘোষণা করলেও তাকে ধরা সম্ভব হয়নি। রাশেদার দুই ভাই আমিন ও বুবি। বুবির বয়স ছ-সাত বছর, তার অপর ভাই

Dhaka University Institutional Repository

খোকা। রাশেদার দুই ভাই আমিন ও বুবি বুবির বয়স ছ-সাত বছর, তার অপর ভাই খোকা। রাশেদার দুই ভাই তার ভক্ত। আত্মগোপনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকেও মায়ের সঙ্গে তার যোগাযাগ অক্ষুণ্ন রাখে। সে মাকে চিঠি দেয়, খবর পাঠায়। একদিন হঠাৎ পুলিশ আসে রাশেদাদের বাড়ি তল্লাসী করার জন্য। রাশেদার বাবা এরতাজুল সাহেব এজন্য দুঃখ করে বললেন, "আমার সারা জীবনের গড়া স্বপ্ন, চৌদ্দ পুরুষের রক্তে তাজা খান্দান বাড়ির প্রতি ইটের সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে। পুলিশ লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে আজ সেগুলো ঘাটবে। এত বড় বেইজ্জতের আগে আমার মৃত্যু হয়নি কেন? বিষ-জহর খেয়ে মরে যেতে পারল না মেয়েটা।" এরতাজ সাহেবের ভাই এম্রান সাহেব এ উক্তির কঠিন জবাব দিয়েছিলন এভাবে, "আবোল তাবোল বকোনা। পালের গুদাম থেকে রোজ তোমার আজকাল যা আয় হচ্ছে তাতে খান্দানের সোনার পাহাড় গড়ে উঠতে আর বেশি দেরি নেই। পুলিশের থানা তল্লাসী হাজারবার ঘুরে ফিরে গেলেও ওর চূড়া ছুঁতে পারবে না। তার জন্য ভয় পেও না।"

এসময় রাশেদার মা বুবির কানে কোন কথা বলেন। ঘটনায় জানা যায়, রাশেদার একটা চিঠি ছিল বিছানার নিচে। মার পরামর্শ মত বুবি সেটা নিয়ে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাকে দিয়ে দেয়। পুলিশ তার শরীর, জামাকাপড় তল্লাসী করেও কিছু পায় না। এখানে এরতাজ সাহেবের দৃষ্টি পড়লে তাঁর আত্মসম্মানে ঘা লাগে। তিনি স্ত্রীর উপর রাগারাগি করতে থাকেন এবং বলেন, এই ছেলে দুটিও রাশেদার সাথে 'জাহান্নামের পথে' নেমে যাচ্ছে। বুবিকে এরতাজ সাহেব নির্মমভাবে শাস্তি দেন। তাঁর ধারণা, ছেলে দুটি মেয়েটির মত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি নিজে যে পাপ পথে আছেন এ বিষয়ে তাঁর চেতনা নেই। অপর ভাই আমির নিজের জীবন বিপন্ন করে বোনকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে।

নাটিকার এই সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মধ্যে নাট্যকার অনেক বিষয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষের মৌলিক অধিকার আদায় করতে গেলে কি পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করা উচিত রাশেদা সেই বিপ্লবী আদর্শের নিদর্শন। স্বদেশি আন্দোলনের সময় এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ঘটে। তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনার এক বাস্তব আলেখ্য এ নাটকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আত্মগোপণকারী মেয়েকে উদ্দেশ্য করে এরতাজ সাহেব বলেছেন, "পুলিশের তাড়া খেয়ে হয়তো কোন জোলো জংলা ডোবার পাশে বসে শীতে কাঁপছে, মাথায় তেল পড়েনি তিনদিন, হাত খালি, হয়তো দুপুরের খাওয়াই হয়নি, হয়তো এতক্ষণে ধরা পড়ে মার খাচ্ছে।"

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি কটাক্ষপাত লক্ষ্য করা যায় নাটকে। শিক্ষিত বর্ণচোরাদের তিনি ভয় করতেন এই দিক নাটকের সংলাপ থেকে উপলব্ধ হয়। এম্রানের উক্তিতে তার প্রকাশ ঘটেছে এভাবে : "দেখো তোমাদের কিন্তু আমি বড় ভয় করি। মোল্লায় দেশ শুদ্ধো চেঁচামেচি করেও আজকাল আর আমাদের বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। সবাই ওদের আলখাল্লা আলগা করতে পারবে না। ন্যাংটা চেহারাটা দেখে নিয়েছে। কিন্তু তোমাদের এই নতুন আক্রমণ বি.এ. এম.এ শানানো নতুন কলাকৌশল, দেশটাকে ঘায়েল না করে ছাড়বে না।"

১৯৫০ সালের বন্যাজনিত দুর্ভিক্ষ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেছিল। সে সময় ক্ষুধা এবং দারিদ্র্যে মানুষ পীড়িত হয়। তাদের জীবনে ঈদ এসেছিল কিন্তু খুশির বার্তা বয়ে আনতে পারেনি, 'নষ্ট ছেলে'-তে এই চিত্র ধরা পড়েছে। মুনীর চৌধুরীর অন্তর্লোকে ছিল তার ক্রিয়াশীল রূপের প্রবাহ। আপা অর্থাৎ রাশেদার সংলাপে ঈদের খুশির বার্তা না আসার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

আপা : আগামীকাল ঈদ, হাজার হাজার লাখ লাখ লোক কালও রোজা রাখবে, কারণ তাদের ঘরে খাবার নেই। নামাজ পড়তে যেতে পারবে না, কারণ কাপড় নেই। ঘর থেকে বেরুতে পারবে না ক্ষুধায়, লজ্জায়। ... শীতের মধ্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। পেছনে গুণ্ডা পুলিশ। একলা আমার পেছনে নয়। আমার মতো আরও অনেকের পেছনে। ছাপা খানায় গুণ্ডা পুলিশ, রেডিওতে গুণ্ডা পুলিশ আমাদের কথাকে পর্যন্ত গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইছে।"

মুনীর চৌধুরীর একাঙ্কিকাগুলোতে সমকালীন দেশ-কাল সমাজ সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। এম্রান চরিত্রের সংলাপে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করতে দেখা যায়। এখানে ঘটনাবলী চরিত্র এবং চরিত্রানুযায়ী সংলাপ যথাযথভাবে ব্যাবহৃত হয়েছে।

মুনীর চৌধুরী বিচিত্র ধারায় একাঙ্কিকাগুলি রচনা করেছেন। বিভিন্ন ধারার মধ্যে কৌতুকাশ্রয়ী, অন্তরাশ্রয়ী ও অদ্ভুত রসাত্মক নাটিকাগুলি হলো 'ফিটকলাম' ও 'মিলিটারী'।

'মিলিটারী'

মিলিটারী একাঙ্কিকার রচনাকাল ১৯৫০ সাল। নাটিকার প্রকাশকাল জানা যায়নি। এর কাহিনী গড়ে উঠেছে ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে। কারফিউ-এর সুযোগ সংঘটিত বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপ কাহিনীর মাধ্যমে বিধৃত হয়েছে। একদিকে মুসলমান গুণ্ডাদের অগ্নি

Dhaka University Institutional Repository

সংযোগের চেষ্টা, অন্যদিকে হিন্দু তরুণী ও মুসলিম তরুণের হৃদয় বিনিময়ের রোমান্টিক কাহিনী নাটকে অন্তর্ভুক্ত।

এ নাটকে পাত্র-পাত্রী মেয়ে, তরণ, ওস্তাদ, পাগলী ও দু'জন মিলিটারী। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কারফিউ চলাকালীন রাতের আঁধারে এক হিন্দু তরুণ সাংবাদিক প্রেমিক, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুসলি প্রেমিকের বাড়িতে প্রেমিকাকে নিতে আসে। দুই প্রেমিক সত্তাই ভাবাবেগে গভীর, প্রেমের গভীরতা কারফিউয়ের ভয়াবহতাকে এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বের হতেও কুণ্ঠিত হয়নি। রাতের অন্ধকারে সুবিধাবাদী ব্যবসায়ীও নিজের স্বার্থে ব্যয় করে সব কিছু গুছিয়ে নিয়েছে এবং এর পাশাপাশি আছে গুণ্ডাদের অগ্নি সংযোগের কাহিনী। মিলিটারীরা তাদের কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলছে।

'মিলিটারী' একাঙ্কিকায় কাহিনীর গভীরতা নেই। শুধুমাত্র বাস্তবকে পর্যবেক্ষণ প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা হলো দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয়। একটা দেশর আমূল পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র, অপরদিকে সুবিধাবাদীদের কার্যকলাপের চিত্র নাটকে গুরুত্বপ্রাপ্ত। তরুণ-তরুণীর প্রেম কাহিনী অঙ্কিত হওয়া মূল লক্ষ্য নয়। এই কাহিনী লঘু হাস্য পরিহাসের বা সাময়িক আনন্দ দানের একটা উপলক্ষ মাত্র। এখানে আঞ্চলিক ভাষার নাটকীয় সংলাপ লক্ষণীয়। প্রসঙ্গক্রমে গুণ্ডাদের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যায়।

ওস্তাদ : না আজ রাইত বুঝি ব্যাকার যায়। একে ত শালার মিলিটারী বেশি নটঘট শুরু করেছে। হের উপর আবার লাইলী-মজনুর মাতামাতি। একদিক সামলাই তো আরেক দিক ফাল দিয়া উঠে। আইজ কি ধরা পড়মু নাকি?

এখানে ওস্তাদের উক্তিতে চারটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমত, নাটকের নামকরণের সার্থকতা; দ্বিতীয়ত, তরুণ-তরুণীর প্রেম; তৃতীয়ত, সমকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বাস্তব কার্যকলাপ; চতুর্থত, নাট্যকারের আঞ্চলিক এবং তীক্ষ্ম সংলাপ ব্যবহারের দক্ষতা।

ওস্তাদের অন্য একটি সংলাপে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় স্ব-জাতির প্রতি মমত্ববোধ লক্ষ্য করা যায়।

ওস্তাদ : শালারা কওমের খেদমত করবার দিল না। মুসলমান গুণ্ডাদের রাতের আঁধারে অগ্নি সংযোগ করার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টির উপক্রম হলে ওস্তাদ এ উক্তি করে।

Dhaka University Institutional Repository

ফিটকলাম

ফিটকলাম রচিত ও প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। ফিটকলামের কাহিনী গড়ে উঠেছে ১৯৪৮ সালের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অসংগতিকে কেন্দ্র করে। ঘটনায় দেখা যায় যে, একটি রিক্সায় একজন সুট-টাই পরা ভদ্রলোক এবং তার পাশে উপবিষ্ট বোরখা পরিহিতা একজন মহিলা। এই বোরখা পরিহিতাকে পলাতক রাজনৈতিক হিসাবে সন্দেহ করে পুলিশ বাহিনীর লোক। এই সন্দেহ ও কিল-ঘুষি থেকে ঘটনার সূত্রপাত। তার ফলে জনসাধারণের ভিড় জমে যায়, পক্ষে-বিপক্ষে তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে। বোরখা পরিহিতা মহিলা কি না যাচাই করে দেখতে চায় জনগণ কিন্তু এতে সুট-টাই পরা ভদ্রলাকের ওরফে রশীদের আপত্তি থাকে।

এ ব্যাপারে দর্শকদের মধ্যেও দুই একজন ভদ্রলোকের পক্ষ নেয় কিন্তু প্রথমে পক্ষ নিলেও পরে বিপক্ষে চলে যায়। শুধুমাত্র একজন মুসল্লিকে দেখা যায় ভদ্রলোকর পক্ষে থাকতে। তুমুল বাক-বিতণ্ডার মধ্যে বিপক্ষ দলীয় জনগণ ইয়ার্কি, ঠাট্টা করতে থাকে। আর এ ঠাট্টার জোগান দেয় ফক্কড়। মুসল্লি শরিয়াতের নিয়ম-নীতির কথা বলেন। এভাবে জনগণ জটলা করতে থাকার সময় কোলাহলের মধ্য দিয়ে একসময় বোরখা পরিহিতা অবস্থা বেগতিক দেখে পালিয়ে যান। সুট-টাই পরিহিত ভদ্রলোক তার অনুসন্ধানে ছুটে যান এবং কয়েকজন পথিক তার অনুসরণ করে। ইতোমধ্যে একজন মহিলা শিল্পী সেখানে এসে ঘটনা জানতে চান।

জনগণের সন্দেহ বোরখা পরিহিতা মহিলাবেশী পঞ্চম বাহিনীর একজন কি না। তাকে পরখ করে দেখতে হবে এই নিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি হতে থাকে। আসলে বোরখা পরিহিতা ছিলেন সুট-টাই পরা ভদ্রলোকের স্ত্রী জোবেদা। মুসল্লির সংলাপে জানা যায়, পাকিস্তান ইসলামিক স্টেট, এখানে যা, তা করে ঈমান খোয়ানো যাবে না, মুসল্লি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও তা রক্ষা করবেন। জনগণের ধারণা বোরখাধারী রাষ্ট্রের দুশমন, ফিফথ কলামের লোক। ঘটনায় মুসল্লি, চশমাধারী, সুট-টাই পরা ভদ্রলোক এক পক্ষে, এদের বিপক্ষে অন্যান্য জনসাধারণ। বোরখাধারীর স্বরূপ জানার জন্য উপস্থিত জনগণ নানাভাবে ব্যঙ্গ-কৌতুক করতে থাকেন। নাট্যকার ব্যঙ্গ-কৌতুকের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যকলাপ তুলে ধরেন। আগন্তুক মহিলা শিল্পী যখন পুরো ঘটনা জেনে বোরখা পরিহিতার জন্য চিন্তিত তখন অভিনেতা এভাবে ব্যঙ্গ করে ওঠে :

অভিনেতা : আপনি বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ছেন, যে কোনো কারণেই হোক, আপনি মনে মনে দুঃখ পাচ্ছেন ভেবে আমিও দুঃখিত।

Dhaka University Institutional Repository

রসিক, ফক্কড়, পাণ্ডা, লতিফ দোকানী এদের উক্তিতে যথেষ্ট রঙ্গ-ব্যঙ্গের প্রকাশ আছে। যেমন এক পর্যায় দোকানী বলছে :

দোকানী : হাচই তো। কেমন যেন একটু বেশি তাগড়া আর ডাগর ডোগর মালুম হইতাছে।

অন্যত্র লতিফের সংলাপ : কত জোয়ান মর্দ ঠোঁটে রং মেখে, কোমর দুলিয়ে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আমাদের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে গেছে। সে সব খবর রাখেন আপনারা?

ঘটনার শেষ মুহূর্তে অভিনেতা দোকানীর নিকট থেকে সিগারেট নিতে নিতে যখন জানতে চাইলো রিক্সার লোক দুটো প্রকৃতই সি.আই.ডি'-এর লোক ছিল না বদমাশ ছিল, তখন দোকানীর ব্যঙ্গের মধ্য দিয়েই তার মনোভাব প্রকাশিত।

দোকানী : ক্যাম্বায় কমু, বোরখা পড়লেই মরদ যদি আওরৎ হইবার পারে তবে আওরৎ দেখলে গুণ্ডা সি.আই.ডি হইবার পারব না ক্যান? রক্তের গন্ধ পাইলে বাঘ বেচায়েন না? সবই একজাতের সাব।

'ফিটকলাম' নাটকের সর্বত্রই ব্যঙ্গ-কৌতুকে পূর্ণ। সংলাপে আংশিক আঞ্চলিকতা থাকলেও পাকিস্তান সময়ের অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে বিষয়বস্তু প্রকাশিত বলে সংলাপের মধ্যে মাঝে মাঝে উর্দু ও ইংরেজি (যেমন, হোয়াট এ টেনশন, মাইরী, আওরৎ, পাৎলুন, ওয়াখত, মওকা, ফিফত কলাম প্রভৃতি) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ফিফত কলাম বাহিনীর নাম অনুসরণেই নাটকের নামকরণ করা হয়েছে।

'আপনি কে'

'আপনি কে' নাটিকার বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বনভোজন ও গোয়েন্দা পুলিশের কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। এখানে সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন বর্ণনা নেই। কৌতুক আবহের মধ্যে তৎকালীন প্রশাসন কর্মতৎপরতার খণ্ডাংশ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আপনি কে? জিজ্ঞাসার মধ্যে আই.বি. অফিসের একজন কর্তব্যরত কর্মকর্তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় নাটকের শেষ প্রান্তে এসে। এই নাটিকার একটি সংলাপ 'আপনি কে' নাটিকাকে প্রাণদান করেছে। পাত্র-পাত্রী সবারই যখন জিজ্ঞাসা 'আপনি কে'? আপনি কে? আগন্তুক তখন নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করে।

আগন্তুক : সামান্য লোক। আমি কিছু না, সামান্য চাকরি করি। এই আই.বি. অফিসে।

Dhaka University Institutional Repository

নাটকের ঘটনার মধ্যে হাস্যরস প্রকাশই প্রাধান্য পেলেও বিস্ময় প্রকাশও লক্ষণীয়। একজন সরকারি গোয়েন্দা পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বনভোজনের ফেলে আসা খাবার এনে দেওয়ার মধ্যে আকস্মিকতা লক্ষণীয়, কারণ যে কাজ একজন সাধারণ মানুষের মনকে জাগরিত করে না সে কাজ একজন গোয়েন্দা পুলিশকে আলোড়িত করেছে। এতে তৎকালীন সরকারি কর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতনতাকে লক্ষ্য করা যায়। তন্বীর সংলাপে এই দিক লক্ষণীয়।

তন্বী : আপনি মহৎ, আপনি মহান। দেশের ও দশের কল্যাণ, জাতি রাষ্ট্রের স্বার্থ আপনার মতো বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণধী ব্যক্তির হাতে পড়লে দুঃখী ও নিরন্নজন নিশ্চিত হতে পারত।

তরুণের উক্তি–

তরুণ : আপনার পরিচয় পেয়েছি আপনার কর্মে। উপলব্ধি করছি যে আপনি সর্বদর্শী এবং সর্বত্রগামী।

কাহিনীর মধ্যে গভীরতা না থাকলেও দেশকাল সমুপস্থিত।

'পলাশী ব্যারাক'

পলাশী ব্যারাকের প্রকাশকাল ১৯৪৮ সাল। তৎকালে এদেশে নিম্ন মধ্যবিত্ত সরকারি কর্মচারীদের জীবনযাত্রার যন্ত্রণার কথা নাটকে বর্ণিত হয়েছে। পাত্র-পাত্রীরা প্রায় সকলেই সরকারি কর্মচারী। এদের জন্য যে ব্যারাক তৈরি করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এদের জীবনযাত্রার মান খুব নীচু। সরকারি সুযোগ-সুবিধা যেটুকু দেওয়া হয়েছে তা অতি নগণ্য। অতি কষ্টে এদের দিনাতিপাত করতে হয়। পুরো ঘটনা আবর্তিত হয়েছে ব্যঙ্গ কৌতুকের মাধ্যমে।

মুনীর চৌধুরী ছিলেন সূক্ষ্ম ও প্রত্যক্ষদর্শী। মানবজীবনের সূক্ষ্ম দিকগুলো তাঁকে আকৃষ্ট করত। তিনি ছিলেন মানব দরদী লোক। সমাজের আনাচে-কানাচের লোকের জীবনাদর্শ তিনি অবলোকন করতেন। তারই স্পষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যায় পলাশী ব্যারাকের বাসিন্দাদের জীবন চিত্রে। হাবিবের সংলাপে ব্যারাকবাসীর জীবনচিত্র উপলব্ধি করা যায়। এখানে তাঁর সমাজ সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

হাবিব : প্রতিঘর প্রস্থে চৌদ্দ হাত দৈর্ঘ্যে পনের হাত, প্রতি ব্লকে পঁচিশটা ঘর, প্রতি ঘরে দশজন করে মানুষ, সবগুলো ব্যারাক মিলিয়ে এখানে থাকে চার হাজার কর্মচারী। একটা ব্লকের মাত্র একটা করে কল, তাতে পানি থাকবে সকাল সাতটা থেকে দশটা অবধি।

Dhaka University Institutional Repository

সদ্য জন্ম লাভ করা নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটা সার্বিক পরিস্থিতির রূপ এখানে ফুটে উঠেছে। আর এ রূপকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে রঙ্গ-ব্যঙ্গের সাহায্যে।

মফিজ : ... ঘরের পাটাতন নয়তো শালা হারমোনিয়ামের রীড বানিয়ে রেখেছে। দোতলায় বারান্দায় এক ফালি করে তক্তায় করে তক্তায় পা পড়ছে আর ঘরের মধ্যেও অমনি অন্য প্রান্ত তড়াক তড়াক করে লাফিয়ে উঠছে সারি সারি।"

এই সংলাপ একেবারেই ঘরের আটপৌরে ভাষার মত। নাট্যকারের নাট্য কুশলতার এখানেই সার্থকতা। তাছাড়া পটভূমিতে দেশ-কাল উপস্থিত এবং সচেতন মনের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে।

'দণ্ড'

'দণ্ড' নাটিকার রচনাকাল ১৯৬২ সাল। এখানে স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারিক জীবনের খণ্ডিত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মুখ্য ভূমিকা স্বামী-স্ত্রীর নেপথ্য চরিত্র চোখের ক্রিয়াশীল ভূমিকা নাটককে গতিশীল করেছে। এখানে সমাজ বা রাষ্ট্রকে নিয়ে কোন ঘটনা আবর্তিত হয়নি। নিতান্ত ব্যক্তিগত ঘরোয়া ও আটপৌরে জীবনের ছবি নাটকে চিত্রিত। কাহিনীতে চোরের চুরির কাহিনী অপ্রধান। স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে ব্যঙ্গের প্রকাশ লক্ষণীয়। মূলত এখানে হালকা এবং পরিহাসচ্ছলে পারিবারিক কাহিনী বর্ণিত।

'দণ্ডধর'

'দণ্ডধরে'-এর বিষয়বস্তুতে স্থান পেয়েছে বাস্তব জীবন ও জীবনজাত অভিজ্ঞতার কথা। মুনীর চৌধুরীর নাট্যপ্রিয়তার পরিচয় এই নাটিকার মধ্যে প্রতিফলিত। কাহিনীর সূত্রপাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া কিছু নাট্যমোদী ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের নাটকের মহড়ার অনুশীলন নিয়ে। একসময় মনের অজ্ঞাতে জীবন নাট্যের মহড়া শুরু হয়। মানব জীবনের অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ রূপ নাট্যকার একীভূত করেছেন। শুরুতে হালকা বিষয় নিয়ে শুরু করে পরে ক্রমান্বয়ে অভিনয়ের মহড়া ও কলাকৌশল রপ্ত করার ভিতর দিয়ে নাটকের পাত্র পাত্রী আমিন ও রোকেয়ার চরিত্র বাস্তব জীবনের গভীরতায় পৌঁছে যায়।

রোকেয়া চরিত্র জয়ী হয়েছে যেখানে নাটকে অভিনয়ের সময় রূঢ় আচরণ প্রকাশিত হলেও বাস্তবে বাবার সাথে এই শ্রেণীর আচরণ তার কল্পনাতীত। অভিনয়ের সময় বাস্তব পরিবেশে আবেগপ্রবণতার দিক রোকেয়ার অভিনয়ের সময়ও উপলব্ধ হয়।

রোকেয়া : "কোন দিন নয়। কোন দিন নয়। আমার বিয়ে আমি করব। দিন আমি ঠিক করব। মানুষ আমি বেছে নিবো আব্বা! আব্বা!"

Dhaka University Institutional Repository

উপুড় হয়ে টেবিলে মাথা গুঁজে রোকেয়া প্রবল বেগে কাঁদতে থাকে। রোকেয়া বেসামাল হয়ে কাঁদে। আমিন বিব্রত বোধ করে। উইংসের আড়াল থেকে নাটকের কপি হাতে নিয়ে অবাক দৃষ্টি মেলে এগিয়ে আসে প্রম্পটার। একবার ক্রন্দনোচ্ছ্বাস দেখে, আর একবার হাতের পাণ্ডুলিপি উল্টে-পাল্টে হয়রান হয়ে যায়। ইশারায় আমিনকে জিজ্ঞেস করতে চায় : এ কান্নার কথা কোথায় লেখা আছে, কোত্থেকে এলো ইত্যাদি। আমিন ততক্ষণে তার দাড়ি গোঁফ খুলে ফেলেছে। হাতের ইশারায় প্রম্পটারকে মঞ্চের আড়ালে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। রোকেয়াকে স্বাভাবিক করার জন্য আমিন তাকে সান্ত্বনা দেয়।

আমিন : রোকেয়া। রোকেয়া। আমি আমিন বলছি। এত কাঁদছ কেন?

রোকেয়া তখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি।

রোকেয়া : পারব না। পারব না। এসব কথা আমি কখনই বলতে পারব না।

নাটকের অন্যত্রও রোকেয়াকে বলতে শানা যায়–

রোকেয়া : (কাঁদতে কাঁদতে) পারব না। পারব না। যা স্থির করিনি ছল করে সে কথা আমি বাবাকে কিছুতেই বলতে পারব না।

'দণ্ডধর' নাটকে দুটি কাহিনী অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটি শুরু হয় নাটকের মহড়া দিয়ে, কাহিনীর শেষ অংশে দেখা যায় চার বংশদণ্ড জানালা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে অধ্যাপক সাহেবের ঘরের জিনিস চুরি করে। পরবর্তী অংশে দেখা যায়, সেলিমের মায়ের হার চুরি করার ঘটনা। এই চোরকে সনাক্ত করা, থানায় ডাইরী করা। হারটির ওজন কত ছিল তা নিয়ে নাটকের পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগের শেষ নেই। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে। এক পর্যায়ে প্রম্পটারকে বলতে শোনা যায়–

প্রম্পটার : শেষ পর্যন্ত নাটকটা কেমন হবে মনে করছেন স্যার?

অধ্যাপক : শেষ পর্যন্ত না দেখে কিছুই বলা যাচ্ছে না। এখানেই নাটকের যবনিকাপাত ঘটেছে।

মুনীর চৌধুরী ছিলেন সূক্ষ্মদর্শী একজন সমাজমনস্ক নাট্যকার। সংলাপের ক্ষেত্রে হৃদয়স্পর্শী ভাষা ব্যবহার তাঁর সহজাত ধর্ম। সহজ সাধুভাষার সাথে কোথাও কোথাও আঞ্চলিক ভাষা মিশ্রণে সংলাপও ব্যবহৃত হয়েছে। একটি অঙ্কে সমাপ্ত হলেও আঙ্কিক পরিবর্তন পাঠককে আকৃষ্ট করে।

Dhaka University Institutional Repository

'দণ্ডকারণ্য'

রচনা ১৯৬৫ সাল, প্রকাশকাল ১৯৬৬। সমালোচকদের মতে দণ্ডকারণ্য রচনার প্রেরণা মুনীর চৌধুরী পেয়েছিলেন মধুসূদন দত্তের নাটক থেকে। কাহিনী রামায়ণ থেকে গৃহিত হলেও উপস্থাপিত বর্তমানের পটভূমিকায়। ভূমিকায় নাট্যকার নিজেই উল্লেখ করেছেন :
"যদিও 'কবর' ও 'দণ্ডকারণ্য' আমার নাটকীয় প্রয়াসের দুই বিপরীত প্রকৃতির প্রয়াস। উভয়ের মধ্যে আমার স্বভাব ও দৃষ্টির ঐক্যও বিদ্যমান। তবে 'কবর' ক্ষোভপূর্ণ, অভিযোগাশ্রয়ী এবং রক্তাক্ত। 'দণ্ডকারণ্য' কৌতুকাবহ, অন্তরাশ্রয়ী এবং অদ্ভুত রসাত্মক।"

নাটক সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "মূল্যায়নের প্রয়োজনে উভয় গ্রন্থ একত্রে গ্রহণ করলেই আমার প্রতি সদ্বিচার করা হবে।

নাটক মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে নাট্যকারের অভিমতের বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করা যায়, কারণ 'কবর' ও 'দণ্ডকারণ্য' অন্যান্য নাটক থেকে ভিন্ন হলেও এ দুটোর মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। নাটক দুটো সম্পূর্ণ দুই ধারার এবং দুটোর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। প্রথম নাটক ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক। মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম, প্রতিরোধ ও প্রাণদান প্রাধান্য পেয়েছে। যেখানে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি জাতি, দেশ, রাষ্ট্র আলোড়িত ও একটি ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। একটি ইতিহাস, অপরটি পুরাণ। রামায়ণের খণ্ডিত কাহিনী সাময়িকভাবে উপস্থাপিত হয়ে কিছুটা কৌতুক ও আকস্মিকতা সৃষ্টি হয়েছে।

এককভাবে বিচার করলে দণ্ডকারণ্যের বিশিষ্টতা লক্ষণীয়, কারণ মুনীর চৌধুরীর বেশিরভাগ নাটক-নাটিকাতে ব্যক্তি, জীবন, সমাজচিত্র, রাজনৈতিক ও সমকালীন বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষণীয়। এক্ষেত্রেও 'দণ্ডকারণ্য' স্বতন্ত্র। হিন্দুপুরাণের পটভূমিকায় রচিত এটাই তাঁর একমাত্র নাটক।
'দণ্ডকারণ্য' নাটকের প্রথম কাহিনী শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর প্রেমঘটিত ব্যাপার নিয়ে। মাঝের অংশ গড়ে উঠেছে পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে। নাটকের শেষের অংশে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর প্রেমচিত্র অন্তর্ভুক্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর প্রেম কাহিনী ও রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ঘটনার মধ্যে যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী লাইলী হাউজ টিউটর মনোয়ারকে ভালবাসে, ছাত্র কায়সর লাইলীকে ভালবাসে। পি.এইচ-ডি. ডিগ্রীধারী ছাত্রী ওয়াফাও মনোয়ারকে মনের অজান্তে ভালবেসে ফেলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব ঘটনা স্থান পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর প্রেমে। পুরাণের কাহিনীতে আছে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সাধু, শূর্পনখা ইত্যাদি। রামায়ণের চরিত্র মানুষ হলেও দেবতুল্য। অধিক ক্ষমতার অধিকারী। রামায়ণে রাম-সীতার বনবাস যাপন, রামের শিকারে যাওয়া, লক্ষণ কর্তৃক সীতাকে পাহারা দেওয়া, শূর্পনখা রামাসক্ত হওয়ায় লক্ষণ কর্তৃক তার নাসিকা কর্তন, রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণ, যুদ্ধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি বিষয় রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে, নাটকে যে কাহিনী পাওয়া যায় তা আকারে ক্ষীণ। নাটকে পুরাণের যে কাহিনী গৃহিত তা হলো রামের প্রতি শূর্পনখার অনুরাগ। অনুরাগ প্রকাশ পাওয়ার পর সীতা ও লক্ষ্মণ পরামর্শ করে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাসিকা কর্তন করে। নাটকে উল্লেখিত সাধুর ভূমিকাতে পুরাণের বৈশিষ্ট্য বজায় রয়েছে।

দুটো ঘটনার মিল ও অমিল এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই রাগ-অনুরাগ, প্রেম-ভালবাসা স্থান পেয়েছে। নাটকের ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত, পুরাণের ঘটনা আকারে বড়। তবে নাটকের বৈশিষ্ট্য এই যে, বাস্তব কাহিনীর সাথে পুরাণ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এখানে পুরাণকে আলাদা করে দেখা হয়নি।

ভাষা ব্যবহারে প্রথম দিকে সীতা ও লক্ষ্মণের নাটকীয় সংলাপ ব্যবহৃত কিন্তু যখন রাম বনবাস যাপন করছিলেন সে সময় রাম, সাধু লক্ষ্মণ, শূর্পনখার সংলাপ সাধু ভাষায় বর্ণিত না হলেও আংশিক সাধু ভাষা ব্যবহৃত। বলা যায় সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণে অপূর্ব মাধুর্য সৃষ্টি হয়েছে।

সাধু : স্বাগতম, সুস্বাগতম! দণ্ডকারণ্যে স্বাগতম! রাজপুত্র দীর্ঘজীবী হও।

রাম : প্রভুর অপার করুণা।

অন্যত্র রাম : সীতা! আজ কী অপরূপই না তোমাকে দেখাচ্ছে। ফুল সাজে বনদেবী বলে ভ্রম হয়।

সীতা : এ সবই লক্ষ্মণের কীর্তি। আমি যত বলি যে, নির্বাসিতার রূপ সজ্জার কি আবশ্যক, লক্ষ্মণ কিছুতেই নিষেধ মানবে না। আমি যে ফুলকেই বলব সুন্দর, তা আহরণ করা যত দুঃসাধ্যই হোক না কেন, জীবন বিপন্ন করে হলেও সে তা সংগ্রহ করে আনবেই।

(পৃ. ২৪৯)

লক্ষণ : সন্ধ্যা সমাগত। অরণ্য অন্ধকার হয়ে আসছে। মশাল জালাবার আয়োজন করব কি?

(পৃ. ২৫০)

Dhaka University Institutional Repository

লাইলী, কায়সর, মনোয়ার, ওয়াকার এদের সংলাপ কথ্যরীতিতে রচিত।

কায়সর : আমি মনোয়ার নই। তুমি ভেবেছিলে মনোয়ার।

লাইলী : তুমি কায়সর! তুমি কায়সর।! কাছে এসো না।

(পৃ. ২৪২)

মনোয়ার : আপনি রূপে কম নন, গুণে আরও বড়।

ওয়াফা : আজকে মনে হচ্ছে ডিগ্রির কাগজটা হাতের মুঠায় পেলে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে দিতাম। এক দুই তিন চার বছর ধরে কেবল পড়েছি, পড়েছি, পড়েছি। পড়েছি আর লিখেছি। ইটের নীচে চাপা পড়ে থাকা ঘাসের মতো বিবর্ণ হয়ে গেছি। আলোহীন প্রাণহীন রক্তহীন জীবন। এ আমি চাই না।

এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, পুরাণের পাত্র-পাত্রী আর বাস্তবের পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

একই নাটকে দুটো ভিন্নধর্মী কাহিনী রূপায়ণে পরিবেশানুযায়ী সংলাপ ব্যবহারে ভাষার সরলতা ও রসময়তা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে।

কাহিনীতে রামকে বনবাসে দেখানো, সাধু কর্তৃক রামকে সান্ত্বনা দেওয়া, গভীর অরণ্যে বৃক্ষের নিচে বেদীমূলে মখ্‌মলের বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমানোর পরিবেশ কৌতুকাবহের সৃষ্টি করেছে।

নাটকে শূর্পনখা নাট্যকারের নতুন সৃষ্টি। সাধুর বর্ণনায় শূর্পনখার পরিচয় জানা যায়।

সাধু : বিভীষণ এদের বিধবা ভগিনী। পরিপূর্ণ যৌবন। যেমন লজ্জাহীন তেমনি রমণীয়। আমার সাধনার শত্রু। আমি ধ্যানস্থ হয়েছি জানতে পারলেই পাপীয়সীর কৌতুক প্রকৃতি লক লক করে জেগে উঠে।

(পৃ. ২৪৭)

রামায়ণের রাম শূর্পনখাকে বাণে বিদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত। নাটকের রাম বাণে বিদ্ধ না করে তার গন্ধ কুক্কুটে উদর পরিপূর্ণ করে, আহারিকা ফলের রসের মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।
রামের উন্নত নাসিকা দেখে শূর্পনখা গৌরববোধ করে। নিজের নাসিকা কর্তনে ক্ষোভ বা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে দেখা যা না, বরং রাম নিদ্রা গেলে সারারাত্রি জেগে মশা নিবারণ

Dhaka University Institutional Repository

করবে বলে আশ্বস্ত করে। পুরাণ আর বাস্তবের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার পুরাণকে একেবারে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বারা প্রভাবিত বলে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রায় সমশ্রেণীর কাজ করেছিলেন তবে তার কলেবর ছিল বড় আকারের। তিনিও পুরাণের কাহিনীকে পরিবর্তিত রূপ দিয়ে মহাকাব্য রচনা করেছেন।

পুরাণের দেব-দেবী মাইকেলের হাতে হয়ে উঠেছে বাস্তবের মানুষ। ধর্ম কথা ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বাস্তবানুগ হয়ে উঠেছে। ঠিক তেমনি নাট্যকার মুনীর চৌধুরী পুরাণের রামকে নিয়ে এসেছেন পরিবৃত্তে। শূর্পনখা রামের প্রেমাকাঙ্ক্ষী। রাম সীতাকে নাসিকা কর্তন ব্যতীত অন্যতর শাস্তির আর্জি জানায়। অতি যত্নে শূর্পনখাকে তার আলয়ে এগিয়ে দিয়ে আসার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ করেন। এই চিত্ররীতি মাটির পৃথিবীর মানুষের রীতি-নীতির পরিচয় বহনকারী।

'দণ্ডকারণ্য' নাটক মুনীর চৌধুরীর একটি অভিনব সৃষ্টি। পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা কম হলেও ঘটনার পূর্ণ পরিণতি রয়েছে। সাধু-চলিত রীতির সংলাপ তীক্ষ্ণ ও অর্থবহ। 'দণ্ডকারণ্যের' বিষয়বস্তু রামায়ণ থেকে গৃহিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রামায়ণের কাহিনী নাটকে উপস্থাপন করছে। এখানে নাট্যকারের নিরীক্ষাবাদী মানসিকতা লক্ষণীয়। বলা যায়, পুরাণের ঘটনাকে আধুনিক করে সৃষ্টি করে আধুনিক মানুষের জীবনোপযোগী করে তোলাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য।

লাইলীর রূপে কায়সর আকৃষ্ট হয়ে রাতের অন্ধকারে ছাত্রীবাসের কামরায় প্রবেশ করে কিন্তু লাইলী মনোয়ারের প্রতি আকৃষ্ট।

সমালোচক মুহাম্মদ মজির উদ্দিন বলেছেন, আমাদের নাট্যসাহিত্যে এ ধরনের নিরীক্ষা এই প্রথম। এখানে চরিত্র-চিত্রণে, পরিবেশ পরিকল্পনায় ও মনোবীক্ষণে যথেষ্ট আধুনিকতা প্রাগ্রসর চেতনার বিকাশ ঘটেছে।"

(পৃ. ৪৮৭)

'একতলা দোতলা'

'একতলা দোতলা' নাটকের বিষয়বস্তু মুনীর চৌধুরীর অন্যান্য নাটক থেকে স্বতন্ত্র। এখানে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রকাশিত। এই নাটকে দুটো বিষয় স্থানপ্রাপ্ত : প্রথমে

Dhaka University Institutional Repository

ডাক্তার বশীরের সাথে আয়েষার গবেষণামূলক কাজের জন্য সাক্ষাৎকার। যেমন- বশিরের উক্তি–

বশির : আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি মেয়ে মেয়েই। ওর জাত-বেজাত নেই, ভাষা-অভাষা নেই। বাঙালি হোক, পাঞ্জাবি হোক, লেখাপড়া জানুক আর না জানুক নীচতলার সব সমান।

বশিরের সাথে আয়েষার সাক্ষাৎকারের সময় অন্যের দৃষ্টিতে পড়ার শঙ্কা আয়েষার মনে ভীতির উদ্রেক করেছে। তার কারণ, এই নাটিকা লেখার সময় নারীদের অবাধ স্বাধীনতা ও পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার গণ্ডী ছিল সঙ্কীর্ণ।

নাটিকার দ্বিতীয়াংশ হাস্যরসে পরিপূর্ণ। দুটো পরিবার কিছুক্ষণের জন্য প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল বললে ভুল হবে না, কারণ একই দালানে একতলা দোতলার মানুষের বসবাসের যেমন নিয়ম আছে এখানে তার কোনটিই রক্ষা করা হয়নি। উভয় পক্ষেরই অমানবিক কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়। 'একতলা দোতলা'-এর চরিত্র সংখ্যা পাঁচ। একজন গৃহকর্তা হিসেবে দুলাভাইয়ের চরিত্র একেবারেই দ্বন্দ্বহীন। আয়েষা একজন গবেষক হয়েও সমাজের কাছে তাকে হার মানতে হয়েছে। আপার ভূমিকা কিছুটা সক্রিয়। আর বশির শুধু একজন ডাক্তারই নয়, একাধারে সে ডাক্তার এবং ইলেকট্রনিক্সের যন্ত্রপাতি মেরামতকারী, একজন লেখক এবং শাক সবজীর বাগান পরিচর্যাকারী। এই নাটকে এই একটি মাত্র চরিত্র যে বহুমূখী প্রতিভায় নিজ চরিত্রকে সম্পূর্ণ বিকাশ করতে পেরেছে।

নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বাস্তববোধ সম্পর্কে নাট্যকারের গভীর চেতনা। আপন মনের রং তুলিতে নাট্যকার কৌতুকাবহের মধ্য দিয়ে তারই কিছুটা প্রকাশ করেছেন। এখানে পারিবারিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতা বর্ণিত।

'মর্মান্তিক'

মুনির চৌধুরীর অন্যান্য নাটিকার মধ্যে 'মর্মান্তিক'-এর বৈশিষ্ট্যও খানিকটা ভিন্নতর। এটা একান্ত ই হাস্যরসাত্মক নাটিকা। এখানে কৌতুক সৃষ্টির সার্থকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নাট্যকার নিজেই এ নাটিকাকে একটি গীতিরঙ্গ নাট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এখানে তিনি পাশ্চাত্যের

Dhaka University Institutional Repository

মিউজিক্যাল কমেডির রচনারীতি দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশের হাস্য-রসাত্মক নাটকের জগতে এটা এক অনন্য সৃষ্টি। মর্মান্তিক নাটিকার সংলাপ কবিতায় ছন্দোবদ্ধ ও নৃত্যের তালে পরিবেশিত।

'বংশধর'

'বংশধর' নাটকের বিষয়বস্তু নিতান্তই হাস্যরস প্রধান। কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি বানরকে নিয়ে। ঘটনাটি এক পর্যায়ে থানা-পুলিশ পর্যন্ত পৌছে যায়। কাহিনীর যেখানে ইতি টানা হয়েছে ঠিক তখনই আর একটি উপকাহিনীর সূত্রপাত। এখানে নাট্যকার অতি কৌশলে একটি বিষয়বস্তুতে দুটো ঘটনার অবতারণা করেছেন।

জনৈক ব্যবসায়ীর গদি থেকে তিন হাজার টাকার পুঁটলি নিয়ে কথিত বানরটি পালিয়ে যায়। টাকা নিয়ে পালানো থেকে শুরু করে শেষ অবধি বানরকে খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত পাঠক চিত্তকে নাট্যকার ধরে রেখেছেন অতি কৌশলে। টাকা হারানোর অন্তরালে আশরাফ ও আমেনার হৃদয় বিনিময়ের রোমান্টিক কাহিনী স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। এখানে উদ্ধৃত কয়েকটি বিশেষ সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটকের কাহিনী অনুধাবন করা যায়। আশরাফের সংলাপে টাকা হারানো সম্পর্কে জানা যায়–

আশরাফ : দু'তিন ঘণ্টা আগে, ঘটনাটা ঘটে। এক ব্যবসায়ীর গদি থেকে একটা বাঁদর, এক তাড়া নোটের একটা বড় মোটা বাণ্ডিল তুলে নিয়ে পালিয়েছে।

(পৃ. ৩৮২, ১ম খণ্ড মুনীর চৌধুরী রচনাবলী)

এরপর বানরকে খুঁজে বের করার জন্য পুলিশের ও দমকল বাহিনীর সহায়তা নেয়া হয়।

দমকল : মই লাগিয়ে ছাদের ওপরে চড়েছিলাম তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছি।

অন্যত্র–

দমকল : কার্নিশ থেকে লাফিয়ে ঘরে ঢুকল মনে হয়। হয়তো কোথাও লুকিয়ে রয়েছে।

পুলিশ : আপনাদের সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। দরজা-জানালা বন্ধ করে বসুন। আমরাও আর দেরি করব না। শেষে বেশি ভিড় জমে যাবে। কাজ শেষ হলে আমিও ওদের সঙ্গে মই দিয়ে নেমে যাব। দর্শকদের জন্য বেশ ড্রামাটিক হবে। চাই কি আশরাফ বলে দিলে কাগজে ছবি পর্যন্ত বেরিয়ে যেতে পারে, থ্যাংকস, গুড বাই।

(১ম খণ্ড পৃ. ৩৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে দমকল, পুলিশ, আশরাফ এবং আমেনাদের পরিবার মিলে টাকাসহ বানরকে ধরে ফেলে। হাস্যরস ও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা এখানে প্রাধান্য প্রাপ্ত। আশরাফ ও আমেনা ছেলেবেলা থেকে পাড়ায় বসবাস করে এবং একে অপরকে পেতে চায়। আমেনা যে সময়ের ও যে সমাজের মেয়ে তখন ছেলে-মেয়ের প্রেম-প্রীতিকে মুরব্বিরা সহজে মেনে নিতেন না। নাটিকায় আশরাফের সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। সে এক সময় আমেনার বাবা-মা'র কাছে তাদের বিয়ের প্রস্তাব রাখে।

আশরাফ : ও না শুনতে চায় না শুনুক। আপনি আর খালুজান শুনলেও চলবে। বিশেষ করে আপনাদেরকে বলব বলেই আজ ঠিক করে এসেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি রোজই প্রায় ঠিক করে আসি যে আজই বলব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠি না। আমার কৈশোর থেকে অতি চেনা এই পরিবেশ আপনাকে, খালুজানকে একটা প্রস্তাবের কথায় টেনে নিয়ে আসার সাহসই হোল না। কেমন যেন নাটুকে এবং অস্বাভাবিক মনে হতো। কিন্তু আজকের এই সম্পূর্ণ এক অবাস্তব পরিবেশের মধ্যে পড়ে আমার প্রত্যহের সংকট কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভেঙ্গেচুরে গেছে। মনে হচ্ছে, বললে এখনই বলা সংগত।

(১ম খণ্ড পৃ. ৩৮৯)

নাটকের বিষয়বস্তু বাস্তবানুগ। একটি পরিচিত ও সাধারণ ঘটনা ব্যক্তি ও পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নাটিকায় দ্বন্দ্ব বা জটিলতা না থাকলেও হাস্যরসের মধ্য দিয়েই নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। নাটিকার সংলাপ ব্যবহারে তীর্যক হাস্যরস প্রস্ফুটনের দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুই-একটা ইংরেজি শব্দ পুলিশ চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

নাটক রচনার ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরী ছিলেন সচেতন। অতি সাধারণ বিষয়বস্তুর মাধ্যমে তীর্যক কাহিনী, চটুল রসিকতা, তীক্ষ্ণ সংলাপ ব্যবহারের মাধ্যমে অসাধারণ ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রত্যেকটি নাটকেই এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মৌলিক একাঙ্কিকায় সমসাময়িক কালের ছাপ স্পষ্ট। বিশেষ সামাজিক বিন্যাস, রাজনৈতিক অসন্তোষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিকগুলো নিখুঁতভাবে সংলাপের মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মুনীর চৌধুরীর বিভিন্ন একাঙ্কিকার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

মুনীর চৌধুরীর বিভিন্ন একাঙ্কিকার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। এগুলোর বিষয়বস্তু রচিত হয়েছে সমকালীন প্রেক্ষাপটের ওপর। যেমন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন, সমাজ সমালোচনা, বাস্তব ও ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা, সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয়ক, শিশু বিষয়ক এবং পুরাণ ও বাস্তবের সংমিশ্রণ ইত্যাদি। এগুলো চল্লিশ দশক থেকে শুরু করে ষাটের দশকের আবহাওয়ায় পরিব্যাপ্ত।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ভিত্তিক একাঙ্কিকাগুলো, যেমন 'একটি মশা', 'মানুষ', 'পলাশী ব্যারাক', 'ফিট কলাম' প্রভৃতি একাঙ্কিকাগুলোর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। এগুলো চল্লিশ দশকের রচনা। এ সময়ের সামাজিক রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক প্রভৃতি প্রেক্ষাপট একাঙ্কিকাগুলোর বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। 'একটি মশা', 'মানুষ', 'পলাশী ব্যারাক'-এ তৎকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিফলন এবং সমকালীন প্রেক্ষাপট উপস্থিত। 'একটি মশা'য় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ এবং ব্যঙ্গ লক্ষণীয়। 'মানুষের' মধ্যেও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ থাকলেও মানবতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, এই দিক নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন।

'পলাশী ব্যারাক'-এ দেখা যায় যে, একটি দেশের প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে সেনাবাহিনী একটি। কিন্তু ব্যারাকে সৈনিকের দৈনন্দিন জীবন যাপন প্রণালী খুবই দুর্বিসহ। প্রায়ই দুই চারটা সিঁড়ি, পার্টিশন, দরজা ভেঙ্গে পড়ে। পর্যাপ্ত পানি না থাকা, সৈনিকদের তুলনায় শয়নকক্ষ অপ্রতুল প্রভৃতি। সমকালীন প্রেক্ষাপট থেকে এসব দিক অনুসন্ধানের পর এই ভেদাভেদকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। 'ফিটকলাম'-এর মধ্যে সরাসরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না এলেও সাম্প্রদায়িকতা এসেছে, এসেছে দেশপ্রেম। রিক্সায় উপবিষ্ট বোরখা পরিহিতা ভদ্রমহিলা আসলে মহিলা কি না সেটা জানার জন্য জনগণ কৌতূহলী হয়ে পড়ে। সমাজে ও রাষ্ট্রের মধ্যে যারা অসংগতি সৃষ্টি করছিল তাদের খুঁজে বের করার জন্য সি.আই.ডি. পুলিশ কখনো কখনো ছদ্মবেশ ধারণ করত। সে কারণে ভদ্রলোকের পাশে উপবিষ্ট মহিলা মহিলা কি না সেটাই ছিল কৌতূহলের বিষয়। সে সময় মুসলমান মহিলারা পর্দা ব্যতীত বাইরে বের হতেন না। এই নাটিকাগুলি চল্লিশ দশকের রচনা।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিভিত্তিক একাঙ্কিকা

রাজনীতিভিত্তিক একাঙ্কিকাগুলোর মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। 'নষ্ট ছেলে', 'মিলিটারী', 'নেতা', 'কবর' প্রভৃতি একাঙ্কিকাগুলো রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে রচিত বলা যায়। পঞ্চাশ দশকের রাজনৈতিক আন্দোলন, কারফিউ, মুসলিমলীগ সম্মেলন, ভাষা আন্দোলন প্রভৃতি বিষয় একাঙ্কিকাগুলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'নষ্ট ছেলে'তে রাজনীতি এসেছে প্রত্যক্ষভাবে। বাবা-মার অমতেই কন্যা সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করে। সমাজে যখন মেয়েদের পড়ালেখা হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগোচ্ছিল সে সময় একটা মেয়ের রাজনীতি করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। পরিবারের প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে সে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছে। বোনের সাথে সাথে ছোট ভাইটিও হাতে হাত মিলিয়েছে। এই ঘটনা নাট্যকারের ভগিনীর বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে জড়িত হওয়ার দিক স্মরণ করিয়ে দেয়।

সামাজিক দাঙ্গা, অসংগতি এবং কারফিউ এসেছে প্রত্যক্ষভাবে। কারফিউ চলাকালীন সময়ে আইনবিরোধী যেসব কার্যকলাপ চলছিল তার ইঙ্গিত দিয়েছেন নাট্যকার। 'নেতা' একাঙ্কিকাটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ স্বীয় আসন ঠিক রাখার জন্য তৎপর। 'কবর' একাঙ্কিকাও রাজনৈতিক। মাতৃভাষার জন্য দেশে অসংগতি, দেশবাসী বিক্ষুব্ধ। ছাত্রসমাজের বিশেষ অবদান ও তাদের সরকারবিরোধী আন্দোলন স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত। তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বাঙালির মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমস্ত বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে অসীম সাহসের সাথে লড়াই করেছে এদেশের ছাত্র-জনতা। নাট্যকার রাষ্ট্রের বিভিন্ন অসংগতি ও অসামঞ্জস্যের দিক প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তা নাটকে উপস্থাপন করেছেন।

সমাজ সমালোচনামূলক একাঙ্কিকা

এই জাতীয় একাঙ্কিকাগুলো হলো 'গতাকাল ঈদ ছিল', 'ঢাক', 'বেশরিয়তি', 'একাঙ্কিকা', 'সংঘাত' ইত্যাদি। এগুলো চল্লিশ দশকের রচনা। এখানে রাজনীতির পরিবর্তে সামাজিক প্রেক্ষাপট লক্ষ্য করা যায়। 'গতকাল ঈদ ছিল'তে ধনীর সাজ-পোষাকের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। ঈদের দিন হাজার হাজার গরীবরা অভুক্ত থাকে। অপরদিকে ধনীর ছেলে-মেয়েরা সাজসজ্জার ব্যবহার বাড়ানো যায় কি করে সেদিকে ব্যস্ত থাকে। তাছাড়াও তরুণ-তরুণীদের জীবনযাত্রার নতুন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ঢাক নাটকেও সমকালীন সমাজ ও পারিবারিক ঐতিহ্যকে বড় করে দেখানো হয়েছে। জমিদারী প্রথার নির্মমতা লক্ষ্য করার মতো। মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

চামড়ায় ঢাক তৈরি সেই নির্মমতারই প্রমাণ বহন করে। 'বেশরিয়তি'তে নতুন পুরাতনের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। পারিবারিক শরাশরিয়তের বেদীমূলে নতুন প্রজন্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এখানে পুরানো প্রথা ভেঙ্গে ফেলার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

একাঙ্কিকায় পারিবারিক তুচ্ছ ঘটনার ভিতর দিয়ে কিছুটা রঙ্গ-ব্যঙ্গের অবতারণা এবং পরিসমাপ্তিতে কিছুটা নতুন চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। সংঘাতের মাধ্যমে ব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক কবিতার বিষয়বস্তুকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে আঘাত করা হয়েছে।

বাস্তব ও ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একাঙ্কিকা

'একতলা দোতলা', 'দণ্ডধর', 'বংশধর', 'দণ্ড' এই একাঙ্কিকাগুলোতে বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। একই সমাজে বসবাসকারীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির প্রচণ্ড অভাব লক্ষণীয়। এগুলো ষাটের দশকের রচনা। এখানে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

'একতলা দোতলা'-তে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির অভাব। একে অপরকে বুঝবার জানবার ও সহমর্মিতার অভাব। 'দণ্ডধরে' বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নাটকের অভিনয়ের ভিতর দিয়ে বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রণসহ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে। 'বংশধর' একাঙ্কিকায় বাস্তব ও প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো উপস্থাপিত। 'দণ্ড'তে রাতের আঁধারে সংঘটিত চৌর্যবৃত্তির উপর কটাক্ষ ও বিদ্রূপাত্মক মনোভাব প্রকাশিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অবলম্বনে রচিত একাঙ্কিকা

এই ধারায় পড়ে 'আপনি কে' ও 'গুপ্তা' এই দুটো একাঙ্কিকা-কে একই পংক্তিতে বসানো যায়। উভয়ের বিষয়বস্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের নৈতিক চরিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

মুনীর চৌধুরী অনুদিত পূর্ণাঙ্গ নাটক

অনুবাদের মাধ্যমে এক ভাষার সাহিত্য অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়। সাধারণত সমৃদ্ধতর শিল্পের ভাষান্তরীকরণ হয়ে থাকে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রাচীন যুগ থেকেই সাহিত্যে এই রীতি অনুসৃত হয়ে এসেছে। গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্যেও এই অনুবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইংরেজি সাহিত্যের অনেক শাখা পরিপুষ্ট হয়েছে গ্রিক ও ল্যাটিন সাহিত্য থেকে অনুবাদের ফলে।

সাহিত্যের মাধ্যমে দেশকালের দূরত্বের বাধা অপসারণ করার ব্যাপারে অনুবাদ সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। অনুবাদই একটি দেশের সাহিত্যকে অন্য একটি দেশের সাহিত্যে টেনে এনে নতুন রস সঞ্চার করে। ভাষা পরিবর্তনশীল, তাই প্রত্যেক যুগেই ভাষার এক একটি বিশেষ ভঙ্গি থাকে। যার ফলে কোনো যুগের সাহিত্যে তার মূল ভাব না হারিয়ে অনুবাদের মাধ্যমে যুগোপযোগী ভাষায় বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর তার জন্য প্রয়োজন বিশিষ্ট অনুবাদকের। যার অনুবাদকের ক্ষমতায় একটা যুগের কিংবা একটা দেশের সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে এমনভাবে ফুটে ওঠে, যাতে মূল গ্রন্থের রস আস্বাদনে পাঠকের কোন অসুবিধা না হয়।

অনুবাদ তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন, মৌলিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ ও আক্ষরিক অনুবাদ।

আধুনিক যুগে তিন শ্রেণীর অনুবাদই হয়ে থাকে। প্রাচীন যুগে ভাবানুবাদ হতো। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মূলকে অনুসরণ করেও গ্রন্থ লেখা হতো। আক্ষরিক অনুবাদে অনুবাদের সবগুলো দাবি পূরণ করা সাধনা সাপেক্ষ। কাজেই এরূপ অনুবাদ পরিমাণে খুবই কম, কারণ এক একটি ভাষার এক একটি বাক্যাংশের বা বাক্যের আলাদা প্রসঙ্গ থাকে। একটা বিশেষ শব্দ দিয়ে মূল ভাষার যে প্রসঙ্গের ইঙ্গিত দেওয়া হয়, অন্য কোনও ভাষায় সেই শব্দের প্রতিশব্দ খুঁজে বের করে কিংবা সম্ভব হলে সৃষ্টি করে মূল ভাবকে অক্ষুণ্ন রেখে অনুবাদকে রূপ-রস দান করা যেমন দায়িত্ব পালন করা সবার পক্ষে সম্ভব নয় বলেই কোন কোন অনুবাদক মূলভাবকে যথাসম্ভব ঠিক রেখে নিজের মনের চিন্তাধারা ও কল্পনার রসে সঞ্জীবিত করার প্রয়াস পান।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আর একটা দুরূহ ব্যাপার হলো, মূল লেখক যে পরিবেশে বিষয় চিন্তা করেন, অনুবাদক ঠিক সেই পরিবেশে উদ্ভূত চিন্তাধারাটি ধরতে পেরেছেন কি না তা বিচার করে দেখা।

Dhaka University Institutional Repository

নিজের চিন্তাভাবনাকে স্বভাষায় রূপদান করা যতটা সহজ, অন্যের বিষয় ও ভিন্ন দেশীয় একটি ভাষার চিন্তাধারা ও ভাবকে অপর ভাষায় রূপদান করা তত সহজ নয়। এ সমস্ত কারণে অনুবাদককে মূল ভাষা ও অনুবাদের ভাষায় সমান পারদর্শী হতে হয়। মূল রচনাটি অনুবাদকের বোধগম্য হওয়া ছাড়াও অনুবাদ করার সময় মূল রচনার ধ্বনি গাম্ভীর্য ধরা পড়েছে কি না তাও দেখা প্রয়োজন।

অন্য যে শ্রেণীর অনুবাদে শুধুমাত্র মূল ভাবকেই অনুবাদ করা হয়, সেখানে মূল ভাষা ও অন্যান্য কলাকৌশলের প্রতি ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই শ্রেণীর অনুবাদে যে কাব্য কলার স্ফূরণ তা অনুবাদকের নিজস্ব সৃষ্টি বলেই ধরা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নাটক

'মুখরা রমণী বশীকরণ'

ভূমিকা

মুনীর চৌধুরী অল্প বয়স থেকে নাট্যচর্চা শুরু করেন। সে সময়ই তাঁর নাটক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। নাটক অনুবাদে, ভাষাতত্ত্ব চর্চায়, সাহিত্য সমালোচনায়, ছোট গল্প ও প্রবন্ধ রচনায় তিনি একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। জীবনের নানাবিধ অসংগতি এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তীব্র রঙ্গব্যঙ্গের প্রবণতাই ছিল মুনীর চৌধুরীর সাহিত্য চর্চার আদি পর্বের মূল বৈশিষ্ট্য। রঙ্গ-ব্যঙ্গের এই ধারা প্রবাহিত হয়েছিল নানা মাধ্যমে। কখনো ছোট গল্পে, কখনো একাঙ্কিকায়। একাঙ্কিকাগুলো প্রায়ই মৌলিক, স্বল্পসংখ্যক অনুবাদ আশ্রিত। তিনি পূর্ণাঙ্গ নাটকও অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরীর দুইজন প্রিয় নাট্যকার ছিলেন বানার্ড শ' ও ইউজীন ও নীল। শেক্সপীয়রের প্রতি মুনীর চৌধুরীর আকর্ষণ ছিল গভীর। তিনি শেক্সপীয়রের 'The Taming of the Shrew' নাটকের অভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশে ফিরে অনুবাদে হাত দেন। অনুবাদ করার সময় ভূমিকায় তিনি অনুবাদ নীতির ব্যাখ্যা করেছেন। অনুবাদের সময় তিনি কয়েকটি নীতি অনুসরণ করেন। প্রথমটি ছিল মূলানুগত্য। তিনি দাবি করেন যে, সাধ্যমত সততার সঙ্গে মূলের প্রতিশব্দ ও প্রতিচরণ বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং মূল নাটকের প্রায় তিন হাজার চরণের মধ্যে সর্বমোট পনেরো লাইনের বেশি জায়গায় ইচ্ছাকৃতভাবে মূলের পরিবর্তন করেন নি। "বাংলা ভাষায় নাটকীয় সংলাপের স্বাভাবিকতা রক্ষার নিমিত্তে বাকভঙ্গীর যেটুকু রদবদল অপরিহার্য মনে হয়েছে মূলের ওপর তার অতিরিক্ত খোদকারী প্রায় কখনই করতে যাইনি।"

(২য় খণ্ডের ভূমিকা)

অনুবাদের ক্ষেত্রে গ্রহণ ও বর্জন নীতি

'মুখরা রমণী বশীকরণ' শেক্সপীয়রের কমেডি নাটক। নাটকের কাহিনী শুরু হয়েছে পাদুয়া শহরের ধনাঢ্য ব্যক্তি ব্যাপ্তিস্তা ও তার দুই কন্যা ক্যাথেরিনা ও বিয়াঙ্কাকে কেন্দ্র করে। ক্যাথেরিনা মিনোলা জ্যেষ্ঠা এবং মুখরা, বিয়াঙ্কা শান্ত এবং কনিষ্ঠা। বিয়াঙ্কার বিবাহের জন্য প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু ব্যাপ্তিস্তা জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ সম্পন্ন না করে কনিষ্ঠার বিবাহ দিতে রাজি নন। গ্রুমিও, হোর্টেনসিও এবং ত্রানিও লুসেনসিও বিয়াঙ্কার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। পেট্রশিও ভেরোনার যুবক, সে

Dhaka University Institutional Repository

ক্যাথেরিনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। বিয়াঙ্কার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে লুসেনশিও অতিমাত্রায় প্রেমে মত্ত হয়ে উঠেছে। এমন সময় ভেরোনার যুবক পেট্রশিও পাদুয়ায় প্রবেশ করে লুসেনশিওর গৃহে আশ্রয় নেয়। লুসেনশিও ভেরোনার অধিবাসী ও তারা পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাছাড়া পেট্রশিওর পিতা ব্যাপ্তিস্তার পরিচিত। লুসেনশিও ক্যাথেরিনাকে বিয়ে করার জন্য বন্ধু পেট্রশিওকে প্রস্তাব দেয়। ক্যাথেরিনা মুখরা স্বভাবের জন্য পাদুয়ায় বিখ্যাত। হোর্টেনসিও বিয়াঙ্কাকে পাওয়ার আশায় ছদ্মবেশে সঙ্গীত বিশারদ হয়ে বিয়াঙ্কার গৃহশিক্ষক হয়ে থাকার পরিকল্পনা করে।

পেট্রশিও ক্যাথেরিনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সব জেনে ব্যাপ্তিস্তার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দেয়। পেট্রশিওর পিতা এ্যান্টনিও ইতালীর একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। পেট্রশিও ব্যাপ্তিস্তার নিকট প্রস্তাব দিয়ে বলেন, 'ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে অতি শীঘ্রই আমাকে অন্যত্র চলে যেতে হবে। আমার হাতে এত সময় নেই যে, প্রত্যহ নিয়মিত এসে প্রণয় নিবেদন করি। আপনি আমার পিতাকে ভাল করে জানতেন, সেই সূত্রে আমার প্রকৃতিও হয়ত কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হই আমি। আমার তত্ত্বাবধানে সেগুলো বেড়েছে, কমেনি। এরকম অবস্থায় আমি স্বভাবতই জানতে ইচ্ছুক যে, যদি আমি আপনার কন্যার ভালবাসা অর্জন করতে পারি এবং তাকে যথাসময়ে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে উদ্যোগী হই তাহলে যৌতুক স্বরূপ আমার কি কি সম্পদ লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিনিময়ে পেট্রশিও তিনি কি দেবেন সে বিষয়ে অঙ্গীকারও করেছেন।

পেট্রশিও নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, পেট্রশিও যদি আগে মৃত্যুবরণ করে তাহলে বিধবা অবস্থায় তাঁর স্ত্রী সকল সম্পত্তির ষোলআনা মালিক বলে স্বীকৃত হবে।

পেট্রশিও ও ক্যাথেরিনার স্বভাব বিপরীতধর্মী। একজন গর্বিতা স্বভাবের অন্য জন রাজকীয় মেজাজের পুরুষ। পেট্রশিও স্থির করছে যে ক্যাথেরিনা যত মুখরা এবং কড়া মেজাজের হোক না কেন, সে তার সঙ্গে কোমল ব্যবহার করবে। এভাবে এক সময় পেট্রশিওর ক্যাথেরিনার সঙ্গে প্রণয় হয় এবং জীবন সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে এবং শেষ অবধি মুখরা রমণীকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে নিজের বশীভূত করে।

Dhaka University Institutional Repository

এই কাহিনীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো একজন মুখরা দাম্ভিক, গর্বিতা মেজাজী রমণী যাকে তার বাবা পর্যন্ত তার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে এক সময় বলেন, "এমন সন্তানের পিতা হওয়া যে কত বড় যন্ত্রণা তা আমি কাকে বোঝাব?" সন্তানের স্বভাবের জন্য পিতা আক্ষেপ বা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পিতা সন্তানকে ঠিক করতে ব্যর্থ হয়েছেন, কোন পুরুষ তার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারেনি। সেই অসম্ভব নারীকে জয় করা কম কথা নয়। পেট্রশিওই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, যার দ্বারা এ কাজটি সম্ভব হয়েছে। প্রণয় থেকে শুরু করে স্ত্রীত্বে বরণ করে সর্বোপরি একজন পতিভক্ত স্ত্রীতে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। স্ত্রীকে বশ করে নিজের বাড়িতে নিয়ে নিজের বশে আনতে সক্ষম হয়েছেন। মুখরা রমণী ক্যাথেরিনা পরিবর্তিত হয়েছে অন্য এক নারীতে। বিয়ের পর সে স্বাভাবিক রমণীতে পরিণত। স্বামীর প্রতি ভক্তি ভালবাসায় স্বামী অনুগত প্রাণা। অন্য রমণীদের মত সেও স্বামীর বাড়ি যায় আবার নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর সাথে বাবার বাড়ি আসে। এভাবেই মুখরা রমণী বশীকরণের কাহিনী সমাপ্ত হয়।

কাহিনীর শেষাংশে মূল নাট্যকার যবনিকা টানেননি, অনুবাদে যবনিকা টানা হয়েছে। কাহিনীর হেরফের বা পরিবর্তন অনুবাদক না করলেও সংলাপের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন এসেছে। সংলাপ পর্যালোচনা করলে সে বিষয় পরিষ্কার বোঝা যাবে।

(Words Worth Editions Limited-1993'-এর মূল নাট্যগ্রন্থ ব্যবহার এবং এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।)

Dhaka University Institutional Repository

সংলাপ পর্যালোচনা

প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পরিচিতি অনুবাদে অনুপস্থিত।

১নং লুসেনশিওর সংলাপে মূল নাটকের সংলাপ অনুযায়ী বিশেষ করে শহরের নাম অনুবাদে পর্যায়ক্রমে সাজানো নেই। Tranio থেকে Italy পর্যন্ত সংলাপ অনুবাদে সাজিয়ে লেখা নেই। মূল নাটকে সংলাপগুলো পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে লেখা আছে।

২নং এ্যানিওর সংলাপে মূল নাটকে সংলাপ শেষ হয়নি। যেমন : No profit grows where is no pleasure ... এভাবে আছে। কিন্তু অনুবাদে সংলাপ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

৪নং দৃশ্য পরিচিতিতে কে, কিভাবে আসছে সে Situation অনুবাদে ব্যাখ্যা করা নেই। মূল নাটকে সে ব্যাখ্যা দেয়া আছে। যেমন A door opens, and BAPTISTA with his two daughters KATHARINA and BIANCA, followed by GREMIO a panta loon' and HORTENSIO, suitor to Biauca, come out Lucentio and Tranio stand by among the trees.

৯নং ক্যাথেরিনার সংলাপের অনুবাদে আসেনি and use you like a fool. অনুবাদে এসেছে, "তাতে চুন কালি লেপ্টে কাকতাড়ুয়া বানিয়ে লটকে রাখবে।"

১১নং সংলাপের মূলে গ্রুমিওর এই উক্তি And me too, good Lord এখানে And me'র অনুবাদ আছে কিন্তু too good Lord-এর অনুবাদ নেই। হোর্টেনশিওর উক্তির সঙ্গে গ্রুমিওর উক্তির রেশ নেই। মূলের সাথে অনুবাদের পার্থক্য এইটুকু।

(পৃ. ১৩-১৫)

১৫নং ব্যাপ্তিস্তার সংলাপে not displease শব্দের অনুবাদ হয়েছে উক্তিতে, "ছিঃ অশ্রুপাত করো না।"

১৭নং বিয়াঙ্কার সংলাপে Sir-কে বাবা সম্বোধন করা হয়েছে।

১৮নং সংলাপে যে কণ্ঠস্বর শোনা যায় তা লুসেনশিওর উক্তিতে মিনার্ভার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গ্রিক মিথোলজিতে মিনার্ভা হলেন সঙ্গীতের দেবী। অনুবাদে বলা হয়েছে, "কণ্ঠস্বর কোনো মানবীয় নয়। নাট্যকার স্বর্গের অপসরার কথা বলেছেন।"

(পৃ. ১৫)

Dhaka University Institutional Repository

১৯নং হোর্টেনশিওর সংলাপে So strange? বাক্যাংশের অনুবাদ হয়েছে "নিষ্ঠুর আচরণ"। এখানে মূল শব্দের অর্থের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়।

২০নং গ্রুমিওর সংলাপে fiend of heel-এই বাক্যাংশের অনুবাদে 'দজ্জালিনী' হয়েছে।

(পৃ. ১৬)

২২নং ক্যাথেরিনার সংলাপে তার প্রস্থান সম্পর্কে তা মূল নাটকে আছে কিন্তু অনুবাদে নেই।

২৫নং গ্রুমিওর সংলাপে What's that I pray? এখানে অর্থ দাঁড়ায় "সেটা কি? বলার জন্য তোমায় মিনতি জানাই।" অনুবাদে আছে "কি করতে হবে কথাটা খুলে বল।" মিনতির স্থলে হুকুম করা হয়েছে।

২৬নং হোর্টেনশিওর সংলাপে মূল নাটকে এই সংলাপে নাট্যকার her sister ব্যবহার করেছেন। অনুবাদে 'জ্যেষ্ঠা ভগিনী' উল্লেখ করে বক্তব্যকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

২৮নং হোর্টেনশিওর সংলাপে অনুবাদ আছে, "ওই হল পতি, পতি।" মূল নাটকে আছে I say, a husband.

২৯নং গ্রুমিওর সংলাপে To hell শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। To hell অর্থ নরক কিন্তু অনুবাদে এসেছে অগ্নিশিখা। এই সংলাপের শুরুতেই আছে I say a devil. অনুবাদে এসেছে "প্রেত হলেও হতে পারে"। অনুবাদে সন্দেহের অবকাশ আছে। নাটকে সেটা নেই।

৩২নং হোর্টেনশিওর সংলাপে Faith as you say theris small choice in rotten apples. মূল নাটকে দীর্ঘ সংলাপের প্রথম অংশ অনুবাদে এসেছে, "যে আকুল পাথারে পড়েছে তার অত বাছবিচার করলে চলে না"। অনুবাদে পঁচা আপেলের সাথে আকুল পাথার বা ঘোর বিপদের তুলনা করা হয়েছে।

৩৩নং গ্রুমিওর সংলাপে অনুবাদে গ্রুমিওর রাজি থাকা বা সম্মতির ওপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। মূল নাটকে সাধারণভাবে বলা আছে। যেমন, am agreed,

(পৃ. ১৭)

৩৪নং ত্রানিওর সংলাপে মূল নাটকে নাট্যকার প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। অনুবাদে প্রবাদ বাক্য ব্যবহৃত হয়নি। গদ্যের আকারে সংলাপ এসেছে।

৩৫নং লুসেনশিওর সংলাপে মূল নাটকে Jove, Cretan, agenon-এই তিনজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। অনুবাদে এদের নাম আসেনি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

১-১৫নং পর্যন্ত সংলাপে যথেষ্ট হাস্যরস রয়েছে কিন্তু সব জায়গায় তা বজায় থাকেনি এবং আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়নি। মূল রচনার ৭টি ডায়লগ ১৬টি ডায়ালগে পরিণত হয়েছে।

৬নং গ্রুমিওর সংলাপে নাট্যকার quarrel some বলে একটু রসিকতা করেছে। অনুবাদে সেটা বর্জিত হয়েছে।

২০নং পেট্রিশিওর সংলাপে As wealth is burden of my wooing dance" প্রবাদ প্রয়োগ চমৎকার হয়েছে পেট্রিশিওর সংলাপ। কিন্তু Florention, sibuth, Xanthippe, Adriatic, Seas প্রভৃতি শব্দগুলো অনুবাদে ব্যবহৃত হয়নি। পরিবর্তে তাড়কা, হিড়িম্বা, মন্দোদরী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

২১নং গ্রুমিওর সংলাপে মূলের Flatly শব্দের অনুবাদ হয়েছে 'সুস্পষ্টরূপে'।

২৩নং পেট্রিশিওর সংলাপে Autumn Crack যা একটি কালকে বুঝায় অর্থাৎ শরৎকাল। কিন্তু অনুবাদে এসেছে বৈশাখের মেঘ। এখানে শরৎকালের উল্লেখ করা হয়নি।

২৬নং গ্রুমিওর সংলাপে অনুবাদে Grumio'-এর অনুরোধ উপেক্ষিত।

২৭নং হোর্টেনশিওর সংলাপে my treasure শব্দটি 'আমার সম্পদের' পরিবর্তে 'আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ' হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। Jewel of my life in hold. সংলাপের এই অংশটুকু 'আমার নয়নের মণি' হিসেবে অনূদিত হয়েছে।

৩০নং গ্রুমিওর সংলাপ Hevis no knavery! এর অনুবাদ করা হয়েছে 'কী সাধু সংকল্প'।

(পৃ. ২৫)

৪৮নং গ্রুমিওর সংলাপে Wild Cat শব্দের অনুবাদ 'দাম্ভিনী' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪৯নং পেট্রিশিওর সংলাপে মূল রচনার পেট্রিশিও প্রশ্ন করেছেন কিন্তু অনুবাদে তিনিই আবার উত্তর দিচ্ছেন। অর্থাৎ অনুবাদে প্রশ্ন না করে উত্তর দেয়া হয়েছে।

৫০নং গ্রুমিওর সংলাপে মূল রচনায় গ্রুমিও নিজেই ক্যাথারিনাকে গলায় দড়ি পরাতে চাচ্ছেন, অনুবাদে শুধু গলায় দড়ি কামনা করা হয়েছে।

(পৃ. ২৭)

Dhaka University Institutional Repository

৫২নং গ্রুমিওর সংলাপে অতিরিক্ততা লক্ষ্য করা যায় যা মূল রচনায় নেই। যেমন, Grunio... For he fears none. কোন কিছুতে বা কাউকে তার ভয় নেই। এই অংশটি অনূদিত হয়েছে, 'আমি বরাবরই বলেছি, এ লোকের ভয় ডর কিছু নাই'।

৬৮নং ত্রানিওর সংলাপের Why শব্দটির অনুবাদ হয়েছে, 'কি কারণে শুনতে পারি কি?'

৭৩নং ত্রানিওর সংলাপে মূল রচনায় বন্ধুর কথা উল্লেখ নেই। মূল নাট্যকার হেলেনের নাম উল্লেখ করেননি। শুধু বলা আছে Lidas daughter অনুবাদে হেলেনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৭৫নং লুসেনশিওর সংলাপে give him head-এর অনুবাদ হয়েছে 'কোন ক্ষতি নেই'। সংলাপে অনুবাদে head, jade ছন্দের মিল নেই। I know he will prove a jade. Jade অর্থ অকর্মণ্য। সে নিজেকে অকর্মণ্য প্রমাণ করবে। বক্তব্যের অন্তর্গত সম্পর্ক এক হলেও স্টাইলে (Style) পার্থক্য আছে।

৮০নং গ্রিমিওর সংলাপে Hereules, Alcides শব্দগুলো অনুবাদে উপেক্ষিত হয়েছে। 'রুস্তম' নামটি মূল নাটকে নেই, অনুবাদে আছে। Hereules-এর স্থলে রুস্তমকে আনা হয়েছে। Alcides উপমা চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়েছে।

(পৃ. ২৯)

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

অনুবাদে পরিবর্তন লক্ষণীয়। মূল নাটকে Whip কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু পাখার হাতলের উল্লেখ নেই।

২নং ক্যাথেরিনার সংলাপ, 'তাহলে এখনও ভাল চাস্ তো সত্য কথা বল'। অনুবাদের এই অংশ মূল রচনাতে নেই। মূলে আছে of all they suitors, here I charge thee tell whom thou lov'st best seethou dissemble not.

৬নং ক্যাথেরিনার সংলাপে `to keep you fair'-এর অনুবাদ করা হয়েছে, 'তোকে রানীর হালে রাখবো'।

৮নং ক্যাথেরিনার সংলাপে Strikes her. এখানে অনুবাদ হয়েছে, 'পাখা দিয়ে আঘাত করে'। মূল রচনায় পাখার উল্লেখ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

২২নং ব্যাপ্তিস্তার সংলাপে What may I call your name? অবশ্য একথাও সত্য যে, আপনি কে আপনার দেশ কোথায় সে সব পরিচয় আমার কাছে এখনও প্রকাশ করেননি। এখানে Interrogative বাক্য Assertive হয়েছে।

মূল রচনায় দেশ কোথায়? পরিচয় কি? এসব কিছুই জানতে চাওয়া হয়নি। অনুবাদে তা চাওয়া হয়েছে।

২৪নং ব্যাপ্তিস্তার সংলাপে you are welcome for his sake অনূদিত হয়েছে 'আমার সৌভাগ্য যে তার পুত্র আজ আমার গৃহে অতিথি হয়ে এসেছেন'। নাট্যকারের মতে বক্তব্যটি এরূপ, 'তারই সৌজন্যে আপনি আমার গৃহে আমন্ত্রিত।

অনুবাদের ভাষা ব্যবহার মার্জিত ও সৌজন্যবোধ অনেক বেশি লক্ষণীয়।

৩০নং ব্যাপ্তিস্তার সংলাপে Luncentio is your name অনুবাদে '(পুস্তকের মলাট উল্টে নাম পড়ে নিয়ে) আপনার নাম কি লুসেনশিও'?

এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যাপ্তিস্তা কিভাবে লুসেনশিওর নাম জানলেন তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নাট্যকার শেক্সপীয়র দেননি। কিন্তু অনুবাদে তা দেওয়া হয়েছে।

(পৃ. ৩৪)

৪৮নং পেট্রশিওর সংলাপে She sings as sweety as a nightingale অনুবাদ হয়েছে 'তার কণ্ঠস্বর বুলবুলির গানের মতই সুধাময়'।

৫১নং ক্যাথেরিনার সংলাপে Moved! in good time! let him that moved you hither অনুবাদে আছে 'এতক্ষণে আসল কথাটি বলেছেন'।

উক্তিটি মূল রচনায় নেই। কিন্তু অনুবাদে মূল রচনা থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলেও ক্যাথেরিনার বোধশক্তিকে সুস্পষ্ট করে দেখানোর জন্যই উক্তিটি সংযোজন করেছেন। এখানে অনুবাদকের সূক্ষ্মজ্ঞানের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

৫৭নং ক্যাথেরিনার সংলাপে No such a Jade as you অনূদিত হয়েছে 'কোন হাবসী খোজার কর্ম নয়'।

Dhaka University Institutional Repository

৬০, ৬১, ৬২নং নাট্যকার কর্তৃক ব্যবহৃত Buzz, buzzard, turtle ইত্যাদি শব্দগুলোকে অনুবাদক সুনিপুণভাবে বাংলায় রূপায়ণ করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত মাঝ, মাঝি মাঝা-মাঝি, মাছি ইত্যাদি শব্দগুলোর মধ্যে চমৎকারভাবে ভাব ও ছন্দের মিল রয়েছে। তাছাড়া অনুবাদক প্রচলিত ইংরেজি বিকল্প হিসেবে একই ধরনের বাংলা শব্দ প্রয়োগ করেছেন যা সাধারণভাবে বোধগম্য। এখানে অনুবাদকের মেধা ও শব্দ ব্যবহার প্রশংসনীয়।

৭০নং ক্যাথেরিনার সংলাপে Yours, if you talk of tales and so farewell. মূল রচনায় ক্যাথেরিনার রাগ করে উঠে যাওয়ার লক্ষণ অনুবাদে নেই।

৭১নং পেট্রশিওর সংলাপে I am a gentleman অনূদিত হয়েছে, 'আমি লাঙ্গুলে নই, ভদ্র মান্ত ান'। এ ধরনের শব্দ মূল রচনায় নেই। লাঙ্গুলে শব্দটি অনুবাদকের নিজস্ব সংযোজন।

৯৩নং ক্যাথেরিনার উক্তিতে Go Fool ... অনুবাদ হয়েছে 'নাছোড়বান্দা'।

৯৭নং ক্যাথেরিনার উক্তিতে A wity mother! witless else her son. এই অংশের অনুবাদ করা হয়েছে, 'জন্মদাত্রীরই দান হবে নইলে সন্তানের বার্তালো কি করে'।

১০৫নং পেট্রশিওর উক্তিতে Dove শব্দের অর্থ ঘুঘু, কিন্তু অনুবাদে আছে 'পায়রা'। ইংরেজি সাহিত্যে 'ঘুঘু' শান্তির প্রতীক। পক্ষান্তরে বাংলা সাহিত্যে 'পায়রা' শান্তির প্রতীক।

Second Grissel-কে ইংরেজি ও গ্রিক সাহিত্যে ধৈর্যের নিদর্শন হিসেবে পাওয়া যায়। এর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের রামায়ণের জানকীকে তুলনা করা যায়। জানকীর চরিতেও ধৈর্যের পরিচয় বহন করে। তদ্রূপ Lucress-কে বলা হয়েছে 'সাবিত্রী'।

তৃতীয় অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

মূল নাটকে দৃশ্য পরিচিত আছে। অনুবাদে দৃশ্য পরিচিত ছাড়া সরাসরি নাটক আরম্ভ হয়েছে।

৩নং লুসেনিশিওর সংলাপে দেখা যায়, মূল নাটকে লুসেনশিও হোর্টেনশিওকে আদ্যোপান্ত গাধা বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু অনুবাদে কেবল মাত্র চতুষ্পদ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। আদ্যোপান্ত গাধা শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। চতুষ্পদ সম্বোধনটি অনুবাদকের নিজের সৃষ্টি।

(পৃ. ৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

১২নং লুসেনশিওর সংলাপে Spit in the hole, এই অংশে বাগধারার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে 'থুথু দিয়ে কান মোচড়ান'।

১৪নং হোর্টেনসিওর সংলাপে Madam-এর পরিবর্তে 'সুন্দরী' ব্যবহৃত।

১৬নং হোর্টেনসিওর সংলাপে মূল নাটকে নাট্যকার প্রতিপক্ষের আড়ালে কথা বলেছেন হোর্টেনসিও ও লুসেনশিও। অনুবাদে সরাসরি কথা বলা হয়েছে। [Aside] দিয়ে নাট্যকার আড়ালে বা মুখ এক পার্শ্বে ঘুরিয়ে কথা বলা বুঝিয়েছেন।

তৃতীয় অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

দৃশ্য পরিচিতি

[দ্বিতীয় দৃশ্যে ব্যাপ্তিস্তা, গ্রুমিও, ত্রানিও (লুসেনশিওর ছদ্মবেশে), লুসেনশিও (ক্যাম্বিওর ছদ্মবেশে), ক্যাথেরিনা (বধু বেশে), অনুচরসহ কিছু লোকের প্রবেশ।]

অনুবাদে শুধুমাত্র কে কে প্রবেশ করছে তার বর্ণনা আছে।

৩৫নং ব্যাপ্তিস্তার সংলাপে মূল নাটকে আছে যে, শুধু বিয়াঙ্কা নয়, বিয়ে বাড়ির অন্যান্যরাও তার অনুসরণ করে। বিয়াঙ্কাই শুধুমাত্র ক্যাথেরিনার অনুসরণ করে – এই দৃশ্য উপস্থাপিত।

৩৬নং (বিয়োনদেলোর প্রবেশ) এ অংশে অনুবাদে বিয়োনদেলোর প্রবেশকে স্বাভাবিক প্রবেশ দেখানো হয়েছে। মূল নাটকে আছে Biondelo comes running up. সে কিভাবে আসছে সে situation বর্ণনা করা হয়েছে। অনুবাদে বিয়োনদেলোর প্রবেশের ওপরই শুধু গুরুত্ব আরোপিত।

(পৃ. ৪৯)

৫৬নং বিয়োনদেলোর সংলাপে একটি ছড়া গান আকারে লিখিত। অনুবাদে ছড়া গানের কোন নমুনা নেই। এখানে সাধারণভাবে সংলাপ দিয়ে বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে।

৬৮নং ব্যাপ্তিস্তার সংলাপে but thus, I trust, you will not marry her এই অংশের অনুবাদ হয়েছে 'কোন মেয়ে আপনাকে বিয়ে করতে আগ্রহ বোধ করবে।'

Dhaka University Institutional Repository

৭৭নং গ্রুমিওর সংলাপে 'A bride groom, Gremio A bridegroom Say you, it is a groom, indeed এখানে Its a groom-এর পরিবর্তে 'বন্যবরাহ' অনুবাদ হয়েছে। এখানে বস্তুর পরিবর্তে জীব নির্দেশ করা হয়েছে।

৮১নং গ্রিমিওর সংলাপে A dove শব্দের অর্থ অনুবাদে 'কবুতর' এসেছে। আলবৎ শব্দ দিয়ে বিয়েতে সম্মতি (রাজি) বোঝানো হয়েছে। মূলে Ay-by goes wauns আছে।

৮৩নং গ্রিমিওর সংলাপে মদ্যপান করার উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার বলা আছে A health শব্দটি দিয়ে। কিন্তু অনুবাদে পরিস্কার ভাবে বলা নেই। শুধু আছে, 'দরাজ গলায় আমন্ত্রণ জানাল'।

৯৭নং গ্রুমিওর সংলাপে মূল নাটকে Homourous situation (রসিকতা) ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু অনুবাদে সেটি করা নেই। মূলে আছে The oats have eaten the horses.

(পৃ. ৫৫)

১০৩নং পেট্রশিওর সংলাপে মূল নাটকে আছে –

(ক) Weapon, এর অর্থ অস্ত্র। অনুবাদে আছে তরবারী। তরবারী বললে ইংরেজিতে যাকে আমরা Sword বুঝি। কিন্তু নাটকে Sword শব্দের ব্যবহার হয়নি। নাট্যকার নির্দিষ্ট করে বলেন নি।

(খ) একই সংলাপে Thives শব্দের অর্থ অনুবাদে 'চোরগুলো' না বলে 'দুর্বৃত্ত' হয়েছে।

(গ) এই সংলাপের অন্যত্র আছে Fear not, Sweet wench they shall not touch, thee, Katel. অনুবাদ হয়েছে 'সাধ্য কি কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে'। এখানে কেশের সামান্য অগ্রের স্পর্শ করার কথা উল্লেখ আছে।

(ঘ) লক্ষ দুশমন আক্রমণ করলেও আমার এই তরবারী তোমার রক্ষা করবে।

মূল নাটকে আছে Pii bucker thee against a million. আমি তোমারে লক্ষের বিরুদ্ধে রক্ষা করব।

১০৪নং ব্যাপ্তিস্তার সংলাপ Nay let them go ... a couple of quiet ones (শান্ত দম্পত্তি)। কিন্তু অনুবাদ হয়েছে সরাসরি 'প্রজ্জ্বলন্ত দম্পত্তিকে'। নাটকে পরিস্থিতির অবতরণা যে ভাবে হয়েছে অনুবাদে তা হয়নি।

(পৃ. ৫৬)

১০৬নং ত্রানিওর সংলাপে mad শব্দের অনুবাদ অভাবনীয় হয়েছে।

১০৭নং গ্রিমিওর সংলাপে মূল নাটকের Kated শব্দের অনুবাদ কটিবদ্ধ হয়েছে। মূলের সাথে শব্দের মিল অপূর্ব হয়েছে।

(পৃ. ৫৭)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

৯নং গ্রুমিওর সংলাপে দৃশ্য-পরিচিতি সংক্ষেপে দেয়া হয়েছে। মূল নাটকে আছে Thy horn is a foot, and so long am I at the least. অনুবাদে আছে, 'কি বললে?' আমি তিনাংগুলে? তুমি না জানলে ও তোমার বিবি জানে আমার মুরোদ কত।

১০নং কুর্তিসের সংলাপ। মূল নাটকে এই সংলাপ শুরুর পূর্বে seence ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনুবাদে তা নেই। সংলাপটি ভিন্ন। মূল নাটকের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। নাট্যকার এখানে ব্যঙ্গ প্রকাশ করেছেন। মূল সংলাপের সাথে অনুবাদের মিল নেই।

১৩নং গ্রুমিওর সংলাপে 'Why? Jack boy! ho boy!' and as much news as thou wilt.' এই বাক্যাংশের অনুবাদ হয়েছে, 'শোনো শোনো কান পাতি, শোনো মন দিয়া। কি বলিস, গান গেয়ে শোনাব কি?' এই সংলাপ মূল নাটকে নেই।

(পৃ. ৫৮)

১৪নং কুর্তিসের সংলাপে মূল নাটকে আছে You are so full of cony-catching, এই অংশটুকু অনুবাদ হয়েছে বজ্জাতি।

১৭নং গ্রুমিওর সংলাপ 'My horse is tired'-এর অনুবাদ 'আমার ঘোড়া মুখে ফেনা তুলেছে'।

৩০নং কুর্তিসের সংলাপ he is more shrew than she. এই অংশের অনুবাদ 'কর্তার চেয়ে গিন্নীর তেজই যেন কিছু বেশি'। এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশিত।

৩৫নং গ্রুমিওর সংলাপে নাট্যকার ব্যক্তিত্ব বা Personality প্রকাশ করেছেন। অনুবাদে তা করা হয়নি। শুধুমাত্র বলা আছে, 'কিন্তু নতুন কর্ত্রীরও একটা আলাদা মুখ আছে'। নাট্যকার লিখেছেন, 'Why, she hath a face of her own. এই পর্যন্তই।

৪০নং ন্যাথানিয়েল এর সংলাপে স্বাগতম বা Well come জানানো হয়েছে। যেমন, Welcome home Grunio. অনুবাদে Welcome-এর পরিবর্তে 'তুমি এসে গেছ গ্রুমিও?' করা হয়েছে।

৪৭নং গ্রুমিওর সংলাপ এখানে নাট্যকার cock's passion silence! বলেছেন। অনুবাদে সেখানে 'এই রে সেরেছে!' রূপে পরিবর্তিত।

(পৃ. ৬০)

Dhaka University Institutional Repository

৪৯ ও

৫০নং অনুচর ও পেট্রশিওর সংলাপে Here, here sir, sir-here-sir এবং Here – sir! here-sir! sir! here, sir! প্রভৃতি সংলাপের অনুবাদ এসেছে, 'সালাম, সালাম, সালাম হুজুর। সালাম, সালাম, সালাম হুজুর।'

৫৪নং পেট্রশিওর সংলাপে গানের ব্যবহার করা হয়েছে যা মূল নাটকের সাথে সম্পর্কিত নয়।

৬০নং পেট্রশিওর সংলাপে নাট্যকার বলেছেন, heedless joltheads, aind unmannered slaves! অনুবাদে অন্য শব্দগুলোর অর্থ ঠিক থাকলেও বেল্লিক শব্দের অনুবাদ ঠিক মত আসেনি। বেআক্কেল, বেত্তমিজ শব্দগুলো ইংরেজিতে আছে কিন্তু বেল্লিক শব্দের ইংরেজি নেই।

৬১নং ক্যাথেরিনার সংলাপে নাট্যকার শুধুমাত্র The meat was well (মাংসটা ভাল ছিল) বলেছেন। কিন্তু অনুবাদে মাংসের উল্লেখ নেই। অনুবাদে বলা হয়েছে, 'হয়ত একেবারে অখাদ্য ছিল না'। এখানে খাদ্য বলতে যা কিছু খাওয়া যায় সবই বুঝায়। নাট্যকার শুধুমাত্র মাংসের কথা উল্লেখ করেছেন।

৬৪নং পিটারের সংলাপ, নাট্যকার বলেছেন He kills her in her own humour (তার রসেই তাকে খাবে) কিন্তু humour-এর অর্থ অনুবাদে 'অস্ত্র'। অনুবাদে বলা হয়েছে, 'বিবির অস্ত্রেই বিবিকে ঘায়েল করবেন মনস্থ করেছেন'। অথচ humour শব্দের অর্থ 'রসিকতা'।

৬৬নং কুর্তিসের সংলাপে আছে In her chamber. অর্থাৎ তার কুঠুরীতে আছেন। অনুবাদে আছে 'বাসর ঘরে'।

(পৃ. ৬৩)

৬৭নং পেট্রিশিওর সংলাপে মূল নাটকে রাজ্য শাসন শুরুর কথা বলা আছে। অনুবাদে বলা হয়েছে, 'প্রথম পর্ব ভালই পরিচালনা করেছেন'। মূলে পার্থক্যটা ব্যাপক, যেখানে রাজ্য শাসন কার্য কেবলমাত্র শুরু করেছেন সেখানে অনুবাদে প্রথম পর্ব পরিচালনা ভালই করিয়ে ফেলা হয়েছে।

(পৃ. ৬৪)

চতুর্থ অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

৭৯নং ত্রানিওর সংলাপে how beastly'-এর অনুবাদ করা হয়েছে, 'দুজনে কি রকম নির্লজ্জের মত ঢলাঢলি শুরু করেছে'।

Dhaka University Institutional Repository

৮২নং বিয়াঙ্কার সংলাপে Bianca Tranio-কে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু অনুবাদে সরাসরি বিয়াঙ্কার সংলাপ আছে।

৯০নং বিয়োনদেলোর সংলাপে like a father শব্দের অনুবাদ হয়েছে 'একেবারে মুরুব্বীদের মত'।

৯১নং ত্রানিওর সংলাপ থেকে ৯৬নং সংলাপে বাগধারা অপরিবর্তিত, তবে এখানে একটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, যা মূল নাটকে লক্ষ্য করা যায় না। এখানে ত্রানিও ও বিয়াঙ্কার কথোপকথনের সময় বিয়োনদেলো প্রবেশ করে। বিয়োনদেলো তাদের গুরু সম্পর্কিত গোপন কথাটি ত্রানিওর কাছে বলছিল। এই গোপন কথা বিয়াঙ্কা জানতে পারলেও তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না।

৯২নং বিয়োনদেলোর সংলাপে একজন ফেরেস্তার সাথে বৃদ্ধ লোকের তুলনা করা হয়েছে An ancient angel. কিন্তু অনুবাদে তা না করে সোজাসুজি 'প্রাচীন বান্দা' বলা হয়েছে।

৯৬নং ত্রানিওর সংলাপে লুসেনশিও ও বিয়াঙ্কার প্রস্থান দেখান হয়েছে। বিয়াঙ্কার প্রস্থান ৯১নং সংলাপে করালে ভাল হতো। কারন বিয়াঙ্কাই এখানে মূল নায়ক। সে গোপন কথা জেনে গেল। কিন্তু মজার ব্যাপার ৯৬নং সংলাপের পর বিয়াঙ্কার আর কোন ভূমিকা দেখা যায় না বা উপস্থিতিও দেখা যায় না।

(পৃ. ৬৭)

১১১নংবিয়োনদেলোর সংলাপ 'As much as an apple doth an oyster'-এর অনুবাদে করা হয়েছে, 'ঝিনুক-শামুকের মত মিল'।

(পৃ. ৬৮)

চতুর্থ অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

১২৩নং গ্রুমিওর সংলাপ অনুবাদ করা হয়নি। সংলাপটি হলো 'Or else you get no beef of Grumio.

১২৬নং হোর্টেনসিওর সংলাপে– Mistress শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে 'নতুন বৌ'। অনুবাদে দৃশ্য পরিচিতি দেওয়া হয়নি।

১৩২নং হোর্টেনসিওর সংলাপে– Signior Petrochio, fie! you are to blame. এই অংশের অনুবাদ করা হয়েছে 'অনেক হয়েছে, পেট্রশিও এবার থামো।'

Dhaka University Institutional Repository

১৩৪নং দোকানীর সংলাপে– দোকানী বাক্সটি খুলে তার ভেতর থেকে মস্তক আবরণী বের করে দেখালো। কিন্তু অনুবাদে এই অংশটি বর্জিত হয়েছে। শুধুমাত্র বলা হয়েছে যে, 'নিয়ে এসেছি'।

১৩৫নং পেট্রশিওর সংলাপের শেষে (he casts it into a corner) অংশটুকু অনুবাদে বর্জিত হয়েছে।

(পৃ. ৭১)

১৩৮নং হোর্টেনসিওর সংলাপে অনুবাদক নতুন করে (স্বগত) উল্লেখ করেছেন। যা নাটকের পূর্ব দৃশ্যগুলোতে পাওয়া যায়নি। অনুবাদে স্টাইলের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

১৪১নং ক্যাথেরিনার সংলাপে Love me or love me not-এর অনুবাদ 'আপনি খুশি হন আর নাই হন'। এরপর [he goes to the table, Grumio dismisses the haberdasher] অনুবাদ থেকে এই দৃশ্য পরিচিতি বাদ পড়েছে।

১৪৪নং হোর্টেনসিওর সংলাপে I see she's like to have neither cap nor gown, এই উক্তির অনুবাদ করা হয়েছে 'কামিজও জুটবে না'।

(পৃ. ৭২)

১৪৬নং পেট্রশিওর সংলাপে ও ১৫৪নং মূল নাটকে মেরীর গ্রুমিওর (Marry) সংলাপে নামে শপথ করে বক্তব্য বলা হয়েছে। কিন্তু অনুবাদে সে কাজটি করা নেই।

(পৃ. ৭৩)

১৬০নং পেট্রশিওর সংলাপে Read it-এর অনুবাদ হয়েছে 'সে টোকা কোথায়?'

১৬১নং গ্রুমিওর সংলাপে The note lies ins throat-এর অনুবাদ করা হয়েছে, 'ওর জিব টেনে বার করে দেখুন'।

১৬৪নং পেট্রশিওর সংলাপ Small শব্দের অনুবাদ হয়েছে 'বাড়তি'।

(পৃ. ৭৪)

১৮৯নং গ্রুমিওর সংলাপে O, fie fie fie! এর অনুবাদ হয়েছে 'তওবা, তওবা'।

(পৃ. ৭৫)

১৯২নং পেট্রশিওর সংলাপে মূল নাটকে বাইন (cel) মাছের উল্লেখ আছে কিন্তু অনুবাদে কোন মাছের নাম উল্লেখ নেই।

(পৃ. ৭৫)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫নং হোর্টেনসিওর সংলাপে মূল নাটকে the sun শুধুমাত্র সূর্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু অনুবাদে 'চাঁদ ও সূর্য' দুটোরই উল্লেখ করা হয়েছে।

(পৃ. ৭৬)

চতুর্থ অঙ্ক ॥ চতুর্থ দৃশ্য

দৃশ্য পরিচিতিতে সানিও লুসেনশিও ছদ্মবেশে এসেছে, অনুবাদে তা বলা হয়নি।

১নং ত্রানিওর সংলাপে Please if you that I call? এর অনুবাদ হয়েছে, 'আপনি প্রস্তুত তো?'

৯নং ত্রানিওর সংলাপে মূল নাটকে যেখানে drink সেখানে অনুবাদে মিঠাই ব্যবহার করা হয়েছে। মূল নাটকে সংলাপটি এভাবে এসেছে, 'hold thee that to drink'-এর পর [gives him money]-এর অনুবাদ করা হয়েছে, 'মিঠাই খাবার পয়সা নিয়ে যাস'। এরপর দৃশ্য পরিচিতিতে দরজা খুলে গেল। লুসেনশিও আসলো ক্যাম্বিওর ছদ্মবেশে। এই অংশটি অনুবাদে বর্জিত হয়েছে? যেমন, The door opens and BAPTISTA comes out followed by LUCENTIO, as Cambio.

(পৃ. ৭৬)

১৩নং ব্যাপ্তিস্তার সংলাপে Pitchaers have ears. এই অংশের অনুবাদ প্রশংসনীয়। এখানে বাংলা প্রবাদকে রক্ষা করার জন্য অনুবাদ করা হয়েছে, 'দেয়ালেরও কান আছে'।

(পৃ. ৭৭)

৩৩নং বিয়োনদেলোর সংলাপে Aftermoon এর অনুবাদ আছে, 'সূর্য ডোবার আগে।'

(পৃ. ৭৯)

৩৪নং লুসেনশিওর সংলাপে মূল নাটকেও গান আছে, অনুবাদেও গান আছে। অর্থও একই বুঝায় কিন্তু পার্থক্য হলো গানের লাইন (কলি) বিন্যাস আলাদা ও দুটো গানের স্টাইল ভিন্ন।

(পৃ. ৭৯)

চতুর্থ অঙ্ক ॥ পঞ্চম দৃশ্য

এই দৃশ্যে কোন স্থানের সদর রাস্তা তার উল্লেখ নেই কিন্তু মূল নাটকে পাদুয়ার সদর রাস্তার উল্লেখ আছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫নং পেট্রশিওর সংলাপে Gende mistress এটা অনূদিত হয়েছে 'সুন্দরী'। 'Hortensio, A will make the name mad, to make a woman of him' এই অংশটুকু অনুবাদে বর্জিত হয়েছে।

(পৃ. ৮০)

৫০নং ভিনসেনশিওর সংলাপে ভিনসেনশিও পেট্রুশিওকে কুর্ণিশ করে। এই দৃশ্য অনুবাদে অনুপস্থিত।

৫৫নং হোর্টেনসিওর সংলাপে, 'জনাব, উনি রসিকতা করেন নি'। এই সংলাপটি মূল নাটকে নেই।

৫৭নং হোর্টেনসিওর সংলাপের অনুবাদে গান অন্তর্ভুক্ত হলেও তা মূল নাটকে নেই।

(পৃ. ৮২)

পঞ্চম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

১নং বিয়োনদেলোর সংলাপে বিয়োনদেলো ফিসফিস করে কথা বলছে, এটি অনুবাদে নেই। অনুবাদে সরাসরি এবং স্বাভাবিক কথা বলার দৃশ্য উপস্থাপিত।

৬নং ভিনসেনশিওর সংলাপে মূল নাটকে আছে but drink before you go, অনুবাদে মিষ্টিমুখ করানোর কথা বলা হয়েছে। দরজা সোজাসুজি উপরের জানালা দিয়ে গুরু মাথা বের করে নিচের দিকে তাকিয়ে ভিনসেনশিওর সাথে কথা বলেছেন। অনুবাদে গুরুর বলার ভঙ্গিমাটা আসেনি।

(পৃ. ৮৩)

৬১নং ভিনসেনসিওর সংলাপে মূল নাটকে আছে villains nose, অনুবাদে আছে, 'কান কেটে দেবো'।

৬৮, ৬৯, ৭০ ও

৭২নং পেট্রশিওর, ক্যাথেরিনার, পেট্রশিওর, সংলাপে First kiss me-এর অনুবাদ হয়েছে, 'তবে তার আগে আমাকে তোয়াজ করতে হবে'। thou ashamed of me-এর অনুবাদ করা হয়েছে, 'আমি কি প্রকাশ্য দিবালোকে তোমার স্বামী নই?'

এ রুমাল দিয়ে আমার কপালের ঘাম মুছে দাও – মূল নাটকে এই বাক্যটি নেই।

(পৃ. ৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

১নং লুসেনশিওর সংলাপে My father welcome-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'পদচুম্বন'।

৬নং পেট্রশিওর সংলাপে Widow শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে 'বৌ' হিসেবে।

(পৃ. ৮৯)

৮৬নং পেট্রশিওর সংলাপে Come on and kiss me Kate. এই সংলাপের অনুবাদ হচ্ছে, 'আমার হাতে হাত রাখো'।

(পৃ. ৯৫)

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্র বিচার

'The Taming of the Shrew' নাটকের মূল চরিত্রগুলো হলো :

Baptista, Vincentio, Lucentio, Petruchio, Gremio, Hortensio, Tranio, Biondello, Grumio, Curtis, Nathamel, Philip, Joseph, Nicholas, Peter, Katharina, Bianca, Awidow, Tailor ও অন্যান্য।

মূল নাটকের চরিত্রগুলো অনুবাদে দেয়া এভাবে যেমন :

ব্যাপ্তিস্তা	:	পাদুয়ার ধনাঢ্য নাগরিক।
ভিনসেনশিও	:	পিসার প্রধান নাগরিক।
লুসেনশিও	:	ভিনসেনশিওর পুত্র, বিয়াঙ্কার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী
পেট্রশিও	:	ভেরোনার যুবক, ক্যাথেরিনার প্রণয় নিবেদক।
গ্রুমিও	:	বিয়াঙ্কার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী
হোর্টেনসিও		
ত্রানিও	:	লুসেনশিওর অনুচর
বিয়োনদেলো		
বানক		
গ্রুমিও	:	পেট্রশিওর সহচর
নাথানিয়েল		
ফিলিপ		
জোসেফ	:	পেট্রশিওর অপরাপর ভৃত্য
নিকলাস		
নিটার		
মানটুয়ার	:	একজন পণ্ডিত পুরুষ
ক্যাথেরিনা, মুখরা	:	ব্যাপ্তিস্তার কন্যাদ্বয়
বিয়াঙ্কা	:	একজন বিধবা
		দর্জি, খিদমৎগার, ভৃত্য।

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রের পার্থক্য নির্দেশ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ

Vincentio'-এর পরিচিতি নাট্যকার দিয়েছেন An old gentleman of Pisa নাট্যকার বলেছেন পিসার বৃদ্ধ ভদ্রলোক। অনুবাদক তাঁর পরিচয় দিয়েছেন– পিসার প্রধান নাগরিক।

Petruchio'-এর পরিচয় নাট্যকার দিয়েছেন– a gentleman of Verona, Suitor to Katharina. পেট্রিশিও ভেরোনার একজন ভদ্রলোক। অনুবাদক পেট্রিশিওকে ভেরোনার যুবক বলে পরিচয় দিয়েছেন।

Tranio

Biondello, a boy, Servants to Lucentio. মূল নাটকে ত্রানিও বিয়োনদেলোকে লুসেনশিওর চাকর বলে পরিচয় দিয়েছেন। অনুবাদক চাকরের পরিবর্তে অনুচর বলেছেন।

Curtis-এর পরিচয় নাট্যকার দিয়েছেন an aged serving man, incharge of Petruchio's house in the country. নাট্যকার তাঁকে একটা বড় পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। যেখানে তিনি incharge সেখানে অনুবাদক শুধুমাত্র 'গৃহভৃত্য' বলে পরিচিতি দিয়েছেন।

অনুবাদে মূল নাটক বহির্ভূত চরিত্রের নাম

অনুবাদক কর্মে 'তড়কা', 'হিড়িম্বা', 'মন্দোদরী', 'হেলেন', 'রুস্তম', 'জানকী', 'সাবিত্রী', 'স্বর্গের অপসরা' প্রভৃতি উপমা ও চরিত্র মূল চরিত্রের দেশীয় সংস্করণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন পাঠকদের বোধগম্যতা ও রুচির দিক চিন্তা করে।

বিশেষ পদের ব্যবহার

দজ্জালনী, নাছোড় বান্দা, জ্যেষ্ঠাভগিনী, লাঙ্গুলে, চতুষ্পদ, সুন্দরী, দরাজগলা, প্রজ্জ্বলন্ত, দম্পতি, বজ্জাতি, তিনাঙ্গুল, নির্লজ্জ, উত্তম, নতুন বৌ, দন্তিনী, জন্মদাত্রী, তেজস্বিনী, মুখরা, নির্মম, ছলনাময়ী, প্রিয়ম্বদা, কৌতুক পরায়ণা, অতিথি বৎসল।

ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচন

নয়নের মণি, দেয়ালেরও কান আছে, আকুল পাথার, কস্মিন কাল, রাসতল, গুড়ে বালি।

রূপক-উপমার ব্যবহার

ঝিনুক-শামুক, হাবসী খোঁজা, ইতালীর ঘুঘু, বন্যবরাহ, কাকতাড়ুয়া, তড়িৎবেগ, অগ্নিশিখা, টঙ্কার, টনৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম দর্শন

আল্লা, মোনাজাত, আলবৎ, তওবা, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে মুসলিম দর্শন তুলে ধরেছেন।

অনুবাদে সংযোজিত অংশ

২য় অঙ্কের ১ম দৃশ্যে (৩০নং) ব্যাপ্তিস্তার সংলাপে ব্যাপ্তিস্তা লুসেনশিওর ঘাম জানতে চাচ্ছেন। পুস্তকের মলাট উল্টে নাম পড়ে নিয়ে নিশ্চিত হয়ে বলছেন, 'আপনার নাম লুসেনশিও? বাড়ি কোথায়? এখানে উল্লেখ্য যে, পুস্তকের মলাট উল্টে নাম পড়ে নিশ্চিত হলেন। অর্থাৎ পূর্ব থেকেই নামটি নির্ধারণ করা ছিল বলে মনে হয়। 'বাড়ি কোথায়' এই অংশটুকু সংযোজিত হয়েছে।

তৃতীয় অঙ্কের ১ম দৃশ্যে (৩নং সংলাপে) লুসেনশিওর উক্তিতে আদ্যোপান্ত গাধা (Preposterous ass) বর্জন করে 'চতুষ্পদ' উপমাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্কের ১ম দৃশ্যে (১৩নং) গ্রুমিওর সংলাপে 'শোনো শোনো কান পাতি, শোনো মন দিয়া'। 'বিলকিস গান গেয়ে শোনোবো নাকি?'

গান গেয়ে শোনাবো নাকি বা গানের একটি পংক্তির উল্লেখ অনুবাদে সংযোজন করা হয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্যে (১৬১নং) গ্রুমিওর সংলাপে 'ওর জিব টেনে বার করে দেখুন'। এই অংশটুকু সংযোজিত। 'সূর্যের সাথে চাঁদের পাশাপাশি ব্যবহার'। মূল নাটকে চাঁদের উল্লেখ নেই। সুতরাং 'চাঁদ' শব্দটি নতুন সংযোজন।

৫ম দৃশ্যে (৫৭নং) হোর্টেনসিওর উক্তির শেষে অনুবাদক কবিতার একটি স্তবক বা গানের অংশ সংযোজন করেছেন।

৫ম অঙ্কের ১ম দৃশ্যে (৭০নং) পেট্রুসিওর সংলাপে 'রুমাল দিয়ে আমার কপালের ঘাম মুছে দাও' এই অংশও অনুবাদকের নিজস্ব সৃষ্টি।

মূল নাটকের সংলাপের যে অংশগুলো অনুবাদে সংক্ষিপ্ত হয়েছে বা বর্জিত হয়েছে

১ম অঙ্কের ১ম দৃশ্যের পরিচিতি অনুবাদে আসেনি। Tranio, since for the great desire I had to see fair Padua, nursery of arts, I am arrived for fruitful Lomdardy. The pleasant garden of great Italy, পর্যন্ত বিশেষ করে শহরগুলোর নাম অনুবাদে সাজান নেই।

Dhaka University Institutional Repository

(৪নং) ত্রানিওর সংলাপে Situation ব্যাখ্যা করা নেই।

(১৭নং) বিয়াঙ্কার সংলাপে Sir কে 'বাবা' সম্বোধন করা হয়েছে।

(১১নং) গ্রুমিওর সংলাপে good Lord অংশটুকু অনুবাদ করা হয়নি।

(৩৬নং) ত্রানিওর সংলাপে 'Redime te captum quam queas minimo' প্রবাদটি বাদ পড়েছে।

৩য় অঙ্কের ১ম দৃশ্যে দৃশ্য পরিচিতি অনুবাদ হয়নি

Hortensio (rises) Sirrah, I will not bear these braves of thire.

Bianca [comes between them]. Why, gentlemen,

you do me double wrng,

To strive for that which resteth in my choice :

I am no breeching scholar in the schools,

I'll not be tied to hours nors pointed times, But learn my lessons as I please myself, এবং and to cat off থেকে you have turned পর্যন্ত অনুবাদ হয়নি।

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে (১২৩নং) গ্রুমিওর সংলাপের 'Or else you get no beef of Grumio' অংশটুকু অনুবাদে বাদ পড়েছে।

(১২৮নং) পেট্রশিওর সংলাপে 'The sets the dish down; she falls to' এই অংশের দৃশ্য পরিচিতি অনুবাদে নেই। তারপর She eats ও 'he snatches up the meat', 'he sets down the dish' প্রভৃতি সংলাপের অংশগুলো অনুবাদে বর্জিত হয়েছে।

(১৩৫নং) পেট্রশিওর সংলাপের শেষে he casts it into a corner অংশটুকু অনুবাদে নেই।

(১৪১নং) ক্যাথেরিনার সংলাপের he goes to the table, Grumio dismisses the haberdasher ভিতরে দৃশ্য পরিচিতি অনুবাদে নেই।

(১৬২নং) দর্জির সংলাপে gown-কে অনুবাদে বাদ দিয়ে 'কামিজ' বলা হয়েছে। তেমনি (১৬৪নং) পেট্রশিওর সংলাপে Small হয়েছে 'বাড়তি'।

চতুর্থ দৃশ্যে ত্রানিও লুসেনশিও ছদ্মবেশে এসেছে তা অনুবাদে বাদ দেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

Please it you that I call? অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়েছে (ত্রানিওর উক্তি)।

(৯নং) ত্রানিওর সংলাপের drink শব্দটি এবং gives him money অংশটুকু বর্জিত।

৪র্থ দৃশ্যে (৪৫নং) পেট্রিশিওর সংলাপে Hortensio. A' will make the man mad, to make a woman of him. অংশ অনুবাদে নেই।

৫ম অঙ্কের ১ম দৃশ্যে (৬৬নং) গ্রুমিওর সংলাপে PETRUCHIO and KATHARINA rise অংশ অনুবাদে আসেনি। তাছাড়া দৃশ্য পরিচিতিতে লুসেনশিও স্বরূপে এসেছেন তা অনুবাদে বর্জিত।

অনুবাদে সংলাপের পরিবর্তিত অংশসমূহ

১ম অঙ্কের ১ম দৃশ্যে (২নং) ত্রানিওর সংলাপে মূল নাটকে আছে 'No Profit grows where is no pleasure ta'en ... অনুবাদে সংলাপ শেষ করা হয়েছে যেমন, কারণ যে কর্মে আনন্দ নেই তা থেকে ফল লাভ দুঃসাধ্য।

(৯নং) ক্যাথেরিনার উক্তিতে and use you like a fool এর অনুবাদ করা হয়েছে, তাকে চুনকালি লেপ্টে কাকতাড়ুয়া বানিয়ে লটকে রাখবে'।

(২৯নং) গ্রুমিওর সংলাপে নাট্যকার নিশ্চিত হয়ে বলেছেন, I say a devil. কিন্তু অনুবাদক সেখানে সন্দেহ রেখেছেন, 'কখনো নয়! প্রেত হলেও হতে পারে'।

(৩২নং) হোর্টেনসিওর উক্তিতে মূল নাটকে এভাবে আছে যেমন, Hortensio, Faith, as you say, there's small choice in rotten apples.

এই অংশের অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে, 'যে আকুল পাথারে পড়েছে তার অত বাছবিচার করলে চলে না'।

৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪২নং সংলাপগুলোতে নাট্যকার পাত্র-পাত্রীকে গোপনে বা লুকিয়ে কথা বলিয়েছেন কিন্তু অনুবাদে তা হয়নি। অনুবাদে সরাসরি কথা বলানো হয়েছে। এখানে Situation-এর পরিবর্তন লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য

(২নং) ক্যাথেরিনার সংলাপে মূল নাটকে আছে Of all the suitors, here I charge thee tell whom thou lov'st best see thou dissemble not.

অনুবাদে আছে, 'ভাল চাস্‌ত সত্য কথা বল'।

Dhaka University Institutional Repository

(৬নং) ক্যাথেরিনার উক্তিতে to keep you fair-এর পরিবর্তে 'তোকে রানীর হালে রাখব' করা হয়েছে।

(৮নং) ক্যাথেরিনার উক্তিতে মূল রচনায় পাখার উল্লেখ নেই। অনুবাদে পাখার উল্লেখ করা হয়েছে।

(১২নং) ক্যাথেরিনার উক্তিতে She is your treasure-কে পরিবর্তন করে 'নয়নের মণি' করা হয়েছে।

(২৫নং) গ্রুমিওর সংলাপে নাট্যকার বলেছেন, Saving your tale, Petruchio, I pray, এই অংশটির অনুবাদ করা হয়েছে, 'পেট্রশিও সাহেব যদি অল্প সময়ের জন্য মুখ বন্ধ করতেন'।

(৫১নং) ক্যাথেরিনার সংলাপে আছে, Move! in good time! let him that moved you hither, অনুবাদে আছে, 'এতক্ষণে আসল কথাটি বলেছেন।'

(১০৩নং) ক্যাথেরিনার উক্তিতে নাট্যকার পেট্রশিওকে শূলে চড়াতে চেয়েছেন। অনুবাদে তার পরিবর্তে ফাঁসিতে চড়াতে চাওয়া হয়েছে।

(১২১নং) গ্রুমিওর সংলাপে Tyrina-কে কাশ্মির বলা হয়েছে। Turkey'-এর উল্লেখ নেই।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য (১৬নং) হোর্টেনসিওর সংলাপে নাট্যকার প্রতিপক্ষের আড়ালে হোর্টেনসিও লুসেনশিওকে কথা বলিয়েছেন। অনুবাদে তা করা হয়নি।

(১৯নং) লুসেনশিওর সংলাপে আছে Lucentio, Mistrust it not, অনুবাদে এই অংশটি রূপায়িত হয়েছে, অধিকন্তু কাব্যে একথা একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য

(৯নং) গ্রুমিওর সংলাপে আছে thy horns is a foot, and so long am I at the least এই অংশ পরিবর্তন করা হয়েছে এভাবে, 'কি বললে? আমি তিনাঙ্গুলে? তুমি না জানলেও তোমার বিবি জানে আমার মুরোদ কত।'

(১০নং) কৃর্তিসের সংলাপ tell me, how goes the world? কে পরিবর্তন করা হয়েছে, 'রাগ করো না ভাই। সব খবরাখবর খুলে বল।'

(১৩নং) গ্রুমিওর সংলাপে Jack boy! ho boy! as much news as thou will সংলাপের পরিবর্তিত রূপ, 'শোনা শোনো কান পাতি, শোনো মন দিয়া।'

(৩০নং) কুর্তিসের সংলাপে he is more shrew than she পরিবর্তন হয়েছে 'কর্তার চেয়ে গিন্নীর তেজই যেন কিছু বেশি'।

Dhaka University Institutional Repository

(৪৭নং) গ্রুমিওর সংলাপে আছে Cock's passion, Silence, অনুবাদে পরিবর্তিত হয়ে এই অংশটি হয়েছে, 'এই রে সেরেছে'।

(৫৪নং) পেট্রশিওর সংলাপে মূল নাটকে যে গান ব্যবহার করা হয়েছে অনুবাদে তার পরিবর্তে বিদ্যাপতির পদ ব্যবহার করা হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য

দৃশ্য পরিচিতি মূল নাটকের চেয়ে সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

(৭৭নং) ব্রানিওর উক্ততে ব্রানিও বলেছে ... I have often head of your entire affection to Bianca. এই সংলাপের অংশটুকু অনুবাদে আছে, 'আমি তোমার নাম অনেক শুনেছি'।

(৭৮নং) হোর্টেনসিওর সংলাপে আছে, See, how they kiss and court! Signior Lucentio. অনুবাদে আছে, 'দেখুন, দেখুন, কেবল ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেনি, পরস্পরের হস্ত ধারণ করেছে। সিনর লুসেনশিও, অন্ধের মত ভালবেসে এতদিন এ মেয়েকে যত প্রকার বন্দনা করেছি ও তার কোনটার উপযুক্ত নয়।

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য

(১৩২নং) হোর্টেনসিওর সংলাপে Signior Petruchio fie! You are to blame এর বদলে 'অনেক হয়েছে, পেট্রশিও এবার থামো' ব্যবহৃত হয়েছে।

(১৩৩নং) পেট্রশিওর সংলাপে প্রথমে (নিম্নকণ্ঠে) তার পর সংলাপ শুরু হয়েছে। অনুবাদের এর পরিবর্তিত রূপ হলো, প্রথমে (নিম্নকণ্ঠে) পরে মাঝখানে (স্বাভাবিক কণ্ঠে) বলা হয়েছে, 'তুমি খেতে আরম্ভ কর'। এখানে কাকে খেতে বলা হচ্ছে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। মূল নাটকে নাট্যকার ক্যাথেরিনাকে খেতে বলেছেন।

(১৪৪নং) হোর্টেনসিওর সংলাপে, I see she's like to have neither cap nor gown, এই সংলাপ পরিবর্তন করে দেয়া আছে, 'কামিজও জুটবে না'।

(১৬০) পেট্রশিওর সংলাপে Read at-কে 'টোকা কোথায়' রূপে অনূদিত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্য

(৩০নং) লুসেনশিওর সংলাপে Heari'st thour, Biondello? এই অংশের অনুবাদ করা হয়েছে 'এ তুই কি বলছিস বিয়োনদেলো'?

(৩২নং) লুসেনশিওর সংলাপে মূল নাটকে গান আছে। অনুবাদেও গান আছে তবে গানের কলি বা গান বিন্যাস ভিন্ন। অর্থাৎ গানের Style আলাদা।

চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য

(৪৫নং) পেট্রশিওর সংলাপে Gentle mistress-কে 'সুন্দরী' বলা হয়েছে।

(৫৫নং) হোর্টেনসিওর সংলাপে Father, so it is. অনুবাদে আছে, 'জনাব উনি রসিকতা করেননি'। এই সংলাপটি মূল নাটকে নেই।

(৫৭নং) হোর্টেনসিওর সংলাপে অনুবাদে গান বা কবিতার অংশ এসেছে এটি মূল নাটকে নেই।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য

(৩৮নং) ভিনসেনশিওর সংলাপে আছে, O, he heath Murdered his master! অনুবাদে বলা হয়েছে, 'ওরে নরাধম, তুই নিশ্চয়ই আমার পুত্রকে হত্যা করে এখন নিজে লুসেনশিও সেজেছিস'।

(৭০নং) পেট্রশিওর সংলাপে First kiss me এই অংশের অনুবাদ করা হয়েছে, 'তবে তার আগে আমাকে তোয়াজ করতে হবে'।

(৭২নং) পেট্রশিওর সংলাপে thow ashamed of me রূপান্তরিত হয়েছে, "আমি কি প্রকাশ্য দিবালোকে তোমার স্বামী নই?"

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য

(৮৬নং) পেট্রশিওর উক্তি, Come on and kiss me Kate অনুবাদে রূপান্তরিত হয়েছে, "আমার হাতে হাত রাখো"।

Dhaka University Institutional Repository

(৯২নং) লুসেনশিওর উক্তিতে, মূল রচনায় বলা হয়েছে, তারা সবাই বিছানায় চলে গেল। অর্থাৎ they all go off to bed. অনুবাদে যবনিকা টেনে দেয়া হয়েছে।

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

(১৭নং) বিয়াঙ্কার সংলাপে 'স্যার'কে বাবা করা হয়েছে।

(১৯নং) হোর্টেনসিওর সংলাপে So strange নিষ্ঠুর আচরণ রূপে পরিবর্তিত।

(২০নং) গ্রুমিওর সংলাপে fiend of hell কে দজ্জালনী বলা হয়েছে।

(২৯নং) গ্রুমিওর সংলাপে to hell অগ্নিশিখা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(২৩নং) পেট্রুশিওর সংলাপে Autumn creak কে বৈশাখের মেঘ করা হয়েছে।

(৪৮নং) গ্রুমিওর সংলাপে wild cat কে দম্ভিনী করা হয়েছে।

(৬৮নং) ব্রানিওর সংলাপে Why এর রূপান্তরিত রূপ হয়েছে, কি কারণে শুনতে পারি কি?

অনুবাদকের বিচক্ষণতার পরিচয়

প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

(২৬নং) হোর্টেনসিওর সংলাপে-নাট্যকার her sister বলেছেন। অনুবাদক নির্দিষ্ট করে বুঝানোর জন্য her sister কে জ্যেষ্ঠা ভগিনী উল্লেখ করে বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন এবং বিশেষণ পদটি সংযোজন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

(২৪নং) ব্যাপ্তিস্তার সংলাপে you are welcome for his sake. বক্তব্যটি অনুদিত হয়েছে এভাবে যে, "আমার সৌভাগ্য যে, তার পুত্র আজ আমার গৃহে অতিথি হয়ে এসেছে।"

Dhaka University Institutional Repository

এখানে অনুবাদের ভাষা ব্যবহার মার্জিত ও সৌজন্যবোধ অনেক বেশি সুন্দর হয়েছে।

(৩০নং) ব্যাপ্তিস্তার সংলাপে Lueentio is your name. এখানে উল্লেখ্য যে ব্যাপ্তিস্তা কিভাবে লুসেনশিওর নাম জানলেন তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নাট্যকার দেননি। কিন্তু অনুবাদক সে কাজটি করে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

(৫১নং) ক্যাথেরিনার সংলাপে Moved! in good time! let him that in oved you hither, এই অংশটুকু অনুবাদ করা হয়েছে, "এতক্ষণে আসল কথা বলেছেন"। অনুবাদক মূল রচনা থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলেও সম্ভবত ক্যাথেরিনার বোধশক্তিকে সুস্পষ্ট করার জন্য উক্তিটি সংযোজন করেছেন।

(৮৭নং) সংলাপে ব্যবহৃত buzz, blezzard, turtle প্রভৃতি শব্দ অনুবাদক বাংলায় সুনিপুণভাবে নতুন রূপ দিয়েছেন : "মাঝ, মাঝি, মাঝা-মাঝি, মাঝি প্রভৃতি আকারে। শব্দগুলোর মধ্যে চমৎকারভাবে ভাব ও ছন্দের মিল রয়েছে। অনুবাদক দক্ষতার সাথে ইংরেজি শব্দের বিকল্প হিসাবে একই ধরনের বাংলা শব্দ প্রয়োগ করেছেন যা সাধারণভাবে দুঃসাধ্য। এখানে অনুবাদকের শব্দশৈলী নির্বাচনে দক্ষতা প্রশংসনীয়।

তৃতীয় অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

(১০৯নং) গ্রিমিওর সংলাপে অনুবাদক অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে Kated শব্দের অর্থ কটিবদ্ধ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মুখরা রমণী বশীকরণ-এর অনুবাদ বৈশিষ্ট্য

শেক্সপীয়রের 'Taming of the shrew' মূলত একটি কমেডি নাটক। নাটকটির রচনাকাল সম্ভবত ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ। নাটকের বঙ্গানুবাদ করা হয় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে।

অনুবাদ একটি দুরূহ কাজ। একটি ভিন্ন পরিবেশ, সমাজ, দেশ, কাল ও ভাষায় নাটক অনুবাদ সহজসাধ্য নয়। অনুবাদক মুনীর চৌধুরী বলেছেন, "নাটকটি পুরোপুরি রঙ্গনাট্য। এর সবটাই কৌতুক। সবটাই রঙ্গ, সবটাই রগড়। এর অনেকখানিই ভান, অনেকখানিই অতিরঞ্জন।"

(রচনাবলী ২য় খণ্ডের ভূমিকা)

বিচার্য বিষয় হলো 'মুখরা রমণী বশীকরণ' নাটক কোন ধরনের অনুবাদ।

'মুখরা রমণী বশীকরণ' নাটকের অনুবাদ পর্যালোচনা করতে যেয়ে যে দিকটি স্পষ্ট উপলব্ধি করা সম্ভব তা হলো নাটকটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, কারণ আক্ষরিক অনুবাদে প্রয়োজনমত এবং ইচ্ছানুযায়ী সংলাপের রদবদল ও শব্দের অর্থের ব্যবহার করা হয় না।

অনুবাদের সময় নাট্যকার অনেক ক্ষেত্রেই দেশীয় রস সৃষ্টির জন্য সংলাপের অংশ-বিশেষ পরিবর্তন ও কোন কোন ক্ষেত্রে মূল বহির্ভূত নতুন সংলাপ সংযোজন করে আক্ষরিক অনুবাদ থেকে দূরে সরে এসেছেন।

নাটক অনুবাদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়, তা সংলাপ আলোচনা অংশে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে (৪নং) হোর্টেনসিওর সংলাপ থেকে শুরু করে you have tuned পর্যন্ত অনুবাদ করা হয়নি।

মূল নাটকে মাঝে মাঝে গান ব্যবহৃত হলেও অনুবাদে এসব ক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণ গৃহিত হয়েছে। মূল গানের পরিবর্তে দেশীয় গান ব্যবহার করেছেন। রূপক, উপমাগুলোও ব্যবহৃত হয়েছে। দেশীয় উপাদান নিয়ে যা এদেশের মানুষের পরিচিত। এসব ক্ষেত্রে অনুবাদকের মৌলিকতা লক্ষ্য করা যায়। অন্য ক্ষেত্রে অনুবাদকের দক্ষতার পরিচয় লক্ষণীয়। পূর্বের সময় ও কালকে এযুগের পটভূমিতে টেনে এনে সেই যুগের মানুষকে এযুগের পটভূমিতে দাঁড় করানো বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শেক্সপীয়রের যুগকে আত্মীকরণ করে এ যুগের প্রেক্ষাপটে রূপ দিতে গিয়ে অনুবাদক দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। অনুবাদকর্মে অনুবাদকের ভাষাজ্ঞানের

Dhaka University Institutional Repository

গভীরতা, শব্দশৈলীর নিপুণতা পাঠককে মুগ্ধ করে। এতে সংলাপ অনুধাবন করতে পাঠকের মোটেই অসুবিধা হয় না, বরং সহজেই রসাস্বাদ গ্রহণ করা যায়।

আক্ষরিক অনুবাদের অংশগুলিতে শব্দার্থের যথাযথ প্রয়োগ লক্ষণীয়। সংলাপের খণ্ডাংশগুলোর যথার্থ অনুবাদ এবং কোন অংশ বর্জন করা হয়নি। বর্তমানের পটভূমিতে অতীতকে ধরে রাখার প্রচেষ্টা বেশ প্রশংসনীয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রকাশ করতে গিয়েও তিনি যথাযথ শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করেছেন। এতে অনূদিত নাটকটি পড়তে গিয়ে মনে হয়নি যে নাটকটি ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে শেক্সপীয়রের লেখা নাটক।

একজন সফল নাট্যকার হিসেবে মুনীর চৌধুরীর বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি রঙ্গ-ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। 'মুখরা রমণী বশীকরণ' কমেডি নাটক, সেই হিসেবে এতে রঙ্গ-ব্যঙ্গ বা কৌতুক অন্তর্ভুক্তি স্বাভাবিক। এ কারণেই তিনি শেক্সপীয়রের 'টেমিং অব দি শ্রু' নির্বাচন করেছেন যে, এখানে মূলত কৌতুক রস বাংলায় অনুবাদ করে অভিনয় ও পাঠের ক্ষেত্রে নির্মল হাস্যরস পরিবেশন সম্ভব। 'মুখরা রমণী বশীকরণ' হুবহু অনুবাদ নয়। আক্ষরিক অনুবাদ না বলে মৌলিক অনুবাদ বলাই শ্রেয়।

অনুবাদ কর্মের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো দূরবর্তী বস্তুকে কাছাকাছি এনে দেখান সম্ভব। ইংরেজি নাটকের অনুবাদে আক্ষরিক অনুবাদের অসুবিধার কারণ হলো ইংরেজি সংলাপ ও পরিবেশ বাংলায় রূপান্তরিত করণে মাধুর্য ও রস বিনষ্টের সম্ভাবনা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে 'মুখরা রমণী বশীকরণ' এর ২য় অঙ্কের ১ম দৃশ্যে (৭১নং) পেট্রুশিওর সংলাপ মূল নাটকে আছে I am a gentleman. এখানে আক্ষরিক অনুবাদ করলে বলতে হয়, "আমি একজন ভদ্রলোক।" কিন্তু অনুবাদ করা হয়েছে "আমি ল্যাঙ্গুলে নই, ভদ্রসন্তান।" এখানে উল্লেখ্য যে, আক্ষরিক অনুবাদ করলে রসিকতার সুযোগ থাকতো না। এই ব্যতিক্রম অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। মুখরা রমণীর বশীকরণে "আমি ল্যাঙ্গুলে নই, ভদ্রসন্তান" বলতে কমেডি নাটকের যে বৈশিষ্ট্য তা ক্ষুণ্ন হয়নি, বরং কৌতুক রস রক্ষিত। কমেডি নাটকে কৌতুক না থাকলে নাটকের মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ন হয়।

এভাবে সংলাপ পর্যালোচনায় বহু জায়গায় দেখা গেছে, এ নাটকটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, মৌলিক অনুবাদ। আক্ষরিক অনুবাদ হলে উপমা চরিত্র নিজের মত করে ব্যবহার করা সম্ভব হতো না। অনুবাদের ভূমিকায় অনুবাদক নিজেই বলেছেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

"আমি অনুবাদে পেট্রশিওর মুখে পাক ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী ও উপমাবহুল সংলাপ ও গান সংযোজন করে অনুবাদকের স্বাধীনতার সীমানা লংঘন করেছি এবং স্বাভাবিকতার পরিবর্তে দেশ-কালগত অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছি। যেমন,

"হোক সে তাড়কার মত কদাকার, হিড়িম্বার মত উৎপীড়নকারী, মন্দোদেবীর মতো বর্ষীয়ষী, আমি তাতে বিচলিত নই।" (অনুবাদকের কথা)

অনুবাদক উপমার মত স্বতন্ত্র গানও ব্যবহার করেছেন। যেমন,

জন্ম অবধি হাম
রূপ নেহার লুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ
হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল। ইত্যাদি

(পদাবলীর পদ)

উপমা ও চরিত্রের ক্ষেত্রে অনুবাদক বলেছেন যে, গ্রিক উপাখ্যানের যে সকল চরিত্র তুলনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো দেশীয় শিক্ষিত পাঠকগণের কাছেও অপরিচিত। যেমন,

মূলে ছিল, Besheas Foul as was Florentines' love,
As old as Sibyl,
and as Curst and Shrewd
As Socrates' Xanthippe, or a worse' ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

অনুবাদক শঙ্কিত ছিলেন যে, এই সমস্ত অপরিচিত বা অপ্রচলিত নাম হুবহু ব্যবহার করলে বাংলা ভাষী পাঠকের নিকট কোনো ভাবের উদ্রেক করবে না। তাই তিনি পাক-ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে তুলনীয় নাম নির্বাচন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদকের এ সমস্ত স্বীকারোক্তি থেকে সহজেই স্পষ্ট হয় যে, এটি আক্ষকির অনুবাদ নয়। ভূমিকায় তিনি আরও বলেছেন যে, "বলাবাহুল্য শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনুবাদ সর্বত্র আশানুযায়ী মূলানুগ বা সরস হতে পেরেছে এমন দাবি আমি করতে পারি না। তবে অনুবাদ করার সময় আমি চরণে চরণে নাটকটির বিভিন্ন মোটিভ সংস্করণ পরীক্ষা করতে করতে অগ্রসর হয়েছি। বাংলা ভাষায় নাটকীয় সংলাপের স্বাভাবিকতা রক্ষার নিমিত্তে বাকভঙ্গীর যেটুকু রদবদল অপরিহার্য মনে হয়েছে মূলের ওপর তার অতিরিক্ত খোদকারী প্রায় কখনো করতে যাইনি।"

'মুখরা রমণী বশীকরণ' নাটকের অনুবাদ প্রকৃতি বিচারে সার্বিক আলোচনা-পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অনুবাদটি নিতান্তই মৌলিক অনুবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

ওথেলো

শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের অনুবাদকর্মে হাত দিলেও মুনীর চৌধুরী তা সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। নাটকের অনুবাদ শেষ করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবীর চৌধুরী। 'টেমিং অব দি শ্রু'-এর মতো 'ওথেলো' অনুবাদের সময়ও তিনি নাটকের বিভিন্ন অংশ দেশীয় পাঠকের রুচি উপযোগী করার প্রয়োজনে, ভাষান্তরের ক্ষেত্রে মূল নাটকের বিভিন্ন অংশ পরিবর্তন করেন। এই দিকটি লক্ষ্য করে মন্তব্য করা সম্ভব যে, 'ওথেলো' নাটকও মৌলিক অনুবাদের পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

ভূমিকা

মুনীর চৌধুরী নাটক রচনায় ও অনুবাদে সমান কৃতিত্বের অধিকারী। সৃষ্টিশীল নাটক রচনা করে বাংলা নাট্যসাহিত্য যেমন সমৃদ্ধ করেছেন তিনি তেমনি অনুবাদেও সাফল্য লাভের অধিকারী। মৌলিক বা ভাবানুবাদ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর লক্ষণীয়। শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' ও 'রোমিও জুলিয়েট' এ নাটক দুটির অনুবাদ কর্মে হাত দিয়ে তিনি সমাপ্ত করতে পারেননি। 'টেমিং অব দি শ্রু'-এর অনুবাদের দুই বছর পরে 'ওথেলো' নাটকটি 'ওথেলো' শিরোনামেই অনুবাদ করেন। অনুবাদের পর নাটকটি প্রকাশিত হয় অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই। 'থিয়েটার' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নভেম্বর নাটকটি প্রকাশিত হয়। মূল নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের ৩৫৯ লাইন পর্যন্ত মুনীর চৌধুরী অনুবাদ করতে পেরেছিলেন।

শেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি নাটকগুলোর মধ্যে 'ওথেলো' নানা দিক থেকে অনন্য। তাঁর অন্যান্য ট্র্যাজেডি নাটকও (হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, কিংলিয়র) আপন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। 'হ্যামলেট', 'কিংলিয়র' ও 'ম্যাকবেথ'-এর তুলনায় 'ওথেলো'-এর ট্র্যাজিক আবেদন তীব্র। এ নাটকের ঘটনা দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। নব দম্পতির জীবনে অন্যের অশুভ প্রভাব, অকারণ সন্দেহ ও ঈর্ষা ট্র্যাজেডিকে ঘনীভূত হতে সাহায্য করে।

মূল নাটকের সাথে অনুবাদ

নাটকের সংলাপের পার্থক্য নির্দেশ

প্রথম অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

১৮. ইয়াগোর উক্তিতে মূল নাটকের এই অংশ Your heart is burst, you have lost half your soul, অনূদিত হয়েছে, 'আপনার বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। আর দেরি না করে জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে আসুন। আপনার কপাল ভেঙ্গেছে।'

(পৃ. ২৬)

Dhaka University Institutional Repository

২৪. রডেরিগোর উক্তিতে আছে, Sir, Sir, Sir, এখানে শুধু তিনবার Sir সম্বোধন করা হয়েছে। অনুবাদে উক্তিটি অন্যভাবে এসেছে। যেমন, 'আপনি আমার কথাটা আগে শুনুনতো। জনাব শুনুন... জনাব।'

(পৃ. ২৬)

৩১. ইয়াগোর উক্তি are making the beast with two backs. অনূদিত হয়েছে, 'দু'পা সংযুক্ত করে চতুষ্পদের খেলা খেলছে।' They are making the beast with two backs কথা ঠিক আছে।

৩৪. ব্রাবানশিওর উক্তি মূল নাটকে আছে I know thee Roderigo. অর্থাৎ আমি তোমাকে চিনি। এই অংশের অনুবাদ করা হয়েছে, 'আর রডেরিগো, তোমাকেও আমি ভাল করে চিনে রেখেছি। এখন আমি তোমাকে চিনি এবং তোমাকেও আমি ভাল করে চিনে রেখেছি।' এই দুই উক্তির মধ্যে ভাবের পার্থক্য ঘটেছে।

(পৃ. ২৭)

৪৪. ব্রাবানশিওর অপর উক্তিতে মূল নাটকে আছে Pray you lead on. At every house I'll call (I may command at most) এখানে Pray you lead on সংলাপে request বুঝানো হয়েছে। কিন্তু অনুবাদে নির্দেশ করা হয়েছে যেমন, তুমিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও।

এই উক্তির পরের অংশটুকু I may command at least অর্থাৎ এই নগরীর সকলকে আমি নির্দেশ দিতে পারি। অনুবাদে এখানে সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে এভাবে, 'এ নগরের সবাই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে।'

(পৃ. ২৯)

প্রথম অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

এই দৃশ্যের পরিচিতিতে মূল নাটকের মত পরিচিতি দেয়া হয়নি। মূল নাটকে আছে Enter Othello, Tago, Attendants, with torches, অনুবাদে পরিচিতি এসেছে অন্যভাবে যেমন, "[ভেনিসের সুরম্য বিশ্রাম ভবন স্যাগিটারীর সম্মুখে। ওথেলো, ইয়াগো ও কতিপয় অনুচরের মশালসহ প্রবেশ]" অনুবাদে ভেনিসের সুরম্য বিশ্রামভবন স্যাগিটারীর কথা উল্লেখ নেই। টর্চকে

Dhaka University Institutional Repository

মশাল বলা হয়েছে। তাছাড়া মূল নাটকে দ্বিতীয় বন্ধনীর ব্যবহার নেই। এটি অনুবাদে নতুন এসেছে। এই দৃশ্য পরিচিতি জানতে হলে পাঠককে আরও সামনে অগ্রসর হতে হবে।

(পৃ. ২৯)

৪৮. মূল নাটকে ওথেলোর উক্তিতে আছে Let him do his spite, অনুবাদে একটু জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, 'ওঁর সাধ্যমত উনি যা খুশি করতে পারবেন।'

৫৭. মূল ক্যাসিওর উক্তিতে Ancient শব্দটি অনুবাদে বাদ পড়েছে। মূল নাটকে আছে Ancient, what makes he here? অনুবাদে এসেছে, 'সেনাপতি এখানে কি করছিলেন?'

৫৮. Faith শব্দেও অনুবাদবর্জিত। মূল নাটকে আছে Faith he to night hath boarded a land carrack। অনুবাদে আছে 'অদ্য রজনীতে তিনি একটি মনি মানিক্যে বোঝাই স্থলগামী জাহাজ আটক করেছেন। যদি আইন এই সম্পদে ওঁর অধিকার স্বীকার করে নেয়, তাহলে সেনাপতি জীবনেরমত বনে গেলেন'। ক্যাসিওর উক্তির পরে এবং ইয়াগোর উক্তির পূর্বে দৃশ্য পরিচিতি দেয়া আছে মূল নাটকে কিন্তু অনুবাদে ইয়াগোর উক্তির পরে দৃশ্য পরিচিতি দেয়া আছে।

(পৃ. ৩১)

৭২. ওথেলোর সংলাপ মূল নাটকে আছে Hold your hands. অনুবাদে আছে, 'তোমরা সবাই নিরস্ত্র হও'।

৭৩. ব্রাবানশিওর সংলাপে আছে till fit to me of law. অনুবাদে আছে, 'বিচারালয়ের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত।' এখানে লক্ষণীয় যে বিচারালয়ের নির্দেশ বলতে রায় বা সমন বুঝায়। এখানে বিচারের সময়ের কথা বলা হয়েছে।

প্রথম অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

৭৮. প্রথম সেনেটরের সংলাপে, জাহাজের সংখ্যা মূল নাটকে আছে, hundred and seven galleys, অনুবাদে জাহাজের সংখ্যার কথা বলা আছে ১০৭টির পরিবর্তে ১২৭টি।

৮১. ডিউকের সংলাপ মূল নাটকে আছে I do not so secure me in the error. এই অংশটির অনুবাদ করা হয়েছে, 'আমি অস্বস্তি বোধ করতে পারছি না।'

(পৃ. ৩৩)

Dhaka University Institutional Repository

৮৮. ডিউকের সংলাপের পরে এবং দূতের সংলাপের পূর্বে একজন অফিসারের সংলাপ অনুবাদে বাদ পড়েছে, সংলাপটি হলো, Officer, here is more news, here is more news.

৯৭. ব্রাবানশিওর সংলাপে মূল নাটকে আছে Neither my place. অনুবাদে আছে, 'কোন রাষ্ট্রীয় বিপদের চিন্তায় ....।

১১৯. ব্রাবানশিওর সংলাপে মূল নাটকে আছে, God be with you. অনুবাদে আছে, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

(পৃ. ৪০)

১৩১. অনুবাদে ডেসডিমোনার এই সংলাপটি মূল নাটকে নেই। কিন্তু অনুবাদে আছে যেমন, 'আজ রাতেই প্রভু'। মূল নাটকে ডিউকের সংলাপের পরের সংলাপটি একজন সেনেটরের কিন্তু অনুবাদে আছে ডিউকের।

(পৃ. ৪২)

১৩৭. ডিউকের সংলাপ Good night to every one. অনুবাদ করা হয়েছে নিম্নরূপ, 'আপনারা সবাই এখন বিদায় নিতে পারেন'।

১৪৫. রডেরিগোর সংলাপ মূল রচনায় আছে, I will incontinently drown myself. অর্থাৎ আমি ডুবে মরবো। কিন্তু অনুবাদে আছে, 'আমি এক্ষুনি গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেব'।

১৪৮. ইয়ারগোর সংলাপ : oh villainous. অনুবাদে করা হয়েছে 'হা আমার কপাল!' অনুবাদে ব্যবহৃত আশ্চর্যবোধক চিহ্ন মূল নাটকে নেই।

(পৃ. ৪৩)

১৪৮. এই সংলাপে মুরগীর উল্লেখ 'guinea hen, guinea hen' অনুবাদ হয়েছে 'রঙিলা মুরগি'। এখানে মুরগি নামের অর্থ স্পষ্ট নয়।

১৬০. ইয়াগোর সংলাপে মূল নাটকে আছে, And it is thought abroad, that twixt my sheets He's done my office. মূল নাটকে অর্থ খানিকটা অস্পষ্ট হলেও অনুবাদে স্পষ্ট করে বলা আছে। মূল রচনায় bedroom এর উল্লেখ নেই। অনুবাদে বলা হয়েছে, "শুনেছি, কেউ কেউ নাকি এরকম মনে করে যে, ওথেলো গোপনে আমার শয়নকক্ষে আমার কর্মটি করেছে।

(পৃ. ৪৬)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

১৯৩. ডেসডিমোনার সংলাপ, মূলে বলা হয়েছে, How lost you company? এই বক্তব্যটি অনুবাদে পরিবর্তন হয়ে গেছে, 'তা আপনি তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন কি করে'। এখানে উল্লেখ্য এই কারণেই যে lost আর ditouched শব্দ দুটি ভিন্ন এবং দুটির ব্যবহারও স্বতন্ত্র।

২১১. ইয়াগোর উক্তির শেষ অংশে আছে, If she be fair and wise : fairness, and wit, The one's for use, the other useth if থেকে lago! To suckle fools, and chronicle small beer. পর্যন্ত অনুবাদে বর্ণিত হয়েছে।

(পৃ. ৫১)

৩০৯. ইয়াগোর সংলাপে আছে if though be'st valiant. অর্থাৎ নির্ভিক পুরুষ। অনুবাদক বলছেন, 'যদি সত্যিকারের বীর্যবান পুরুষ হন তবে আমার কথা মন দিয়ে শুনুন'। রডোরিগোকে নাট্যকার শুধুমাত্র valiant বলেছেন। কিন্তু অনুবাদে বীর্যবান পুরুষ বলা হয়েছে।

৩১৬. ইয়াগো মূল নাটকে Sir সম্বোধন করে বক্তব্য শুরু করে, অনুবাদে এই সম্বোধন অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

এই অঙ্ক নাট্যকার দুই ভাগে ভাগ করেছেন, কিন্তু অনুবাদক তিন ভাগে ভাগ করেছেন। Exit পর্যন্ত দুটি দৃশ্য।

৩২৪. অনুবাদ ওথেলোর সংলাপ 'তুমি যথার্থ বলেছ'। মূল নাটকে এই সংলাপ নেই। অন্তর্ভুক্ত অংশটি অনুবাদকের নিজের।

(পৃ. ৫৭)

৩২৭. ইয়াগোর সংলাপের এই অংশ I have a stoup of wine অনুবাদে রূপান্তরিত হয়েছে, আসুন, একটা নতুন বোতল খোলা যাক। তারপরের সংলাপের শেষের অংশে মদ্যপান শুরুর মুহূর্তে ওথেলোর সু-স্বাস্থ্য কামনার কথা বলা হয়েছে, to the health of black othellow. সেখানে অনুবাদে বলা হয়েছে কৃষকায় ওথেলোর স্বাস্থ্য পান করুন'।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩৬. ক্যাসিও বলছে Fore God they have given me a rouse already. অনুবাদে Fore God'কে কপালে ছিল বাক্যাংশে রূপান্তরিত।

৩৩৮. ইয়াগোর সংলাপে Some wine boys. অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত।

৩৬৮. মোনটানোর সংলাপ Nay, good Lieutenant অনুবাদে করা হয়েছে, 'শান্ত হোন সহ-সেনাপতি শান্ত হোন। এখানে Nay শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়নি।

তৃতীয় অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য

৪২৬. মূল নাটকে ক্যাসিও বলছে, Mine honesfrend? অনুবাদ আক্ষরিক অর্থে করা হয়েছে। 'প্রাণের বন্ধু' রূপে।

(পৃ. ৭০)

তৃতীয় অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য

৪৭৮. মূল নাটকে ওথেলোর সংলাপ 'I'll come to thee straight.' অর্থাৎ আমি সরাসরি তোমার কাছে চলে এসেছি। অনুবাদে করা হয়েছে, 'আমি একটু পরেই আসছি।'

(পৃ. ৭৫)

৪৯৬. মূল নাটকে ওথেলোর By Heaven অনুবাদ হয়েছে, 'আশ্চর্য '।

৫০৩. ইয়াগোর সংলাপ Why then I think Cassio's an honest man. অনূদিত হয়েছে, 'তাহলো, আর কতর্ক করছি কেন? আমি মনে করি ক্যাসিও একজন চরিত্রবান পুরুষ।'

৫০৭. মূল নাটকে আছে I do beseech you. অর্থাৎ 'আমি আপনাকে মিনতি জানাই। অনুবাদে আছে আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। এখানে সংলাপ দুটো ভিন্নধর্মীয়।

(পৃ. ৭৭)

৫২৯. ইয়াগো বলেছে, Long live she so :

And long live you to think so.

অর্থাৎ 'তাই হোক যেন সে চিরজীবী হয়।' অনুবাদে আছে 'ঈশ্বর করুন তিনি চিরসতী থাকুন। তাঁকে যেন আজীবন ভালবাসতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩৪. ওথেলো বলেছে, Why did I marry? অনুবাদ আছে, 'আমি কোন আক্কেলে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম জানি না।'

৫৩৬. ওথেলোর সংলাপ Fear not my government. অনুবাদ করা হয়েছে, 'নিশ্চিত থাকো। চিত্ত সংযমে আমি সম্পূর্ণ রূপে অভ্যস্ত।'

(পৃ. ৮১)

৫৫৭. মূলে ইয়াগো বলেছে, A good wench, give it me. একজন ভাল সঙ্গিনীকে অনুবাদে বলা হয়েছে সাধে তোমাকে এত ভালবাসি। এখানে সংলাপের পরিবর্তন লক্ষণীয়।

৫৬৭. ওথেলোর সংলাপে Farewell শব্দটি পাঁচবার আছে। কিন্তু অনুবাদে মাত্র দুইবার এসেছে। তাছাড়া মূল গ্রন্থে Farewell শব্দটি দিয়ে সংলাপ শুরু হয়েছে এবং শেষও হয়েছে। অনুবাদে সেভাবে ব্যবহার করা হয়নি। Farewell শব্দটিকে নাট্যকার যেভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন অনুবাদে সেভাবে প্রাধান্য দেয়া হয়নি।

উপসংহার

'ওথেলো' নাটক অনুবাদ মুনীর চৌধুরী সম্পন্ন করে যেতে না পারলেও অসম্পূর্ণ অংশে অনুবাদে দক্ষতা সর্বত্র লক্ষণীয়। মূলের মত অনুবাদেও সিরিয়াসনেস প্রকাশ পেয়েছে। ডিউক ও সিনেটরদের সামনে ওথেলো যেভাবে তার প্রণয় কাহিনী বর্ণনা করেছে সেখানে একজন বীর সৈনিক এবং ট্রাজেডি নাটকের নায়কের সাহস ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। ওথেলো চরিত্রে ওথেলোর শক্তি, সাহস, বীরত্ব প্রভৃতি গুণ ফুটে উঠেছে। অপর দিকে ডেসডিমোনার চরিত্রের সহজ-সরল দিক ও অতিমাত্রায় স্বামীর প্রতি ভালবাসা লক্ষ্য করা যায়। অসম্পূর্ণ অনুবাদ হলেও অন্যান্য অনুবাদের মতই এটিও একটি মৌলিক অনুবাদ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ নাটক 'কেউ কিছু বলতে পারে না'

ভূমিকা

'কেউ কিছু বলতে পারে না' জর্জ বার্নাড 'শ এর 'ইউ নেভার ক্যন টেল' (You never can tell)-এর বাংলা রূপান্তর। অনুবাদকাল ১৯৫৩ সাল ও প্রথম মঞ্চায়ন হয় ১৯৫৫ সালে। বাংলা একাডেমী কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। এটা একটা কমেডি নাটক। হাস্যরসের জন্য অনুবাদক অনুপ্রাণিত হয়ে নাটকটির অনুবাদ করেন।

ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদক মূল নাটকের কোন কোন অংশ বর্জন, সংযোজন অথবা পরিবর্তন করেছেন। নিচে এই দিকগুলি নির্দেশের চেষ্টা করা হয়েছে।

অনুবাদে মূল নাটকের বর্জিত অংশগুলি নিচে নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রথম অঙ্ক

মূল নাটকে দৃশ্য পরিচিতিতে স্থান ও সন-তারিখ উল্লেখ আছে এবং দৃশ্য পরিচিতি বিস্তৃতভাবে আছে কিন্তু অনুবাদে দৃশ্য পরিচিতি সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহৃত। মূল নাটকে দৃশ্য পরিচিতি In a dentist's operating room থেকে Favorable estimate পর্যন্ত দেয়া আছে।

(পৃ. ২১১-১২)

August morning in 1986. তারপর On the sea front এবং Torbay in Devon এই অংশগুলো অনুবাদে বর্জিত হয়েছে।

১. [In spite of the biscuit complexion she has not the slightest foreign accent] এ পর্যন্ত এবং The Dedntist এর সংলাপে [Putting it down on the ledge of his cabinet of instruments] পর্যন্ত সংলাপের অংশ অনুবাদে বর্জিত হয়েছে।

১৩ ও ১৪ সংলাপে The young lady ও The dentist এর সংলাপের কিছু অংশ অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। যেমন,

ক. Your furniture isn't quite the letest thing is it?

খ. It's my landlord's.

(পৃ. ১১২)

Dhaka University Institutional Repository

২১৩. পৃষ্ঠায় দৃশ্য পরিচিতি মূল নাটকের তুলনায় অনুবাদে সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে। তাছাড়া coat lined in brown silk, তার পর brown tall hat প্রভৃতি অংশগুলো অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

(পৃ. ২১৩)

১২৫. DOLLY'র সংলাপে Thank heaven মূলের এ অংশটুকু অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাছাড়া বন্ধনীতে [She sits down one the step of the operating chair] এ অংশও অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

১৮৫. GLORIA'র সংলাপে oh, nothing of any consequence এবং বন্ধনীর দৃশ্য পরিচিতি পর্যন্ত অংশগুলো অনুবাদে বর্জিত হয়েছে।

(পৃ. ২৫)

দ্বিতীয় অঙ্ক

মূল নাটকে দীর্ঘ তেতাল্লিশ লাইনের দৃশ্য পরিচিতি মাত্র ছয় লাইনে এসেছে। বাকি অংশগুলো অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

৩৭. M'COMAS'র সংলাপে There is only one place in all England where your opinions would still pass as advanced এ অংশ অনুবাদে বর্জিত হয়েছে। মূল নাটকে MRS. CLANDON'র সংলাপে MR. M'COMAS'র নাম আছে। অনুবাদে নাম বর্জিত হয়েছে।

(পৃ. ২৪১)

৭৪ ও

৭৫. DOLLY ও PHILIP এর সংলাপ অনুবাদে বর্জিত হয়েছে।

(পৃ. ২৪৩)

৮৯. PHILIP-এর সংলাপের or my mothers husband পর্যন্ত অনুবাদে বর্জিত হয়েছে।

(পৃ. ২৪৪)

২০৪. WAITER এর সংলাপের yes sir থেকে ২৫৩ পৃষ্ঠায় ২১৬নং PHILIP-এর সংলাপের Bad habit পর্যন্ত অংশ অনুবাদে অর্ন্তুক্ত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

২২৩ ও

২২৪. DOLLY ও PHILIP এর সংলাপ অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

২৪৮. WAITER-এর সংলাপে [Offering the coat this is yours, sir] থেকে ২৫২নং এর VALINTINE-এর সংলাপ পর্যন্ত অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

(পৃ. ২৫৮)

তৃতীয় অঙ্ক

মূল নাটকের দৃশ্য পরিচিতির তুলনায় অনুবাদের দৃশ্য পরিচিতি সংক্ষিপ্ত।

(পৃ. ২৭২)

৫৫. MRS CLANDON-এর সংলাপ থেকে ৬৩ MRS Clandon-এর সংলাপ I think you know পর্যন্ত সংলাপগুলো বর্জিত হয়েছে।

(পৃ. ২৭৬)

৯৯. MRS CLANDON-এর সংলাপের And you have thought me nothing. Good bye পর্যন্ত অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

১৫১. MRS CLANDON-এর সংলাপ Why not here? থেকে ১৫৬নং Waither-এর সংলাপ পর্যন্ত বর্জিত হয়েছে।

(পৃ. ২৭৯)

২২০. M'COMAS-এর দীর্ঘ ২২ লাইনের সংলাপ মাত্র ৮ লাইনে হয়েছে। বাকী অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

(পৃ. ২৮৮)

২৩৯. M'COMAS-এর সংলাপে Dinner at seven instead of half past? অংশ অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

(পৃ. ২৯০)

২৪১. DOLLY-এর Fairy lights! থেকে ২৪৪নং DOLLY and PHILIP'র Fancy ball!!! পর্যন্ত সংলাপ অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

(পৃ. ২৯০)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অঙ্ক

৪. M'COMAS-এর সংলাপ Boon, Mr. Boon থেকে ৭নং Waiter-এর সংলাপ garden through the window] পর্যন্ত সংলাপ অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

(পৃ. ২৯৩)

১৪৪. WAITHER-এর সংলাপের দৃশ্য পরিচিতি মূল নাটকের তুলনায় সংক্ষিপ্ত হয়েছে। মূলের band in the garden থেকে table, where, as the final পর্যন্ত অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

(পৃ. ৩০৪)

২৭৪ ও

২৭৫. WAITHER ও PHILIP-এর সংলাপ If you will execuse my ও He comes সংলাপ অনুবাদে বর্জিত হয়েছে।

(পৃ. ৩১৪)

২২১. মূল নাটকের GLORIA'-এর সংলাপটি অনুবাদে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

(পৃ. ২৯৫)

মূল নাটকের যে অংশগুলো অনুবাদে পরিবর্তিত হয়েছে

প্রথম অঙ্ক

৯. The young lady সংলাপে মূল নাটকে সাগরের কথা বলা হয়েছে। অনুবাদে নদীর উল্লেখ করা হয়েছে। সাগরের স্থলে নদী হওয়াতে পরিবেশের পরিবর্তন হয়েছে। মূল নাটকে 'you have a good view of the Sea from your roms! Are they expensived?' অনুবাদে সংলাপটি পরিবর্তিত হয়েছে এভাবে, 'নদীর ওপারের গ্রাম পর্যন্ত এই জানালা দিয়ে দেখা যায়'।

৩২. The PARLORMAID এ [appearing at the door] এ সংলাপটি অনুবাদে আছে '(ঘরে ঢুকে)'।

(পৃ. ২১৩)

৩৬. The young Lady'এর সংলাপে VALENTINE এর brother কে Phil. Phil বলে সংক্ষিপ্ত নামে পরিচয় করানো হয়েছে। অনুবাদে কখনও সংক্ষিপ্ত আবার কখনো পূর্ণ নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. PHILIP-এর সংলাপে England before এবং Come and lunch with us. অংশগুলো অনুবাদে পরিবর্তিত হয়েছে এভাবে England-কে 'বাংলাদেশ' ও Lunch-কে 'চায়ের দাওয়াত' বলা হয়েছে।

৪১. PHILIP-এর সংলাপে At the Marine Hotel; half past one এ অংশের অনুবাদ হয়েছে, 'এখনও আমরা কোন বাড়ি খুঁজে পাইনি। কাছেই হোটেল। হোটেল ম্যারাইন, দোতলায়, পাঁচ নম্বর সুইট।'

৪২. The young lady-এর সংলাপ মূল নাটকে এভাবে আছে, We shall be able to tell mamma that a respectable Englishman has Promised to lunch with us. মূলের এ সংলাপটি অনুবাদ করা হয়েছে, 'বেনু। দেখুন না, মাকে কি রকম তার লাগিয়ে দি। বলে কিনা এদেশের ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতেই পারবো না।'

(পৃ. ২১৪)

৪৬. PHILIP-এর সংলাপে We're from Madeira, মূলের এ অংশ অনুবাদ করা হয়েছে, 'এসেছি বার্মা থেকে।'

৭৮. VALENTINE-এর সংলাপে 'CLANDON! Are you related to'– অনুবাদে এ CLANDON-কে 'কিসমাতুল আহসান' বলা হয়েছে।

২২১. VALENTINE-এর সংলাপে Brazil nut-কে অনুবাদে 'আখরোট' বলা হয়েছে।

(পৃ. ২২৮)

২৫৩. DOLLY'র সংলাপের Chalkstones-কে অনুবাদে- কে? পিয়াজদানী-? বলা হয়েছে।

(পৃ. ২২৯)

২৬৮. মূল নাটকের GLORIA'-এর সংলাপের then, that we meet a half past one এ অংশের অনুাদ করা হয়েছে, 'বিকেলে আসছেন তো?' মূল নাটকে সময়ের উল্লেখ আছে, অনুবাদে তা নেই।

(পৃ, ২৩১)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল নাটকে ১নং 'The Gentleman-এর সংলাপে giving up the paper, অনুবাদে এই অংশ পরিবর্তিত হয়েছে 'হাই তুলে কথা বলছে।'

মূল নাটকে ১৪নং Waiter-এর সংলাপে তুলনা করা হয়েছে সাহিত্যিকের সঙ্গে যেমন, Shakespear in straford church.

অনুবাদে সাহিত্যিকের পরিবর্তে রাজনীতিবিদের সাথে তুলনা করা হয়েছে যেমন, 'স্যার সৈয়দের মতো।'

মূল নাটকে ১৮নং MRS CLADON-এর উক্তিতে M. COMAS নামটি ব্যবহার হয়েছে। নাট্যকার এ নামটি নাটকের শুরু থেকে ব্যবহার করেননি। নামটি শুরু হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্কের ২৩৯ পৃষ্ঠা থেকে। কিন্তু অনুবাদে নাটকের প্রথম থেকেই নামটি 'আসাদ' নামে ব্যবহৃত হয়েছে।

(পৃ. ২৩৯)

৩১. M. COMAS-এর সংলাপে 'অরিজিন' সম্পর্কে ডারউইনের মতবাদ এবং 'স্বাধীনতা' সম্পর্কে জন স্টুয়ার্ট মিলের মতবাদকে হাক্সলি, টিনওল, জর্জ ইলিয়ট প্রমুখ ব্যক্তিরা বিশ্বাস করেন কিনা—এ নিয়ে মূল নাটকে আলোচনা আছে।

অনুবাদের স্বাধীনতা নিয়ে এদেশীয় নারীদের মধ্যে 'চাঁদ সুলতানা, রানী ভবানী, বেগম রোকেয়া' এঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৩. M'COMAS-এর সংলাপে পূর্বের বক্তব্যে দেশীয় ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করে অনুবাদক দেশীয় ভাবধারা তুলে ধরেছেন কিন্তু এই বক্তব্যে Master Herbert Spenear-এর নাম উল্লেখ করে পুনরায় বিদেশী ভাবধারায় ফিরে গেছেন।

(পৃ. ২৪০)

৪৩. MRS-CLANDON-এর সংলাপে মূল নাটকের Mr. M'COMAS নামটি অনুবাদে পরিবর্তন করে পেশার পরিচিতি দেওয়া আছে।

(পৃ. ২৪১)

Dhaka University Institutional Repository

৫৯. MRS CLANDON-এর সংলাপে নাট্যকার বলেছেন, Dearest, Mr. M'COMAS will lunch with us. মূল নাটকের তুলনায় অনুবাদে বক্তব্য ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, 'তোদের সঙ্গে আর কেউ পেরে উঠবে না।'

৮৩. M. COMAS-এর সংলাপে মূল নাটকে সম্বোধনের স্টাইল ভিন্ন যেমন, MRS CALNDON সম্বোধনটি 'থাক বোন' বলে ব্যবহৃত হয়েছে। এক জায়গায় ইংরেজি কায়দায় অন্য জায়গায় বাঙালি কায়দায় সম্বোধন ব্যবহৃত হয়েছে।

(পৃ. ২৪৪)

১১৩. মূল নাটকে PHILIP-এর সংলাপের Mr. COMAS নামটি অনুবাদে পরিবর্তন হয়ে 'আসাদ মামা' সম্বোধন হয়েছে।

১১৪. সংলাপের 'tact' এর বাংলা রূপান্তর 'হেকমত' হয়েছে। tactfully থেকে tact শব্দটি কৌশলের পরিবর্তে 'হেকমত' হয়েছে।

১৩২. M'COMAS-এর সংলাপে 'yacht builder' অনুবাদে কাঠের কারবার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এখানে পেশায় ভিন্নতা এসেছে। একই ব্যক্তি এক জায়গায় নির্মাতা অন্য জায়গায় কারবারী।

(পৃ. ২৪৬)

১৮৯. CRAMPTON-এর সংলাপে Let me alone child. এ অংশের অনুবাদ করা হয়েছে 'শেষে এই পুঁচকে মেয়েটার হুকুম মানতে হবে নাকি?'

(পৃ. ১৫১)

১৯১. CRAMPTON-এর সংলাপে Pleasant meal-কে অনুবাদে 'জমকালো খানাপিনা' বলা হয়েছে।

(পৃ. ২৫১)

২২২. WAITER-এর সংলাপে item-এর ভিন্নতা প্রকাশ পেয়েছে। মূল নাটকের সাথে অনুবাদের মিল নেই। মূলে আছে Seltzer and Irish. Small Leager miss. 413. madam. প্রভৃতি। অনুবাদে আছে 'আঙ্গুর দানা বসানো আইসক্রীম।'

(পৃ. ২৫৩)

২৪৯. DOLLY-এর সংলাপে ginger Beer-কে অনুবাদে 'কফি' করা হয়েছে। যেমন, 'আরো কফি আনতে পাঠালাম।'

Dhaka University Institutional Repository

২৫৬. M'COMAS-এর সংলাপে What is the established religion in Madira? এ অংশের অনুদিত হয়েছে, 'তোমাদের বার্মা মুলুকে কোন ধর্মের প্রচলন সবচেয়ে বেশি? এখানে Madeira কে 'বার্মা' করা হয়েছে।

তৃতীয় অঙ্ক

১. MRS CLANDON-এর সংলাপে Five! I don't think we need wait any longer for the children. They are sure to get tea some where. এখানে সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। মূল নাটকে আছে ৫টা, অনুবাদে আছে ৭টা। আর Children-কে 'কিসু' ও 'বেনু' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

(পৃ. ২৭২)

৫৪. VALENTINE- এর সংলাপে, Love! অনুবাদে করা হয়েছে 'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

(পৃ. ২৭৬)

৯২. VALENTINE-এর সংলাপ I learnt how to circumvent the women's Right woman before I was twenty three : its all been found out long এবং এই অংশের অনুবাদ করা হয়েছে, 'কাজেই আমার পন্থা যে আধুনিকতম এবং অপরাজেয় হবে, এতে অবাক হবার কিছু নেই।' এখানে বক্তব্যের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

১১৭. সংলাপে MRS CLANDON বলেছেন, Pray be silent, Sir, এ অংশে অনুবাদে লক্ষ্য করা যায় : 'চুপ করে থাকতে পারছ না?'

(পৃ. ২৮০)

মূল নাটকে নাম সংক্ষেপে থাকলেও অনুবাদে নাম সম্পূর্ণ দেওয়া হয়েছে। যেমন, ১২০নং MRS CLANDON-এর সংলাপে Mr. Va-এই সংলাপ অনুবাদে মা বলেছেন, 'খোরশেদ'।

১৯৯. VALENTINE-এর সংলাপ So I am, Do you Expect my wife to live on what I earn? Lenpencea week! মূল নাটকে এক সপ্তাহে দশ পেন্স-এর উল্লেখ আছে। অনুবাদে বলা হয়েছে, 'মাসিক পাঁচ টাকায় বৌ নিয়ে সংসার চলে না।'

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অঙ্ক

১. WAITER-এর সংলাপ The Ladies have gone অনুবাদে আছে 'সবাই ধরে রয়েছে।'

৩. মূল নাটকে WAITER-এর সংলাপ Right, Sir, What name, Sir? এ অংশের অনুবাদ হয়েছে, 'জী। (চলে যাবে)'

(পৃ. ২৯৩)

৩৭. CRAMPTON-এর সংলাপের সাথে অনুবাদের সংলাপ ব্যবহারের পদ্ধতি ভিন্ন, তবে মূল নাটকের বক্তব্যের কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

(পৃ. ২৯৬)

৭০. মূল নাটকে MR CLANDON-এর সংলাপে I think we might have a jug of claret up, এ অংশের অনুবাদ হয়েছে, মা'র সংলাপে 'মানে – ইয়ে – আমাকেও এক পেয়ালা কফি দিও। হালকা।'

(পৃ. ২৯৯)

১১৯. VALENTINE-এর সংলাপ Nonsense. অনুবাদে VALENTINE-এর পরিবর্তে ডাক্তার বলছেন, 'হুম! কোন দরকার নেই তার।'

১৩৮. BOHUN-এর সংলাপে Fast? Loud? Gay? অংশগুলো পরিবর্তিত হয়েছে নিম্নরূপে : 'বুঝতে পারছি।'

(পৃ. ৩০৩)

১৫১. মূল নাটকের DOLLY'র সংলাপে আছে, oh then comes as bon and a blessing-এ সংলাপের অনুবাদে বেনু বলছে, 'শ! হক সাহেব? হক বিচার করতে এসছেন বুঝি?'

১৬৭. মূল নাটকে Bohun বলছে– [throwing himself back with masive pitying remons traced Mr. VALENTINE] অনুবাদে এই সংলাপে হক সাহেব বলেছেন, 'আহ্ ডক্টর। আপরার আপনি।'

১৮১. MRS CLANDON'র সংলাপে আছে, dolly dearest-! এখানে মূল অংশে তিরস্কার করা না হলেও অনুবাদে তিরস্কার এসেছে। যেমন, মা বেনু মা ছিঃ!

(পৃ. ৩১১)

Dhaka University Institutional Repository

২৪০. VALENTINE'র সংলাপে এখানে বক্তব্য ও সংখ্যার পার্থক্য লক্ষণীয়। মূল নাটকে VALENTINE বলেছেন, oh, if your mother were only a widow! She's worth six of you. এ সংলাপের অনুবাদ করা হয়েছে, ডাক্তার : 'তোমার মত দশ গণ্ডা মেয়ে একত্র করলেও তোমার মায়ের কাছাকাছি হবে না।' পার্থক্য হলো মূল নাটকে মাত্র ছয় জনের কথা বলা হলেও অনুবাদে দশ গণ্ডা চল্লিশ জনের কথা বলা হয়েছে। এখানে ব্যবধানটা অনেক বেশি।

২৪৫. GLORIA'র সংলাপে Indeed শব্দটি অনুবাদে 'বাহাদুর' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।

(পৃ. ৩১১)

২৮৮. DOLLY'র সংলাপে and we're missing all the dances. এই অংশের অর্থের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'বাগানে গিয়ে আতসবাজির রঙ্গিন খেলা দেখা।'

(পৃ. ৩১৫)

অনুবাদে যে অংশগুলো নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে

প্রথম অঙ্ক

মেয়ের সংলাপে 'আগে বলেন নি কেন?'

(পৃ. ৫)

ডাক্তারের সংলাপে 'তারা সব দেশের বাড়িতে।'

(পৃ. ৬)

মেয়ের সংলাপে 'যদ্দুর পেরেছি' এবং 'আর বাইরে পেতলের ফলকে যার নাম দেখে এসেছ।'

(পৃ. ৭)

অনুবাদ নাটকে কিসুর সংলাপ 'স্যুট-টাই ছেড়ে ডাক্তার সদ্য ভাঙ্গা পাজামা-পাঞ্জাবী পরে ঘরে ঢোকেন। মানিয়েছে খুব। ঘরে ঢোকেন প্রায় ছুটতে ছুটতে। পাঞ্জাবীর বুকের বোতাম তখন সবগুলো লাগানো হয়নি, ঘরে ঢুকেই থ হয়ে যায়। রিজিয়া নির্মম একাগ্রতার সঙ্গে তাকিয়ে থাকে ডাক্তারের দিকে।' অংশগুলো নাটকে নেই, এগুলো অতিরিক্ত সংযোজন।

(পৃ. ১২)

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদে বেনুর সংলাপে 'তাহলে তো কথাই নেই। দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? ছুটে গিয়ে নিয়ে আসুন না।'

(পৃ. ১৯)

মূল নাটকে এ অংশগুলো নেই। মূলে আছে, DOLLY; Honest Ingun?

(পৃ. ২২৮)

দ্বিতীয় অঙ্ক

আমাদের সংলাপে 'চেহারা কী ঠিক এক রকম নাকি?'

(পৃ. ২৭)

বেনুর সংলাপ, 'আপনি বুড়ো মানুষ, বয়সে অনেক বড়ো, নইলে এমন জবাব মুখে এসেছিল আমার।'

(পৃ. ৪২)

'আমাদের মায়ের তুলনা হয় না। আমাদের মা গর্ব করার মতো মা।'

(পৃ. ৪৪)

তৃতীয় অঙ্ক

মা এর সংলাপে বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে যা মূল নাটকে নেই। মূল নাটকে সাধারণভাবে কথা বলা হয়েছে।

MRS CLANDON-The new edition of Twentieth century women. (মূল নাটক) এ সংলাপ অনুবাদে এসেছে, মা : 'বাঃ কতবার বললাম তোমাকে।' অনুবাদের সংলাপে বিরক্তি প্রকাশ করা অতিরিক্ত সংযোজন।

মূল রচনায় MRS CLANDON বলছেন, I don't think I have said anything I have no right to say, GLORIA.

(পৃ. ২৮০)

এখানে সংলাপে যুক্ত হয়েছে, মা : 'আমায় ভুল বুঝিস না রেজু।'

(পৃ. ৬৭)

Dhaka University Institutional Repository

মূল রচনায় VALENTINE-এর সংলাপ অনুবাদের কিছু সংযোজন হয়েছে যেমন, ডাক্তার বলছেন, 'নিজেকে আমি আপনাদের মাঝখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাগানেই থাকবো। দরকার হলে ডেকে দেবেন।'

(পৃ. ৯৩)

মূল নাটকে M'COMAS-এর সংলাপ [starting Violently I will not have this Mr. BOHUN. I use the young lady's christian name naturally as an old friend of her mother's.

(পৃ. ৩০৭)

অনুবাদে মূলের তুলনায় সংলাপ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুবাদে বেনুর সংলাপ, 'কে আমি? হায়রে কপাল? আমি যে একজন মহিলা এটা কেউ স্বীকারই করতে চায় না। সবাই মনে করে ছেলে মানুষ। বেনু বেনু বলে ডাক শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কেবলমাত্র আসাদ মামাই একদিন যথেষ্ট দরদ দিয়ে মিষ্টি করে বলেছিলেন, মিস্ বিলকিস্। কী ভালই যে লেগেছিল সে ডাক।'

(পৃ. ৯৩-৯৪)

মূল নাটকে BOHUN ও PHILLIP'-এর সংলাপ অনুবাদে কিছু অংশ যুক্ত ও কিছু অংশ বর্জিত হয়েছে। যেমন, অনুবাদে হকের সংলাপ, 'এলাম বলে পদ্মবনে মত্তহস্তী।' এ অংশ মূল নাটকে নেই।

(পৃ. ৯৫)

মূল নাটকে PHILLIP'-এর সংলাপ 'On with the dance let joy be unconfined William. এ অংশ অনুবাদে আসেনি।

(পৃ. ৩০৮)

মূলের BOHUN'-এর সংলাপ মূলের তুলনায় অনুবাদে অতিরিক্ত অংশ যুক্ত হয়েছে। যেমন, BOHUN : [nailing Valentine to the Point instantly] Then insist on a settlement. That Shocks your delicacy : most sensible Precautions do. But you ask any advice, and I give it to you. Have a Settlement.

(পৃ. ৩১৫)

এই অংশের অনুবাদ হকের সংলাপ, (ডাক্তারকে লক্ষ করে) 'তার জন্য ঘাবড়াবার কি আছে? ডাক্তার, বৌয়ের যেখানে যা পাওনা আছে সব বিয়ের কাবিন নামার সঙ্গেই পাকাপোক্ত দলিলে

Dhaka University Institutional Repository

লিখিয়ে স্বামীর নাম করিয়ে নিন। আপনার নাজুক শরাফত বোধ হয় এ প্রস্তাবে একেবারে আঁতকে উঠেছে। স্বাভাবিক। বুদ্ধিমানের মতো আগে থেকে সাবধান হওয়া সকলের ধাতে সয় না। আমার পরামর্শ দেয়ার, দিলাম। রাখা না রাখা আপনার ইচ্ছে। তবে জেনে রাখবেন, কাঁচা কাজে ঠকার ভয় বেশি।

(পৃ. ১০২)

অনুবাদে অতিরিক্ত অংশ হলো :

যেমন, রিজিয়ার সংলাপ 'বাজী'। (দুজনে শাহী কায়দায় বেরিয়ে যায়)।

(পৃ. ১০৩)

অনুবাদের প্রয়োজনে অনুবাদক কোথাও কোথাও সংলাপে নতুন অংশ যুক্ত আবার অন্যত্র বর্জন করেছেন, আবার কোথাও মূল সংলাপের পরিবর্তনও লক্ষণীয়। যেমন, মূল নাটকে BOHUN-এর সংলাপে [and disappears among the lanterns, leaving Valentine gasping]

(পৃ. ৩১৫)

এ সংলাপে হক বলছেন, মিস রাজিয়া খানম আপনাকে আমার সঙ্গে বাগানে বেড়াতে হবে।'

(পৃ. ১০৩)

নাটকটি অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল নাটক থেকে যে অংশগুলো পরিবর্তন, বিয়োজন ও সংযোজন হয়েছে তা মূলত অনুবাদের প্রয়োজনেই হয়েছে। ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন পরিবেশের একটি নাটক ভাষান্তরের জন্য এই পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। তাছাড়া বিদেশি বিষয়বস্তু দেশীয় পরিমণ্ডলে উপস্থাপনে কিছুটা পরিবর্তন অযৌক্তিক নয়। পরিবর্তন, সংযোজন বা বর্জন করার জন্য কমেডি নাটকের কমেডি রস বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়নি। অনুবাদ নাটকটি পড়ার সময় মনে হয় প্রকৃতপক্ষে আসলেই তা দেশীয় উপাদানেই নির্মিত।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মুনীর চৌধুরী একাধারে গল্পকার, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, সমালোচক ও গবেষক। অনুবাদক হিসেবে মুনীর মানসের বৈশিষ্ট্য নির্দেশই বর্তমান গবেষণার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনি ব্যক্তিত্ব ও মেধায় ছিলেন অনন্য। তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে উচ্ছল এবং প্রাণবন্ত মানুষ।

মুনীর চৌধুরীর জীবনী, ছোটগল্প, মৌলিক পূর্ণাঙ্গ একাঙ্ক নাটক, অনুবাদ নাটক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভবের সঙ্গে গবেষণার মাধ্যমে মুনীর মানসের স্বরূপকে আবিষ্কার করা সম্ভব। এর পূর্বে তাঁর মৌলিক নাটকের উপরে কিছুটা গবেষণা হলেও অনুবাদ নাটকের উপর এই প্রথম আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকত্বের দিকগুলি বর্তমান আলোচনায় নির্দেশের চেষ্টা করা হয়েছে। অনুবাদের প্রয়োজনে সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন ও এর কারণ বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে।

মুনীর সাহিত্য পাঠে পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রসবোধ ও বাস্তবানুভূতির। শহুরে জীবনের পাশাপাশি গ্রাম্য সাধারণ জীবনকে একই পংক্তিতে বসাতে তিনি সিদ্ধহস্ত। সাহিত্য রচনায় তিনি অতি কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। তাঁর সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রই বাস্তব মানবজীবন নির্ভর। সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, ছাত্র-সমাজ, মানবতাবোধের মত বিভিন্ন দিক তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অজিত কুমার ঘোষ, একাঙ্ক নাটকের গতি ও প্রকৃতি, সুপ্রকাশ, কলকাতা, ১৯৫৯।

অজিত কুমার ঘোষ, নাটকের কথা, সাহিত্য লোক, কলকাতা-৬, ১৯৯৬।

আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।

আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪।

আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), মুনীর চৌধুরী রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

আবু তৈয়ব চৌধুরী, মোজাম্মেল হক, খালেদা খানম। উচ্চ মাধ্যমিক পৌরবিজ্ঞান, সম্পাদনায় মোঃ মোজাম্মেল হক, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৯১।

কবীর চৌধুরী, জীবনী গ্রন্থমালা, ১০ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭।

কে আলী, বাংলাদেশ ও পাকভারতের ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন, ১৯৬৬-৮৮।

কায়কোবাদ, মহাশ্মশান, মোঃ জিনাত উল্লাহ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৭৪।

জিয়াউল হাসান, মুনীর চৌধুরীর নাটক, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯০।

'বাংলাদেশ ও পাকভারতের ইতিহাস, অধ্যাপক কে আলী, মুঘল সাম্রাজ্য।

মুনীর চৌধুরী, রক্তাক্ত প্রান্তর, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮১।

মুহম্মদ মজির উদ্দিন, বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, নর্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স, নওগাঁ-রাজশাহী, ১৯৭৭।

সাধন কুমার ভট্টচার্য, নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, কলিকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৯৬৩।

সাধন কুমার ভট্টচার্য। একাঙ্ক নাটকের সংজ্ঞা ও স্বরূপ। সুপ্রকাশ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৬০।

সাধন কুমার ভট্টচার্য, নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা। করুণা প্রকাশনী কলকাতা, ১৯৬৩।

সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

রাজশেখর বসু (অনূদিত), বাল্মীকি রামায়ণ, কলিকাতা, ১৯৮৭, সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ভারত, ১৯৮৮।

An Advanced History of India, Chapter Disintegration of Mughal, RC Majumder, Page No. 543-553.

ed. by J.T Shipley, Dictionary of world, literary terms, George, Allen Urwin, London, 1979.

Hudson, William Henry, An introduction to the study of literature, London, Harrap & Co. 1947.

Ramesh Chandra Majumder, An Advanced History of India, The Macmillan Co. of India, 1978.

William Shakespear, Othello, Penguin Popular Classics, London, 1994.

William Shakespear, The Taming of the Shrew, Wordsworth Editions, London, 1993.